বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মাহমুদুর রহমান মান্না

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

মাহমুদুর রহমান মান্না

রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, তৃতীয় তলা ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল)
রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১-৭৩৮১৯২

গ্রন্থসত্ত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

তৃতীয় সংস্করণ
রুক্কু শাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

কম্পিউটার কম্পোজ
সূর্যভান কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭১-৭৩৮১৯২

মুদ্রণ
জমজম কালার প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
সূর্যভান প্রকাশন
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮২৭-৩০৮২২৬

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8928-60-8

অনলাইনে পেতে
www.rokomari.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বায়ান্ন থেকে আজ পর্যন্ত
ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য
যেসব ছাত্র-তরুণ জীবন দিয়েছে
তাদের স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ✍ ৯

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা ✍ ১১

ভাষা আন্দোলন ✍ ১৫

'৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলন ✍ ৪৬

ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গন ✍ ৬১

৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন ✍ ৬৫

ছাত্রলীগের ভাঙন ✍ ৯৬

'৭০-এর নির্বাচন ও স্বাধীনতা আন্দোলন ✍ ১০০

স্বাধীন দেশে ছাত্র আন্দোলন ✍ ১২১

সরকারী ও জাতীয় ছাত্রলীগ ✍ ১৪৬

জেনারেল জিয়ার উত্থান এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ✍ ১৫৪

এরশাদের আগমন এবং ছাত্রদের আন্দোলন ✍ ১৬০

এরশাদ সরকারের পতনের পর ✍ ১৮৭

ছাত্রলীগ ✍ ২০৭

বেগম জিয়ার দ্বিতীয়বারের শাসন ✍ ২১২

জরুরী অবস্থা ও ছাত্ররাজনীতি ✍ ২১৭

'৯০-র ঘটনার পুনরাবৃত্তি ✍ ২২১

এরকম হলো কেন ✍ ২৩৮

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক ✍ ২৪৩

ছাত্ররা এখনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভ্যানগার্ড ✍ ২৪৮

তথ্যসূত্রঃ ✍ ২৫৫

পরিশিষ্ট ✍ ২৫৬

ছবি ✍ ২৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

২০১১-র ফেব্রুয়ারিতে এ বই প্রথম প্রকাশিত হবার পর থেকেই অজস্র টেলিফোন পেতে থাকি। প্রকাশের সাত দিনের মধ্যেই বইটির কয়েক'শ কপি বিক্রি হয়ে যায়। তার পরে আসতে থাকে ফোনগুলো। যারা ফোন করেছিলেন, তারা বইটি কিনে ছিলেন এবং পড়ে হতাশ হয়ে ছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির অনেক কিছু থাকবে বইটির মধ্যে। কিন্তু মাত্র ২০ পৃষ্ঠার একটি রচনা এটি। তারা এমন কিছু পাননি বইয়ের মধ্যে।

বইটির প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান করেছিলাম ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক দ্বীপে। সেখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আমি বলেছিলাম, বইটির প্রকাশক জনাব নজরুল ইসলাম বাহার আমাকে প্রায়শঃ বলতেন, লিখছেন না কেন। আমি আপনার একটি বই করতে চাই। প্রধানত তার তাগাদাতেই পুরানো কয়েকটি লেখা জড়ো করে এবং নতুন দুটি লেখা (১) ছাত্র রাজনীতি এবং (২) রাজনৈতিক সংস্কৃতি লিখে একটি বই দাঁড় করিয়ে ফেললাম। তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি, আমি যতই বাছাই করে লেখা আনি না কেন নামের কারণে পাঠক এ বইয়ের মধ্যে কেবল ছাত্র রাজনীতিই দেখতে চেয়েছেন। তাছাড়া আমি দীর্ঘ দিন ছাত্র নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলাম বলে পাঠকদের এরকম প্রত্যাশা জাগাটাই স্বাভাবিক।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যত তাড়াতাড়ি পারি শুধু ছাত্ররাজনীতি নিয়েই একটি বই দাঁড় করিয়ে ফেলব। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রধানত সেই চিন্তার ফসল।

আমি গবেষক নই। বুদ্ধিজীবিও নই। দীর্ঘ দিনের রাজনীতির অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির উপরে ভর করে বইটি লিখতে চাইলাম এবং তখন অনুভব করলাম স্মৃতির উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। আমার স্মৃতি ততো ভাল, শক্তিশালী নয়। প্রখর তো নয়ই। আমার মত মাঠে কাজ করা রাজনীতিবিদরা অনেকেই লিখেছেন। আমি তাদের কারো কারো বই পড়ে দেখেছি সেখানে স্মৃতি বিভ্রাট রয়েছে। এ জন্যেই গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন অতীতের চর্চা করা হচ্ছে তখন তা নিখুঁত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমি রাজনৈতিক কর্মী হলেও এখন এক ধরনের এল.পি. আর এ আছি। অতএব সাহস করে লিখতে শুরু করে দিলাম।

www.pathagar.com

নির্মোহ সত্য রচনা বড় কঠিন। সেই যে রবীন্দ্রনাথের কথা, সত্য যে কঠিন...। আমি আওয়ামী লীগ করি। এ কথার মানে কী মানুষ এভাবে বোঝে, এর মানে আওয়ামী লীগ যা করে আমিও তাই করি। আওয়ামী লীগ যা বলে আমিও তাই বলি বা লিখি। এখানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি বলতে আলাদাভাবে দলটির যৌথ বা সমষ্টিক আচরণ ও উচ্চারণকে বোঝায় না। বোঝায় এক ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিফলন। আলাদাভাবে এই ব্যক্তিরা কখনো মিলনাত্মক ক্রিয়া করেন না। তাদের আচরণ সব সময় বিরোধাত্মক। তা হলে সত্য দাঁড়াবে কোথায়?

লিখবার সময় আমি নৈর্ব্যক্তিক এবং দলনিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি লেখক হিসাবে আমার তাই থাকা উচিত। কিন্তু যখন কোন সাক্ষাতকার ধরে লিখেছি তখন সাক্ষাত প্রদানকারী যা বলতে চেয়েছেন সেটা রেখে লিখতে চেষ্টা করেছি।

আমি আগেই বলেছি আমার এটা কোন গবেষণা গ্রন্থ নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে বিশালতা সেই অর্থে পূর্ণাঙ্গ নয়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বা ছাত্ররাজনীতির ওপরে আরও কাজ করবার ইচ্ছা আছে আমার। আশা করি আগামী সংস্করণগুলো বর্তমানের চাইতে ভাল হবে।

মাহমুদুর রহমান মান্না

www.pathagar.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেছিলাম বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি নিয়ে আরো কাজ করব। যারা সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র নিয়ে কাজ করবে তাদের ছাত্র আন্দোলন তথা ছাত্ররাজনীতি নিয়ে ভাবতে হবে। তৃতীয় সংস্করণে আমি বলতে চেয়েছি যে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ছাত্র যুবক তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই হচ্ছে সমাজের রাজনীতি সংস্কৃতির ট্রেন্ড সেটার। তারাই এ দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভ্যানগার্ড। এই উপমহাদেশের এমন কি ইউরোপের দেশসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই আঙ্গিকেই এই গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা করেছি।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মার্কস-লেনিনের চিন্তা ধারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আলোড়িত করেছিল। সেই যুগান্তকারী সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন নিয়ে ছাত্ররা নিজেরা কথাবার্তা বলতেন যার অভিঘাত সমাজে তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারতব্যাপী অসহযোগ বা খেলাফত আন্দোলন হচ্ছিল। রাজনৈতিক দল হিসেবে ছিল কংগ্রেস। মুসলিম লীগ তখনও তেমন শক্তিশালী হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মত ছিল। কমিউনিস্টরাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে এসব মতের সরাসরি কোন প্রতিফলন ছিল না। হয়ত ব্যক্তিগতভাবে অনেকে মতামত রাখতেন, কিন্তু এসব নিয়ে প্রকাশ্যে কোন দল হয়নি। তখন বিদেশি পণ্য বর্জনের আন্দোলন হতো। ছাত্ররা বোন ফায়ারে শরিক হতো, দেশি কাপড়-চোপড় করে গৃহদাহ ইত্যাদি করতো। আলাদা দল করে কিছু করার কথা জানা যায়না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মাঝে মধ্যে কাগজ বের করতো। তাতে মতানৈক্য হতো অনেক। কিন্তু আজকাল যেরকম ছাত্রতে-ছাত্রতে, সংগঠনে-সংগঠনে সংঘর্ষ হয়, সেরকম হতো না।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান প্রস্তাব) উত্থাপন করেন। সে প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দু'টি স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাওয়ার আশা

www.pathagar.com

জাগ্রত হয় যার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র লাহোর প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঝোঁক দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্যে আলাদা দাবি উঠতে থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হিন্দুরা এর প্রবল বিরোধীতা করেছিল। বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রীক বাঙালী হিন্দু শিক্ষিত সমাজ এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথও এতে শামিল হয়েছিলেন। এমন কি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন তারা একে মক্কা ইউনিভার্সিটি বলে বিদ্রুপ করতো। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বড় কোন উত্তেজনা দেখা যায়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ইউনিভার্সিটিতে হিন্দু মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মারামারিও হয়েছে এর মধ্যে, কিন্তু তা একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়নি।

সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল ১০ আগস্ট ১৯৪২ সালে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও হিন্দু শিক্ষকরা সব ধর্মঘট করেছেন, কারণ ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করেছিল ও ৯ আগস্ট গান্ধীজীকে জেলে নেওয়া হয়েছিল। তার প্রতিবাদে ধর্মঘট। অপর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দল বেঁধে লিয়াকত আলী খানের জনসভায় যোগ দিতে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমি এই কালিক বিবেচনায়ই ভাগ করবার চেষ্টা করেছি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ভারত বিভক্তির আগ পর্যন্ত নির্দ্বিধায় অতীতের কাছে সমার্পণ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের ছাত্র আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় তেমন কোন জায়গা পায়নি।

আমি শুরু করেছি ভারত বিভক্তির পর থেকে যখন বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ভাষা আন্দোলন শুরু করল তখন থেকে। তখন থেকে অতি সাম্প্রতিক সময়কে আমি অতীত এবং বর্তমানে ভাগ করেছি। এই বিভাজনটাও সহজ মনে হয়নি। পাকিস্তানের পুরো সময়টুকুকে নিশ্চিতভাবে ছাত্র আন্দোলনের অতীত বলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বয়সও হয়েছে এখন চার দশকের বেশি। যে ছাত্রটি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে প্রায় তার সমান বয়সের বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন সে দেখেই নি। ফলে এখানেও লিখতে গিয়ে অতীত বর্তমানের বিভাজন এসেছে। ভবিষ্যৎকে আমি সাম্প্রতিক সময়ে দাঁড়িয়ে সম্ভাবনার দৃষ্টিতে দেখেছি।

আমি আগেও বলেছি ছাত্র আন্দোলন ও রাজনীতির আরো কাজ করার ইচ্ছা আমার আছে। সে কথা আমি এখনও বলছি। আশা করেছিলাম আগের চেয়েও এই সংস্করণ আরো ভালো হবে। কিন্তু এখন পুরা গ্রন্থ না দেখে মনে হচ্ছে এবারও সেটা পুরোপুরি করতে পারি নি। বিশেষ করে এরশাদ সরকারের পতনের পর ছাত্র-

www.pathagar.com

রাজনীতির যে অবক্ষয় তাকে ভালো করে তুলে ধরা হয় নি। আরো অনেক কাজ করতে হবে এর ওপর। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে দু'জন মানুষের কথা বলতে হয়। একজন আমার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাংবাদিক মাহমুদ জামাল কাদেরী। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থনায় অর্ধেক কাজটি তিনি করেছেন। তাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর একজন শুভ মুনতাসির। মাত্র কিছুদিন হয় আমাদের সংগঠনে যোগ দিয়েছে। আবেগী শুভ দেশকে ভালোবাসে প্রচন্ড। এই বইয়ে যে পরিমাণ গবেষণার কাজ তার বেশির ভাগটি সেই করেছে। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পড়ে থেকেছে। পুরনো সব পত্রিকা থেকে ঘেঁটে জীবন্ত তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছে। আর বইয়ের কম্পোজে সময় দিয়ে সহায়তা করেছে আল মামুন পাঠান। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন– 'রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স'-এর আমজাদ হোসেন খান (জামাল); এজন্য তার একটি ধন্যবাদ প্রাপ্য। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। পাঠকরা এই সংস্করণ পড়বার পরে যদি কিছুটা হলেও মনে করেন যে বইটি আগের চাইতে সমৃদ্ধ হয়েছে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মাহমুদুর রহমান মান্না

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত

পাকিস্তান জন্মের মাত্র তিন মাস পরে (১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে) তৎকালীন রাজধানী করাচীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের ভাষায় এই শিক্ষা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল: To create an elite that will determine the quality of new civilisation. এতে পূর্ববাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবদুল হামিদ যোগদান করেন। শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংবাদ ৬ ডিসেম্বর ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। বিক্ষোভের মাত্রা এমনই ছিল যে, ঐদিনই দুপুর দুটোর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও অন্যান্য কলেজসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদসভা করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম। বক্তৃতা করেন মুনীর চৌধুরী, এ. কে.এম আহসান প্রমুখ এবং প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এটাই সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভা।

সমাবেশের পর এক বিরাট ছাত্র মিছিল সচিবালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেখানে কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আফজল ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করেন এবং ছাত্রদের আন্দোলন সমর্থন করেন। এরপর ছাত্ররা প্রাদেশিক মন্ত্রী নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসভবনেও গমন করে এবং বাংলার প্রতি মৌখিক সমর্থন ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস আদায় করে। ছাত্রমিছিল 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিসের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ঢাকার রায় সাহেব বাজারে পৌঁছলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। খাজা নাজিমউদ্দিন সরকারের পুলিশ এবং দলীয় ভাড়াটে গুন্ডারা ভাষার আন্দোলনকে নির্মম দমননীতির মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিতে প্রয়াস পায়।

www.pathagar.com

ভাষা প্রশ্নকে নিছক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে না রেখে তাকে রাজনৈতিক মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং ছাত্ররাই অধিকতর যোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন করাচীতে শুরু হয়। অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা বিষয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল, উর্দু-ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হোক। গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যরা বাংলাকে পরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার খবর ঢাকায় এসে পৌঁছলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) এবং স্কুলের ছাত্ররা রাস্তায় মিছিল করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ। এই সভায় ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সাংগ্রাম পরিষদ' নামে সর্বদলীয় একটি সংগঠন গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হন জনাব শামসুল আলম। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐদিন এক প্রস্তাবে সারা পূর্ববাংলায় ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সনের ১১ মার্চ জনতার ওপর নেমে আসে সরকারি প্রশাসনিক বাহিনী ও গুন্ডা বাহিনীর অশেষ নির্যাতন ও গ্রেফতার। এর প্রতিবাদে ১২ মার্চ বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এই দিন এক সরকারি ঘোষণায় কলকাতা থেকে আমদানিকৃত অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'স্বাধীনতা' নিষিদ্ধ করা হয়। ১৪ মার্চ সারা পূর্ববাংলায় ১১ মার্চের নির্যাতনের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীনের বর্ধমান হাউসস্থ (বর্তমান বাংলা একাডেমি) বাসভবনে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হলে ছাত্ররা বিকেল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করতে থাকে।

১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচনায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের আনীত ৭ দফা চুক্তিনামায় প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীন শেষ পর্যন্ত রাজি হন।

প্রতিবাদের মুখে জিন্নাহ

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা আসলে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তার সম্মানে এক নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে সমাবেশে ভাষা-আন্দোলনকারীদের চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন: আপনাদের বলতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান

www.pathagar.com

না হলে আপনারা বিপদগ্রস্ত হবেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। জিন্নাহর রেসকোর্স বক্তৃতা জনগণ বিশেষ করে ছাত্রদের দারুণভাবে হতাশ করে। কারণ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজ পূর্ববাংলার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও জিন্নাহ সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট মোহ ছিল। তাঁর বক্তৃতা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় বিচ্ছিন্নভাবে– কোথাও কোথাও জিন্নাহর সম্মানে নির্মিত তোরণ ভেঙ্গে, কোথাও তার ছবি ছিঁড়ে ফেলে।

এরপর ২৪ মার্চ সকালে জিন্নাহর সম্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিন্নাহ যখন পুনরায় 'উর্দুই' একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, ঘোষণা দিচ্ছিলেন তখন মিলনায়তনে উপস্থিত বেশকিছু ছাত্র একসঙ্গে 'না' 'না' করে উঠলে জিন্নাহ ক্ষণিক সময়ের জন্য থমকে দাঁড়ান এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষায়, কথার সুর বদলিয়ে ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।

এইদিন (২৪ মার্চ) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জিন্নাহর একটি নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পাদিত ৮ দফা চুক্তি মানতে অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন ওটা জোরপূর্বক করা হয়েছে। ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্টভাষা করার রাজনৈতিক যুক্তি উত্থাপন করতে থাকলে জিন্নাহ রাগত স্বরে বলেন, তিনি ছাত্রদের কাছে রাজনীতি শিক্ষা করতে আসেননি। এভাবে বিতর্কের ভেতর দিয়ে সেদিনের আলোচনা পন্ড হয়ে যায়।

পুলিশ ধর্মঘট

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিচ্ছিল তখন ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্নরকম স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময় পেশাগত স্বার্থ নিয়ে অন্যান্য সরকারি কর্মচারী এমনকি পুলিশের মধ্যেও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ১৪ জুলাই দেড় মাস কাল কোনো বেতন না পাওয়ায় ঢাকার পুলিশ-সমাজ ধর্মঘট এবং প্রকাশ্য রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করলে সরকার সেনাবাহিনীকে পুলিশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে শেষপর্যন্ত দুইজন পুলিশ নিহত ও নয়জন আহত হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ মারা গেলে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও পরে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

ঢাকা শহরে ছাত্রী বিক্ষোভ

এর কিছুদিন পর ঢাকা শহরে ব্যাপক ছাত্রীবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এর পটভূমি ছিল ইডেন ও কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের অগণতান্ত্রিক একত্রীভুক্তি। এর প্রতিবাদে এই

www.pathagar.com

দুই বালিকা বিদ্যালয় ছাড়াও ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও এতে যোগ দেয়। ১৫ নভেম্বর (১৯৪৮) ধর্মঘট করার পর বেলা দুটোর সময় সচিবালয়ের সামনে ছাত্রীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়। এই ধর্মঘট একাধারে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে এবং স্কুল এলাকায় গোলযোগের আশঙ্কায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এই সময় ১৮ নভেম্বর ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্ররাও নিজস্ব দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে রাস্তায় নেমে পড়ে ও ধর্মঘট পালন করে এবং একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গমন করে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে ছাত্ররা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনশন ধর্মঘটের হুমকি প্রদান করে। একই সময়ে ইডেন ও কামরুন্নেছা স্কুল এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের যৌথ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ এবং নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন সমর্থন করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে। ২৭ নভেম্বর ধর্মঘটি ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে ঢাকায় সাধারণ ছাত্রধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং বেলা দুটোর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভায় বক্তারা সরকারের সমালোচনা করেন।

এই বছরই নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান রাজশাহী সফরে আসলে চরম ছাত্রবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনার নাম করে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল তাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২১ নভেম্বর ছাত্রদের উপর গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। রাজশাহী সরকারি কলেজের ছাত্রনেতা গোলাম রহমানকে রাজশাহী শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়।

রাজশাহীতে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দসহ অন্য কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার এবং ঢাকাসহ পূর্ববাংলার সর্বত্র ছাত্রদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ৮ জানুয়ারি 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহ্বান জানানো হয়। ঢাকাতে একমাত্র ঢাকা কলেজ ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। দুপুর ২টায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা নঈমুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারকে দাবিসমূহ মেনে নেওয়ার জন্য একমাসের সময় দেওয়া হয়।

ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ

১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে সলিমুল্লাহ হলের ১২নং কক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ সাংগঠনিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িকরণের একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি তুলেছিলেন অলি আহাদ। কিন্তু বিরোধীতার মুখে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নকর্মচারী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীরা দীর্ঘদিন থেকেই তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না

www.pathagar.com

হওয়ায় ৩ মার্চ (১৯৪৯) থেকে কর্মচারীরা ধর্মঘটে চলে যায়। ধর্মঘটে যাওয়ার আগে থেকেই কর্মচারীরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল।

ছাত্ররা এদের আন্দোলনের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন প্রদান করে এবং ৩ মার্চ কর্মচারীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জন করে। ৫ মার্চ মুসলিম ছাত্রলীগ একাই পুনরায় ধর্মঘটের ডাক দেয়। এরপর এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য এদিন যৌথ ছাত্র কর্মপরিষদ গঠিত হয় এবং উপাচার্য ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপাচার্য জানান, বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদের সভায় তিনি এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন।

কিন্তু বিকেলে নির্বাহী পরিষদে কর্মচারীদের আন্দোলনে উসকানি দেওয়ায় ছাত্রদের হুমকি দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র কর্মপরিষদ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটি স্মারকলিপি উপাচার্যের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা আবদুর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত তিনি অবহেলা ভরে তার সেই দায়িত্ব পালন করেননি।

কতিপয়ের বিশ্বাসঘাতকতা

১০ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-কর্মচারীদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কতিপয় নেতা বক্তৃতা দিয়ে কর্মচারীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। যদি কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকার রক্ষা না করে তবে ছাত্ররা তাদের দাবিদাওয়া আদায় করে দেবে।

এভাবে একটি জঙ্গী কর্মচারী আন্দোলন শেষপর্যন্ত বিপথগামী হয়। কর্মচারীরা সরল বিশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ প্রশাসন ভবনে তাদের ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে। এর মধ্যে নতুন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ছাত্রদের অবিলম্বে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

পরদিন ১৩ মার্চ পরিষদের সভায় মোটামুটিভাবে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার পক্ষেই নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন। কোনো কোনো নেতা সভাতে বলেন– ছাত্ররা এখন বিশ্রাম চায়, আন্দোলন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তা-ই চাইছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঘটি কর্মচারীদের থেকে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করা, ছাত্রদের অবর্তমানে নিম্ন-কর্মচারীরা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর হয়েছিলও তাই। কিন্তু কর্মচারীদের আন্দোলনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে ছাত্রনেতারাও শেষপর্যন্ত রেহাই পেলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বমোট ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এরমধ্যে ১৭ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুললে সেইদিনই ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে ধর্মঘট পালিত হয়। প্রায় দু-হাজার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা করে। সভার উদ্যোক্তারা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। কিন্তু নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের কর্মীরা সভায় এসে কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করলে সাধারণ ছাত্ররা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও তার চারপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এরপর সভাশেষে ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনে গমন করে এবং সারারাত দশ-পনের জন ছাত্র অবস্থান-ধর্মঘট করে। এই সময় পূর্বের ছাত্র কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত করা হয়। কারণ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা নঈমুদ্দিন আহমদ ও আবদুর রহমান চৌধুরী কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করায় তাদের বহিস্কার করা হয়।

পরদিন ৮ তারিখে ঢাকা শহরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু বিভাগের ছাত্ররা (বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন ইত্যাদি) ক্লাসে যোগ দেয়। এই দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক বিরাট মিছিল গতকালের রাতভর অবস্থানকারীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উপাচার্য ভবনে যায় এবং নতুন করে ত্রিশ জন সারারাত অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দিনের সভাশেষে পুনরায় ২০ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০ এপ্রিল ধর্মঘট শুরু হলে পুলিশের বাধা সত্ত্বেও ধর্মঘটিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে এক বিরাট ছাত্রসভার পর মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে যাত্রা করলে ঢাকা হলের সম্মুখে পুলিশ মিছিলের উপর বেপরোয়া হামলা চালায়। অনেক ছাত্রই গ্রেফতার এবং আহত হয়। নির্যাতন সত্ত্বেও স্লোগান দিতে দিতে ছাত্ররা আরমানিটোলা ময়দানে সমবেত হয় এবং সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত সেখানে সভা চলে। এখানে পুনরায় ২১ এপ্রিল ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। ২১ এপ্রিল করোনেশন পার্কে ছাত্রদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র কর্মপরিষদ এই সময়ে এক বৈঠক করে ২৫ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সরকার এদিন সন্ধ্যায় রমনা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু এদিন ঢাকা শহরে অভূতপূর্ব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। নীলক্ষেত ও পলাশী ব্যারাকের সরকারি কর্মচারীরাও এদিন ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয়। ঢাকা শহরের এই হরতালে সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ মানুষ যোগ দেওয়ায় তা সফলতা লাভ করে। দুপুরে তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আরমানিটোলা ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের সভা থেকে শিক্ষার সঙ্গে 'ভাত-কাপড় চাই' স্লোগানটি যুক্ত হয়। ২৫ এপ্রিল হরতালে সর্বমোট ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং ক্রমাগত ধর্মঘটের পর ২৭ এপ্রিল থেকে পুনরায় আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হতে থাকে।

আরবি হরফে বাংলা

১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব ফজলুর রহমান পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় বলেন : সহজ ও দ্রুত যে হরফের মারফত ভাষা পড়া যায় সেই হরফই সব চাইতে ভাল।...

www.pathagar.com

সুতরাং দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া আরবিকেই পাকিস্তানের হরফ করা উচিত।

অর্থাৎ 'বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবি হরফে!' রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। মাথা কেটে ব্যথা দূর করে দাও। ফজলুর রহমানের সহজ বুদ্ধি(?) অতি সহজেই ছাত্র-জনতার নিকট 'বোধগম্য হলো'। এর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ওঠে। ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে বিবৃতি ও বিতর্ক সৃষ্টি করে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

১২ মার্চ পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপনা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় সভা চলছিল। এদিন বিকালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংসদ ভবন অভিমুখে যাত্রা করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'আরবি হরফ চাই না' ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত ছাত্রমিছিল পুলিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সেখান থেকে পুলিশ সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণালকান্তি বাড়রী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী প্রমুখকে গ্রেফতার করে। এই সময় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন কর্মচারী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এবং ছাত্ররা যাতে আরবি হরফ সম্পর্কিত বিতর্কে সংসদে এসে বিরক্ত না করতে পারে তার জন্য ছাত্রদের ছাত্রবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

এরমধ্যে ৪ মার্চ তমুদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরবি হরফে বাংলা চালুর নিন্দা করা হয়। জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আলোচনা করেন কাজী মোতাহার হোসেন ও 'সৈনিক' সম্পাদক শাহেদ আলী।

টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন

ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের মধ্যেই রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। আসাম থেকে আগত ব্রিটিশ শাসিত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দক্ষিণ টাঙ্গাইল নির্বাচনী কেন্দ্র হতে করটিয়ার জমিদার ও মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নী ও অপর দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচনী ত্রুটির অজুহাতে গভর্ণরের এক আদেশ বলে মওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নী ও অন্যান্য প্রার্থীকে ১৯৫০ সাল অবধি নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। উপরোক্ত শূন্য আসনে সরকার ২৬ এপ্রিল (১৯৪৯ সাল) উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। মুসলিম লীগ সরকার স্বীয় স্বার্থেই খুররম খান পন্নীর পূর্ব ঘোষিত অযোগ্যতা বাতিল করে উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। তখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলের জন্ম না হলেও মুসলিম লীগ সরকার বিরোধীরা পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির নামে সংগঠিত হয়েছিল। কর্মী শিবিরের অন্যতম তরুণ নেতা ছিলেন জনাব শামসুল হক। তিনি টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে সরকারি প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।

www.pathagar.com

সরকার বিরোধী তরুণ মুসলিম লীগ কর্মী ও ছাত্র নেতারা শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনে প্রচারাভিযানে অংশ নেয়। মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিন ও পরাক্রমশালী মুসলিম লীগ সংগঠনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারি প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নী শামসুল হকের কাছে পরাজয় বরণ করেন। এর পর নুরুল আমিন সরকার ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ৩৫ টি শূন্য আসনে কোনো উপ-নির্বাচন ঘোষণা করতে সাহসই হয়নি।

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন

১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলে জনাব আবুল হাশিম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি চিন্তা চেতনায় ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল। মুসলীম প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার বিপরীতে আবুল হাশিমের নেতৃত্বেই বাংলার মুসলিম যুব সমাজ পাকিস্তান আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এদের পদচারণায় ১৯৪৪ সাল হতেই ঢাকার ১৫০ নং মোগলটুলি বাংলার রাজনীতিতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির। যারা নেতা হিসেবেই শামসুর হক টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে জয়ী হন। শক্তিশালী বিরোধী দল গঠনের লক্ষ্যে এখান থেকেই ১৯৫৪ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্ম সম্মেলন আহ্বান করা হয় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খানের নেতৃত্বে। মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধীতায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কোনো পাবলিক হল না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কে এম দাস লেনস্থ ব্যক্তি মালিকাধীন রোজ গার্ডেনের হলরুমে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২৫০-৩০০ ডেলিগেট অংশ নেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানীর লিখিত বক্তব্য পাঠের পর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান।

ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা

তদানিন্তন পত্রিকাগুলি সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশে আগ্রহী না হওয়ায় মাওলানা ভাসানী নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নেন। সে অনুযায়ী প্রদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব আছগর হোসেনের ঢাকাস্থ ৭৭ নং মালিটোলায় অবস্থিত ছাপাখানা হতে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয় ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট থেকে। পরবর্তীতে ইত্তেফাক ৯নং হাটখোলা রোডের পেরামাউন্ট প্রেস থেকে জনাব ইয়ার মোহাম্মদ কে প্রকাশক ও মুদ্রাকর এবং ৯৪ নবাবপুর রোডের ঠিকানায় তোফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মওলানা ভাসানির নাম থাকে। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা সাপ্তাহিক ইত্তেফাককে দৈনিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সে অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইত্তেফাক পূর্বের ব্যবস্থাপনায়

www.pathagar.com

দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রিন্টার ও পাবলিশার এবং তোফাজ্জল হোসেন (মানিক নিয়া) সম্পাদক ছিলেন।

নির্বাচনের পর সরকারি ষড়যন্ত্রে ১৯৫৪ সালের ১৪ মে রাতের অন্ধকারে ইয়ার মোহাম্মদের অজ্ঞাতসারে সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াই ইত্তেফাকের প্রিন্টার ও পাবলিশার হয়ে যান। প্রতিষ্ঠাতার বদলে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শিরোনামায় মওলানা ভাসানীর নাম ছাপা হতে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাও উধাও হয়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

১৯৪৮ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান গণ পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সদস্য পদ বাতিল হলে ৪৯ সালের মার্চে উক্ত আসনের উপনির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্য গণের ভূমিকা ছিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রতি অনাস্থারই প্রকাশ। এই সময় অনুষ্ঠিত পূর্ব বঙ্গের মুসলিম লীগ নেতাকর্মীদের এক সম্মেলনে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলীম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সেখানে বিভাগ পূর্ব আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও টাঙ্গাইল উপ নির্বাচনে সদস্য বিজয়ী তরুণ নেতা শামসুল হক কে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সরকার বিরোধী রাজনীতিতে যে নেতৃত্বের শূন্যতা বিরাজ করছিল তা পূরণ করে।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আত্মপ্রকাশ

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কে এগিয়ে নিতে সংগঠিত শক্তির অনুপস্থিতি সবার কাছেই ধরা পড়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারি ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় ভূমিকা সত্ত্বেও সংগঠনটি ব্যপক ছাত্রদের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়নি। মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও সরকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে ছাত্র সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ অবস্থায় ঐ সংগঠনের আন্দোলনকারী নেতাকর্মীদের মধ্য থেকেই নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক কর্মী সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। জনাব নঈমুদ্দিন আহমদ কে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠিত হয়। ৪৮ সালের ডিসেম্বরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মুসলীম ছাত্রলীগের অর্গানাইজিং কমিটির সভায় সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত না হলে কেন্দ্রীয় আহ্বয়াক কমিটির সদস্য ও ঢাকা শহর কমিটির আহ্বায়ক অলি আহাদ পদত্যাগ করেন।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন বসে। সেখানে জনাব দবিরুল ইসলামকে সভাপতি ও খালেক

www.pathagar.com

নওয়াজ খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এর ফলে ভাষা আন্দোলনের নব গঠিত সংগঠনটি ভূমিকা লাভে সমর্থ হয়। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই কমিটি কাজ চালিয়ে যায়। অবশ্য ইতিমধ্যেই দবিরুল ইসলামের স্থানে জনাব শামসুল হক চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। তার সভাপতিত্বে ৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সংগঠনটির নামে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ রাখা হয়।

ছাত্রদের যৌথ শিক্ষা সম্মেলন

১৯৫০ সালের ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তিনটি ছাত্র সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা সমস্যা ও নানা ধরনের সংকট সম্বন্ধে একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ উপলক্ষে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন (এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তখনকার পরিস্থিতিতে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা সম্মেলনের সঙ্গে নূরুল আমিন সরকারের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সামাদও যুক্ত ছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের কতিপয় উৎসাহি সংগ্রামী ছাত্র কর্মীদের সভায় যুবলীগের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মতিন কে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিকে ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরীতে মজলুম নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে "সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।

১। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী : সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
২। জনাব আবুল হাশিম : খেলাফতে রাব্বানী পার্টি
৩। জনাব শামসুল হক : সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৪। জনাব আবদুল গফুর : সম্পাদক, সাপ্তাহিক সৈনিক
৫। অধ্যাপক আবুল কাসেম : তমদ্দুন মজলিশ
৬। জনাব আতাউর রহমান খান : আওয়ামী মুসলিম লীগ
৭। জনাব কামরুদ্দিন আহমদ : সভাপতি, লেবার ফেডারেশন
৮। জনাব খয়রাত হোসেন : সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
৯। আনোয়ারা খাতুন : সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
১০। জনাব আলমাস আলী : নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

১১। জনাব আবদুল আওয়াল : নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
১২। সৈয়দ আবদুর রহিম : সভাপতি, রিকশা ইউনিয়ন
১৩। জনাব মোঃ তোয়াহা : সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৪। জনাব অলি আহাদ : সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
১৫। জনাব শামসুল হক চৌধুরী : ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ
১৬। জনাব খালেক নেওয়াজ খান : সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
১৭। জনাব কাজী গোলাম মাহবুব : আহ্বায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ
১৮। জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ : সিভিল লিবার্টি কমিটি
১৯। জনাব মজিবুল হক : সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
২০। জনাব হেদায়েত হোসেন চৌধুরী : সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
২১। জনাব শামসুল আলম : সহ-সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
২২। জনাব আনোয়ারুল হক খান : সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
২৩। জনাব গোলাম মাওলা : সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ
২৪। সৈয়দ নুরুল আলম : পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
২৫। জনাব মোহাম্মদ নুরুল হুদা : ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
২৬। জনাব শওকত আলী : পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির, ১৫০ মোগলটুলী, ঢাকা
২৭। জনাব আবদুল মতিন : আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
২৮। জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ : নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

আন্দোলন কার্যক্রম : ১৯৫১

যথারীতি (প্রতি বছরের মতো) ১৯৫১ সালেও ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ১১ মার্চ দিবস পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে রাষ্ট্রভাষা দিবস উপলক্ষে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য তিন-চারজন উর্দুভাষী ছাত্র প্রথমদিকে ক্লাসে যোগদানের অপচেষ্টা করে। ধর্মঘট শেষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে খালেক নেওয়াজ খানের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে হাবিবুর রহমান শেলী, বদিউর রহমান, মহম্মদ আলী, আবদুল মতিন, সিদ্দিক আহম্মদ ও মুখলেসুর রহমান বক্তৃতা করেন। বক্তারা আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে যেসব ছাত্র সুবিধা নিয়েছেন তাদের বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করে। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের (বর্তমান কলেজ) ছাত্ররা ১১ মার্চ পৃথক ছাত্র সমাবেশ করে। ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান তালুকদার এতে সভাপতিত্ব করেন। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে। আইন পরিষদের সভা তখন করাচীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হাবিবুর রহমান শেলী ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে মূল দায়িত্ব দিয়ে একটি খসড়া প্রণয়ন কমিটিও গঠিত হয়। তাদের প্রণীত খসড়া নিয়ে ডাকসু অফিসে সংগ্রাম পরিষদ ২৫ মার্চ এক সভায় মিলিত হয় এবং

www.pathagar.com

তা চূড়ান্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিনের নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

মেডিক্যাল ছাত্রদের ধর্মঘট

পূর্ব পাকিস্তান মেডিক্যাল ছাত্র এসোসিয়েশন প্রধান দুটি মৌলিক দাবি নিয়ে ১৯৫১ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘট শুরু করে। দাবি দুটি: ১. সংক্ষিপ্ত এম. বি. বি. এস. কোর্স প্রবর্তন; ২. পূর্ববাংলার মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে কলেজের উন্নীতকরণ। আন্দোলনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্ররা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সারাদেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও জড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলন শুরু হওয়ামাত্রই সরকার ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ৫জন মেডিক্যাল ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার করলে ১৩ ফেব্রুয়ারি এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল নগরীর রাজপথ পরিভ্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এই সভায় ১৫ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতীক জনসমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনসমাবেশের ওপর ১৪৪ ধারা জারি করলে আরমানিটোলার জনসভা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল স্কুলগুলোতেও কর্মসূচী পালিত হয়।

যুব সম্মেলন

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক দলের কার্যকর ভূমিকা না থাকার কথা সবার জানা। এর কারণ ক্ষমতার প্রশ্নে তৎকালীন রাজনীতিকদের অতি আগ্রহ। তাছাড়া ১৯৪৯ সালের শেষার্ধে বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগের বেশিরভাগ নেতাকে সরকার গ্রেফতার করে কারাবন্দি করেছিল। এই শূন্যতা কিছুটা হলেও পূরণে সক্ষম হয় ১৯৫১ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ। যুবলীগ গঠনকল্পে নিখিল ভারত মুসরিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মাহমুদ নুরুল হুদা ও বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাক্তন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এক প্রতিনিধিত্বমূলক যুবকর্মী সভায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের ২৭ ও ২৮ মার্চ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্বে মুসলিম লীগ সরকার নানাভাবে একে ভন্ডুল করতে উঠে পড়ে লাগে। নির্দিষ্ট দিনে সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্থল ঢাকা বার লাইব্রেরী হলসহ সার শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হলে উদ্যোক্তারা বুড়িগঙ্গা নদীর অপর তীরে ভাসমান গ্রীন বোটে যথারীতি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নদীর ওপর ১৪৪ ধারা না থাকায় গভীর রাত পর্যন্ত হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ও বিভক্ত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলীকে সভাপতি ও অলি আহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে কমিটিতে ছিলেন, ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, কে জি মোস্তফা, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনসহ ঐ সময়ের সব আন্দোলনেই যুবলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভাষা প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র ৩ মাস পরে, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করাচীর শিক্ষা সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। এরপর ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ভাষা বিষয়ক বিতর্ককে কেন্দ্র করে

অবশ্য ভাষা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পূর্বেই, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদের 'ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানে তেমনই উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত' অভিমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

প্রতিবাদ হিসাবে আজাদ পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'অধিকাংশ জনসংখ্যার ভাষা হিসেবে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত; যদি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তখন উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে' বলে পাল্টা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

এরমধ্যে পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বহু উত্থান-পতন ও রদবদল হয়। জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের উজিরে আযম হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ সারা পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে ঐতিহাসিক গণবিক্ষোভ শুরু হয় তাতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই ঢাকা সফরের সময় মানতে অস্বীকার করে গিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর দম্ভ ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় শুরু হয় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্মেলন। এ উপলক্ষে ২৭ জানুয়ারি পল্টনে মুসলিম লীগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন। তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে (ভাষণটি বেতারে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়) তিনি তার পূর্বসুরীদের মতোই আবার ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের 'একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'।

ছাত্রসমাজ তাঁর এই দম্ভোক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এই নাজিমউদ্দিনই পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ ছাত্রদের সঙ্গে বাংলাকে স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছিলেন। আগের মতই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ জানায়। রাজনৈতিক নেতাদের দ্বিধা-সংশয় উপেক্ষা করে ছাত্র সমাজই রাস্তায় নেমে আসে।

www.pathagar.com

মাত্র ৪ দিনের মধ্যে (৩০ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের (আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে পূর্বেই এই পরিষদ গঠিত হয়) ডাকে এই ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়।

পতাকা দিবস

রাষ্ট্রভাষা দিবসকে সফল করে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদও ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট, শোভাযাত্রা এবং জনসভার আয়োজন করে। এছাড়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি ঢাকা শহরে অভাবিতভাবে সাফল্য লাভ করে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিলে নেমে পড়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ছাত্রসভার পর আনুমানিক ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর একটি দীর্ঘ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিকেলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘটের (হরতালের) ডাক দেওয়া হয়। এভাবে ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়। পুলিশ কোনকিছুতে বাধা দেয়নি।

এদিকে ২১ ফেব্রুয়ারিতে সারাদেশে সর্বাত্মক হরতালের প্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে। স্মর্তব্য, ঐদিনই ছিল পূর্ববাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশন। সরকার এমনি এক জনমতের প্রাবল্যের কাছে নিজেকে অসহায় মনে করে ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় ক্রমাগত ১ মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র হরতাল, সভা মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকার জেলা প্রশাসক এই অবাঞ্ছিত নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করেন। ফলে জেলা প্রশাসক হুসেন হায়দারকে সঙ্গে সঙ্গে সিলেটে বদলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এক মুহূর্তের মধ্যে অনন্যসাধারণ পরিবর্তন দেখা দেয়। সমাজের সর্বস্তরে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হওয়ায় শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে।

১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে তীব্র বিতর্ক

ইতোমধ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে বৈঠকে মিলিত হয়। সভায় তুমুল বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করেন যে :

www.pathagar.com

আমরা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরি অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা সরকারকে সে সুযোগ দিতে চাই না।

ফলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যুবলীগের সদস্যরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। অলি আহাদ, আবদুল মতিন যুক্তি দিতে থাকেন যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারি দমননীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা হবে ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এর মধ্যে সলিমুল্লাহ ছাত্রাবাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল এসে সর্বদলীয় পরিষদকে জানিয়ে দেয় যে, 'ছাত্ররা আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে।' এ কথায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হন।

তারা ছাত্রদের এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করেন। এমন এক পরিস্থিতিতে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ শেষ পর্যন্ত বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য ভোট দেন।

মাত্র ৩ জন বাদে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকল সদস্য ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না-করার পক্ষে মত দিলেন।

সংগ্রাম পরিষদ আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যৌক্তিকতা বুঝাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ছাত্ররা যদি তা মেনে না নেয়, তবে এ সর্বদলীয় কমিটি তখন থেকেই বিলুপ্তি হবে।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ

পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ১৪৪ ধারা ও পুলিশের সকল মহড়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দলে দলে শহরের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে। ফজলুল হক হলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র গাজিউল হকের সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক বেলতলায় ছাত্রসভা শুরু হলে তাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক যখন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে কেন্দ্রীয় সংগাম পরিষদের মত জানান, তখন ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নানারূপ ধ্বনি দিয়ে তারা শামসুল হককে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে যুবলীগ কর্মী আবদুস সামাদ একটি আপস প্রস্তাব আনেন যে, যদি ছাত্ররা ৪ জন করে বের হয় তাহলে একদিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অন্যদিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানোও সম্ভবপর হবে। বলা হয় যে, এটা একধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটি সকলেরই মনঃপূত হয় এবং সেই অনুযায়ী চারজনী মিছিল সহকারে ছাত্ররা একে একে স্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার করে ট্রাকে ভর্তি করে রাখে।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতেই অনেক ট্রাক ভরে যায় এবং তাদের লালবাগ থানায় রেখে পুনরায় ট্রাক নিয়ে আসা হয়। এতসব ঘটনার মধ্যেও ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতে লাগল।

ঢাকায় প্রথম কাঁদুনে গ্যাস

শেষ দলটি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন প্রথম দলটির সঙ্গে তার সময়ের ব্যবধান ছিল আড়াই ঘন্টারও বেশি। এই সমগ্র সময়ব্যাপী বিভিন্ন পথ দিয়ে কমপক্ষে ১০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী গ্রেফতার, লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিষদ ভবন ঘেরাও করার উদ্দেশে মেডিক্যাল কলেজের প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। ঢাকায় এই প্রথম ছাত্র মিছিলে কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার হয়েছিল।

বেলা ৩টায় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এই সংঘর্ষ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাস, প্রকৌশল কলেজ ছাত্রাবাস ইত্যাদি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকবার ছাত্রদের উপরে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রবাসের ভেতর ঢুকে পড়ে পুলিশ।

ঢাকায় ছাত্রদের ওপর প্রথম গুলি

ছাত্রাবাসগুলিতে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ করায় উত্তেজনা শতগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রতিরোধকল্পে ছাত্ররাও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেলসমেত ঝটিকা আক্রমণ করে। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় দিশেহারা হয়ে আনুমানিক বেলা ৪টার দিকে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে গুলি চালায়। ঢাকায় ছাত্রদের ওপর এই প্রথম গুলি চলল। এই গুলি জব্বার ও রফিকের প্রাণ কেড়ে নেয়। এদের একজন ছিল নিকটবর্তী একটি হোটেলের 'বয়'। এই গুলির আওয়াজ শুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র আবুল বরকত মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রবাসের শেডের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। একটি বুলেট এসে তার উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর বরকত রাত আটটায় হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন।

পুলিশের গুলিতে আরও মারা যান আবদুস সালাম ও সালাউদ্দীন নামের দু'জন। এই ঘটনায় আহত হন আরও ১৬ জন।

সরকার বিকল : মন্ত্রীদের পলায়ন

বিকেল তিনটায় আইন পরিষদের অধিবেশন বসে। বিপর্যস্ত মুসলিম লীগ সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় 'বাংলা'কে পাকিস্তানের 'সরকারি' ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাস করে। কিন্তু গুলি চালানোর প্রতিবাদে দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দল থেকে পদত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে সরকারি দল এই সময়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মন্ত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সামরিক ছাউনিতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। নূরুল আমিন এই সময়ে এক হাস্যকর বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তোলেন। তিনি পত্রিকায়

www.pathagar.com

এক বিবৃতিতে আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের কারসাজি বলে উল্লেখ করে বলেন: কমিউনিস্ট সাপ, তারা গর্তে থাকে, রাত্রিবেলায় বের হয়। তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে পায়জামা পরে হিন্দুরা এসে এই আন্দোলন করছে।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : পরবর্তী কর্মসূচী

নির্বাচন বানচাল হওয়ার আশংকায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রসমাজ সে মত অগ্রাহ্য করে ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়েছিল। সেদিন গুলিবর্ষণের পর আনুমানিক বিকেল ৪ টায় আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের সঙ্গে ঢাকা মেডিকেলের গেটে দেখা হয় ভাষাসৈনিক অলি আহাদের। সেখানে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য যুবলীগের কর্মীদের দায়ি করেন শামসুল হক। অলি আহাদ একে অপরাধ বিবেচনা না করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পরবর্তী কর্মসূচির কথা বলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার ফলে সর্বদলীয় পরিষদের বিলুপ্তি ঘটেছে।

এদিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের উত্তরদিকের বটগাছে মাইকের হর্ন বেঁধে ২০ নং ব্যারাক হতে আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ঘোষণা ও আহবান প্রচার হতে থাকে । মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং যুবলীগের নেতাদের যৌথ সভায় আলোচনা করে পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৭টায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে গণ-গায়েবী জানাযা, পরে জনসভা ও জঙ্গি মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ।

২২ ফেব্রুয়ারি রাত ৯ টার দিকে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ৪ নং ব্যারাকের ৩ নং রুমের অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য গোলাম মাওলাকে অন্তর্বর্তীকালের আহবায়ক করে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসময় গ্রেফতার এড়াতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে অলি আহাদের মতো অল্প কয়েকজনই এই গুরুদায়িত্ব পালনে সক্রিয় ছিলেন। নিঃস্বার্থ কর্মী বাহিনী ও সংগ্রামী জনতার সক্রিয়তায় কোন কিছুই আটকে থাকে নি।

সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার সুবিধাবাদ

সারা পূর্ববাংলা যখন ছাত্রহত্যাসহ অন্যান্য জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখর তখন পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দারাবাদ শহরে অবস্থানকারী 'জিন্নাহ আওয়ামী লীগের' সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের নিন্দা করে বিবৃতি দিলেও, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত বলে বিবৃতিতে মত প্রকাশ করেছিলেন।

পূর্ববাংলায় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। সুযোগসন্ধানী দৈনিক আজাদ দ্রুত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার নিন্দা করে। কিন্তু এতে সমস্যায় পড়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। সবাই জানত জিন্নাহ আওয়ামী লীগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অলিখিত সম্পর্ক রয়েছে। সিলেট জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি নূরুর রহমান এক বিবৃতিতে এর নিন্দা করেন এবং বলেন: সোহরাওয়ার্দীর উক্তির সহিত আওয়ামী লীগের নীতিগত কোনোই প্রশ্ন জড়িত নহে, অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত লীগের সাথে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলীম লীগের কোনো সম্বন্ধ নাই।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকও এর নিন্দা করে বিবৃতি দেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- সে সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষা-সংক্রান্ত বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা বেশ অসুবিধায় পড়ি। তাই ঐ বছরই জুন মাসে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য করাচী যাই এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বাংলার দাবির সমর্থনে তাকে একটি বিবৃতি দিতে বলি।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবশ্য পরে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং ১৯৫২ সালেরই ২৯ জুন সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে তা প্রকাশিত হয়।

নতুন সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম

১৯৫২ সালের এপ্রিলের তখন শেষভাগ। ভাষা আন্দোলন পুনরায় শুরু করার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে ঢাকায় এক সম্মেলন (Convention) আহ্বান করা হয়। গ্রেফতার হননি এমন ছাত্র নেতৃবৃন্দও হুলিয়া মাথায় নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেন। এক সময়ে কনভেনশনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ ঢাকার বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে আলাদাভাবে মিলিত হন। এই পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের উপলব্ধির চেতনায় কনভেনশনে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেদিন ছিল ২৬ এপ্রিল। সেখানেই জন্ম হল পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের। কাজী আনোয়ারুল আজিম ও সৈয়দ আবদুস সাত্তারকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে প্রথম আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। স্মর্তব্য, প্রায় একই চিন্তা ও চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় একই সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে 'ছাত্র ইউনিয়ন' নামে আলাদা আলাদা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কনভেনশনে এদের সম্পর্কেও আলোচনা হয়। পরবর্তী সময়ে এসব সংগঠন একই পতাকাতলে যোগদান করে। দিনাজপুর, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে এই যে বিচ্ছিন্নভাবে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন জন্ম নিচ্ছিল তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকেই বোঝা যায় ভাষা আন্দোলন সমগ্র প্রদেশব্যাপী কী ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ঢাকায় কনভেনশনের পূর্বেই সমগ্র পূর্ববাংলায় একটি অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্রসংগঠন গড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই।

এদিকে ১৯৫৩ সালের শুরুতেই কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক ঘোষণায় ছাত্র-জনসাধারণের কাছে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ স্মরণে রোজা রাখারও আহ্বান জানায়।

www.pathagar.com

২০ ফেব্রুয়ারি ছিল শুক্রবার। এদিন ঢাকায় জুম্মার নামাজের পর ভক্তরা সজল চোখে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করে। ছাত্রাবাসগুলিতে ছাত্রদের অনেকেই এদিন সংগ্রাম পরিষদের ডাকে রোজা রাখে।

২১ ফেব্রুয়ারি খুব ভোর থেকেই প্রভাতফেরি করে ছাত্র-জনতা দলে দলে যখন মিছিল করে আজিমপুর গোরস্থানে যাচ্ছিল তখন সকলে চোখেই অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দেয়া ভালোবাসার ফুলে-ফুলে ছেয়ে যায় শহীদদের কবরগুলো।

৫৩ সালের ১১ মার্চ

১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ ভাষার দাবির স্মরণে প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করত। মাঝখানে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটে যাওয়ায় প্রতি বছর একুশে পালনের রেওয়াজ আসে। তথাপি ১৯৫৩ সালেও সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে এ দিবসের তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বার অ্যাসোসিয়েশনের মিলনায়তনে। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় অংশ নেন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও জমিরুদ্দিন, কমিউনিস্ট পার্টির আবদুল মতিন, গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী, তমুদ্দুন মজলিশের আবদুল গফুর, সাংবাদিক ইউনিয়নের গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি ও সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এক নির্দেশ জারি করে। ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য ১০ জন ছাত্রনেতা কর্তৃপক্ষ বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ যেভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন তা ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ এবং পদ্ধতিগত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক চরম উসকানিমূলক কাজ করে বসে। পরদিন ১০ জন ছাত্রনেতাকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। দুজন ছাত্রনেতার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি কেড়ে নেয়া হয়। (গাজীউল হক ও জিল্লুর রহমানের)।

ঘটনাটি ছিল ১৯৫৩ সালের ১৪ এপ্রিলের। পরদিনই ছাত্ররা প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে। এর মধ্যে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ছাত্রবেতন অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সরকারের এই শিক্ষাবিরোধী নীতি, বিদ্যালয়ের পবিত্রতা লঙ্ঘন, ছাত্রদের স্বাধীনতা হরণ, ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির ওপর হামলার প্রতিবাদে নতুন করে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকা কলেজের বহিষ্কৃত ছাত্রদের ব্যাপারটিও দাবির মধ্যে সংযুক্ত হয়।

১৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা এবং ২৫ এপ্রিল (মতান্তরে ১৭ এপ্রিল) পল্টন ময়দানে (বর্তমান আউটার স্টেডিয়াম) জনসভার ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু এইজন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি সরকার না দেয়ায় ছাত্রসংগঠনগুলি সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতিটি ছাত্র ১০ থেকে ২০ জন লোকের কাছে জনসভার কথা প্রচার করবে। নির্দিষ্ট দিন বিকাল ৪ টার

www.pathagar.com

পূর্বেই উদ্যোক্তাদের অবাক করে দিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও ৩০ হাজারের বেশি লোক জনসভায় উপস্থিত হয়। এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজারে পৌঁছে। ফলে মাইকবিহীন বক্তৃতা দিতেও সমস্যা দেখা দেয়। অনেকটা যাত্রা অভিনয়ের মতো বক্তারা মাঝখানে একটি টেবিল নিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ফজলুল হক হলের ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান। মাওলানা ভাসানী এক দীর্ঘ বক্তৃতায় (ইতোমধ্যে তিনি ২১ এপ্রিল মুক্তি পান) সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করেন।

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের কিছুদিন পরেই সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত হানে। আগে কার্যকরী কমিটির (বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে সিন্ডিকেট) সুপরিচিত কৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে উপাচার্য নিয়োগ হতেন। কিন্তু নতুন আইনে এই দায়িত্ব সরাসরি সরকারকে প্রদান করা হয়। এমনি আরও কতিপয় স্বৈরতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা হয়। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করে। সরকারও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট ডাকা হয়। সম্ভবত এটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম লাগাতার ধর্মঘট।

ভাষা আন্দোলনের পরে, বিশেষ করে ২১ ফেব্রুয়ারির পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভাবমূর্তি সমগ্র পূর্ব বাংলায় অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা যেমন বেশি ছিল না, তেমনি ছাত্র সংগঠনের সংখ্যাও ছিল অতি অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলো স্বতন্ত্রভাবে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করত। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তেমন সংযোগ রক্ষা করা হতো না। রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্য মাঝে মাঝে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ রাখত। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম এবং ছাত্র রাজনীতির ধারা ছিল অনেকটা সমান্তরাল, যেন রেলপথের দুটি লাইন কাছাকাছি কিন্তু একটি অপরটিতে লীন হয়নি। তাই দেখা গেছে জাতীয় অর্জনের মহৎ অধ্যায়গুলোতে রাজনীতিকদের পরিণত মেধা এবং ছাত্রছাত্রীর সহজাত তারুণ্যের স্পর্ধা সম্মিলিত হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কথাগুলো বলছি যুক্তফ্রন্টের অভাবনীয় বিজয়কে স্মরণে রেখে।

যুক্তফ্রন্টের আগে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট'

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এই যুক্তফ্রন্ট গঠনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি জোট গঠন যা আজ ইতিহাসে চাপা পড়ে গেছে। ১৯৫৩ সালে ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে মোকাবিলা করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ পরিষদ দেয়ার লক্ষ্যে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি জোট গঠন করে।

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়নের এস. এ. বারী. এ টিকে সহ-সভাপতি এবং ছাত্রলীগের জুলমত আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে যৌথ পরিষদ মনোনয়ন দান করা হয়। এই পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারাদেশের ছাত্ররাজনীতি থেকেই 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামক সরকারি সংগঠনটিকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য করে। সলিমুল্লাহ হল ছাত্র-সংসদের নির্বাচনেও আবদুল লতিফ-আলাউদ্দিন আল আজাদ (ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত) পরিষদও জয়লাভ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, ছাত্রদের এই গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট ছিল তার পূর্বসুরী। এই ফ্রন্ট এবং তার সাফল্যই রাজনীতিকদের চোখ খুলে দেয়। তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী সংগ্রামে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা।

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন একত্রীকরণ প্রচেষ্টা

ভাষা আন্দোলনের পরই সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের মূলসূচি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতার হাওয়া। এ পরিবর্তন আনতে অধিকতর সহায়তা করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। কারণ ছাত্র ইউনিয়নে জমায়েত হয়েছিল অধিকাংশ ভাষা-সৈনিকরা। পূর্ববাংলার রাজনীতির এই নতুন গতিপথের প্রভাব পড়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগেও। এই সংগঠনের নেতা-কর্মী মহলে দীর্ঘসময় ধরে সংগঠনের নামে 'মুসলিম' শব্দটি প্রগতিশীল আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এক বিরাট বাধা হয়ে দেখা দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিষয়টি এক মুখ্য আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে বর্তমানে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে যে প্রগতিমুখী চেতনার ধারা বইছে তাতে এভাবে আর আগানো অসম্ভব। এদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে দলীয় মতাদর্শের উর্ধ্বে সকল প্রগতিকামী ছাত্রের জন্য একটিমাত্র সংগঠন রাখার অঙ্গীকারের ফলশ্রুতিতে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের যৌথ বৈঠক শুরু হয়।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের এসব আলোচনা চলছিল ১৯৫৩ সালের শেষ দিকে এই আলোচনা অবশ্য শেষপর্যন্ত ১৯৫৫ সাল অবধি অব্যাহত ছিল। এই সময় আলোচনা চলত ফজলুল হক হলের পূর্ববাড়ির ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হাসান হাফিজুর রহমানের ১১ নম্বর কক্ষে। ১৯৫৩ সালের যৌথসভায় ঠিক হল ১৯৫৪ সালের ১৪/১৫ জানুয়ারি ঢাকায় দুই সংগঠনের সম্মেলন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। একটিমাত্র সংগঠন গড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরাই গ্রহণ করবেন।

দুই সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিত্তিতে ১৬ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী ছাত্রদের একটিমাত্র সংগঠন 'নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা' [All Pakistan Students Organisation (APSO)] গঠন করা হবে এবং এই উদ্দেশে ৯ সদস্যের (ছাত্রলীগ থেকে ৪ জন, ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ৪ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১ জন) একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাপত্রের একটি খসড়াও তৈরি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু ছাত্রলীগ সম্মেলনে এই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সামনের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঠিক হবে না। ছাত্রলীগে এ নিয়ে দ্বিমতের সৃষ্টি হলে মহান উদ্যোগটি ভণ্ডুল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠনে ছাত্রসমাজ

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত যৌথ (গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট) পরিষদ জয়লাভ করার পর থেকেই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলে দেশের বৃহত্তর রাজনীতি থেকে স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ববাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করবার আওয়াজ তুলেছিল। আর এই আওয়াজটি প্রথমে তুলেছিল পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট এ ব্যাপারে পথ দেখায়। এ ছাড়া দেশের বিবদমান রাজনীতিতে অনৈক্য এবং বিভেদের কারণে সরকার ও মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না।

তবে দলগতভাবে যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বেশি বিরোধী ছিলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং তার নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ছাত্ররা এ ব্যাপারে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং শেরে বাংলার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে তার মতামত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা তাকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে আসে। ছাত্ররা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকেও রাজি করাতে দলীয় কার্যালয় ও বাসভবনে ধরনা দেয় এবং সম্মতি আদায় করে আনে। এই সময় ছাত্রলীগও সাংগঠনিকভাবে এ ধরনা দেওয়া আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত 'যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবির' গড়ে তোলে। বলতে গেলে নির্বাচনের পুরো সাংগঠনিক কাজটা ছাত্ররা একাই করে।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৪-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিস্থিতির চাপেই পূর্ব বাংলার ৩ নেতা মওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলেন। ছাত্রদের ওপর অর্পিত হয় এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মার্চের ঐ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সাথে ছাত্রদেরও থাকতে হয় প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায়। প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল উল্লেখজনক। এর বড় কারণ দেশের মানুষ ছাত্রদের কথা শুনতে চায়। ছাত্ররা সে দায়িত্ব পালন করেছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়িয়েছিল। প্রায় মাসখানেক বিশ্ববিদ্যালয় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে ঐ

www.pathagar.com

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। ছাত্রদের বেশ কয়েকজন মুসলিম লীগের বাঘা বাঘা নেতাদের লজ্জাজনকভাবে পরাস্ত করেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা তরুণ খালেক নেওয়াজ। নান্দাইলের নির্বাচনী এলাকায় যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এছাড়া গাজিপুরের কাপাসিয়ায় তরুণ যুবলীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ ও নোয়াখালীতে মো. তোয়াহাও নির্বাচিত হন। ঐ নির্বাচনে কোনো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারেননি।

জয়লাভ স্থায়ী হয়নি

সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৮টি আসন। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পাস করেন ৫টি আসনে। মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার মানুষের মন থেকে উঠে যায়। যদিও এই বিজয় দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায়নি। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ সরকারও সে সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায়। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার মাত্র ৫৬ দিন পরে দেশে ১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইনের '৯২-ক ধারা' অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল পূর্ব বাংলার শাসনভার প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। নেমে আসে নির্যাতনের স্টিমরোলার।

রাজনীতির নোংরা খেলা

যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও মুসলিম লীগের কবর রচনার মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ এই প্রথম মুক্তির স্বাদ পেতে যাচ্ছিল। কিন্তু শুরুতেই এক অনাকাঙ্ক্ষিত খেলা শুরু হয়ে যায় জনগণকে নিয়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা তো বটেই, এমনকি পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতারাও নিজ স্বার্থপরতায় জনগণকে জিম্মি করে একের পর এক খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাদের এই কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত রাজনীতির ফলে এদেশে সে সময়ই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয় এবং সামরিক শাসনের পথকে প্রশস্ত করে তোলে।

এই অন্ধকারের বুকে পা দিয়েই ছাত্রদের আবার নতুন করে রাজনীতির গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। রাজনীতিকরা যে নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তা জাগানোর দায়িত্ব পড়ে শেষপর্যন্ত পূর্ববাংলার আজীবন সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ওপরই।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ও জটিলতা

৩ এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাংলা ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোনো মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে না। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকেও মন্ত্রী হিসেবে তালিকাভুক্ত করায় ফজলুল হক অসন্তুষ্ট হন এবং বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই জট খুলেছিল এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা শপথ নিয়েছিলেন। এইজন্য ১৫ মে পর্যন্ত অপেক্ষা

www.pathagar.com

করতে হয়েছিল। কিন্তু এই মন্ত্রীসভা টিকেছিল মাত্র পরবর্তী পনের দিন। মন্ত্রীসভা গঠনে অনর্থক এই জট সৃষ্টিতে যুক্তফ্রন্টে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাই চেয়েছিল এবং তারা তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

আদমজী দাঙ্গা

ষড়যন্ত্রের এখানেই শেষ নয়। যেদিন (১৫ মে) যুক্তফ্রন্টের সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ নেন, সেদিনই আদমজীতে শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে এক ভয়াবহ বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া হয়। দাঙ্গায় প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ বিষয়টিও কাজে লাগায়।

শাসনতন্ত্রের ৯২(ক) ধারা জারি

পূর্ববাংলায় এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্নর জেনারেল ছিলেন গোলাম মোহাম্মদ আর প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। সকল কূট ও ষড়যন্ত্র যখন চূড়ান্ত তখন ৩০ মে (১৯৫৪) মাত্র ১ মাস ২৭ দিন ক্ষমতায় থাকার পর কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম করা হয়।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তেমন কোনো আন্দোলন গড়ে উঠেনি। দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনের মাঠ ছিল স্তিমিত। কেবল ছাত্ররা এই পরিবেশের মধ্যেও ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের রেশ ধরে রাখার চেষ্টা করে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করবার চেষ্টা হয়। সরকারি প্রতিরোধের মুখেও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের আন্দোলন চলতে থাকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২ (ক) ধারা জারি হওয়ায় নতুন গভর্নর ছাত্র আন্দোলন যাতে আর না বাড়তে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সামনের (১৯৫৫ সালের) একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানও যাতে ছাত্র-জনতা না করতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। তখন নেতৃবৃন্দ অনেকেই ছিলেন কারাগারে অথবা আত্মগোপন অবস্থায়।

একুশে ফেব্রুয়ারি ভোর হওয়ার পূর্বেই ছাত্রাবাসগুলো পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও করে রাখা হয়। ফজলুল হক হলের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে গ্রেফতার করা হয় আটজনকে। সলিমউল্লাহ হল ও ইকবাল হলেও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয় এবং কালো পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থানে গড়া স্মৃতিস্তম্ভ থেকেও প্রায় দশজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

ভোর হওয়ার পূর্বেই এতসব ঘটনার পরও লাল ব্যাজ পরে শত শত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় হাজির হতে থাকে। কিন্তু পুলিশ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘক্ষণ ঘিরে রাখে এবং একপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে থাকে। ব্যাপক হারে চলতে থাকে গ্রেফতারি অভিযান। এতে জেলখানা ভরে যেতে থাকে।

এবারের গ্রেফতারকৃতদের তালিকার বৈশিষ্ট্যটি ছিল তাতে স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রদের স্থান দখল। শুধুমাত্র ছাত্রীই গ্রেফতার হয়েছিল ১৫০ জন। বাচ্চা বয়সের বলে অনেক স্কুলবালকের অভিভাবক এসে বন্ড সই দিয়ে তাদের মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এতে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিল পগোজ স্কুলের ছাত্র ওবায়দুর রহমান। তার চাচা তাকে বন্ড সই দিতে বললেও সে দিতে রাজি না হওয়ায় জেলারের সামনেই চাচা তাকে এক চড় বসিয়ে দেন। কিন্তু ওবায়েদ তাতেও না দমে দৌড়ে জেলখানার ভেতরে চলে যায়। আরেকজন ছাত্র মোজাম্মেল হক ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়েও বন্ড দিতে অস্বীকার করে। এসব ঘটনা সকল বন্দি ছাত্রকে নাড়া দেয় এবং সকলেই এরপর বন্ড দিতে অস্বীকার করে। শত চাপের মুখেও কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের টলাতে না পেরে কিছুদিন পরই আটকৃতদের মুক্তি দেয়।

৯২(ক) ধারার বিরুদ্ধে এটাই ছিল সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ। ১৯৫৫ সালের একুশের অনুষ্ঠান পালনের এই জঙ্গীপনার ফল খুব শীগ্রই আসতে লাগল। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলায় ৯২ (ক) ধারার এই পর্যায়ের অবসান ঘটে। যুক্তফ্রন্টকে আবার মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানানো হয়।

শাসনতন্ত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি এবং ছাত্র আন্দোলনে জটিলতা

পূর্ববাংলার নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট বাতিল করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন ৯২(ক) ধারা জারি করে তখন শেরেবাংলা ফজলুল হক ঘোষণা করেন তিনি আর রাজনীতি করবেন না। (২৩ জুলাই ১৯৫৪-এর জাতীয় দৈনিকসমূহ দ্রষ্টব্য)। মওলানা ভাসানী পূর্বেই শান্তিসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ইউরোপে আটকে পড়েছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেটের ফোড়া অপারেশন করার কথা বলে সুইজারল্যান্ড চলে যান।

১১ ডিসেম্বর (১৯৫৪) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হওয়ার আশ্বাস পেয়ে করাচী ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে সামান্য আইনমন্ত্রী পদে ২০ ডিসেম্বর যোগদান করেন। এই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীই ১৯৪৬ সালে যুক্ত বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর অধীনে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। এবারের মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন আইয়ুব খান।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হয়েই এক ইউনিট প্রথা, সংখ্যাসাম্য নীতি এবং সংবিধান কনভেনশনের কথা ঘোষণা করেন। এক ইউনিট ছিল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু এই চারটি প্রদেশের পরিবর্তে একটি প্রদেশ; সংখ্যাসাম্য নীতি ছিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদ-সদস্যের কোটা না ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন (এর

www.pathagar.com

মধ্যে আবার পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির জন্য মুসলমান আসন ৩১, অমুসলমান আসন ৯) এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। আর এসব আইনসম্মত করার জন্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সম্মেলন ডাকা এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

সারা পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ববাংলায় এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠে। এমনকি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দল আওয়ামী লীগও এই ঘোষণায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তবু সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, এমনকি প্রতিবাদ করে ন্যূনতম বিবৃতি দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত পরিকল্পনাটি আওয়ামী লীগ দ্বারা শর্তসাপেক্ষে গৃহীত হলে ছাত্রলীগ সোহরাওয়ার্দীর এই সর্বনাশা পরিকল্পনার মৌন সমর্থকে পরিণত হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যেই বলেছিলেন যে যদি দেশবাসী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই প্রথম রাজনীতিক ব্যক্তি যার বক্তব্য এভাবে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সম্ভাব্যতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। পূর্ববাংলার ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে।

এই সূত্র ধরে ৭ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট (১৯৫৫) পর্যন্ত মারীতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ যখন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা ও প্রচার করে তখন পূর্ববাংলার সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সরগরম হয়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালের শেষার্ধে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে সোহরাওয়ার্দী যখন ক্ষমতাচ্যুত তখন ইতোপূর্বের সংবিধান সমর্থক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগও মোহগ্রস্ততা কাটিয়ে আন্দোলনে শরিক হতে বাধ্য হয়।

সর্বস্তরের এক রাজনৈতিক সমাবেশে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদ এই পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হয়। এতে মাওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান এবং অলি আহাদ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পরিষদ ২৯ জানুয়ারি (১৯৫৬) সমগ্র দেশব্যাপী 'প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সারাদেশে প্রতিবাদসভা সহ সফল ধর্মঘট পালিত হয়। তখন পূর্ব বাংলায় শেরে বাংলা ফজলুল হক সমর্থিত আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম ও অলি আহাদ (আওয়ামী লীগ), মোহাম্মদ সুলতান ও আবদুস সাত্তার (ছাত্র ইউনিয়ন) এবং আবদুল আউয়াল (ছাত্রলীগ) মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। তারা পূর্ববাংলার সংসদ অধিবেশন আহ্বানেরও দাবি জানান। ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশব্যাপী কর্মপরিষদ প্রস্তাবিত সংবিধানের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালন করে।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালের একুশে

১৯৫৬ সালের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত। কারণ ১৯৫৫ সালের ৩ জুন ৯২(ক) ধারা তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং গভর্নরের শাসনের পরিবর্তে ৬ জুন যুক্তফ্রন্টের সরকার (আওয়ামী লীগ ছাড়া) কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এই প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একুশে পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই প্রথম ছাত্রছাত্রীরা সরকারের নির্যাতন ব্যতীতও ভাষা আন্দোলন দিবস পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এবছরই প্রথম এ দিবস পালন করতে গিয়ে কেউ গ্রেফতার হয়নি। কিন্তু এ বছরের দুঃখজনক ঘটনা ছিল গণতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্য ও বিভক্তি। কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবুল কাশেম ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে বিবদমান মতবিরোধে কারণে একুশে ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি।

যদিও একুশের ভোরে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার নগ্ন পদযাত্রা, কালোব্যাজ পরিধান, প্রভাতফেরির গান ঐক্যবদ্ধভাবেই শুরু হয়েছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এলোচুলে সদ্যস্নাত অবস্থায় নগ্নপদে অশ্রুসজল নয়নে শহীদদের কবরে উপস্থিত হয়। বহু মহিলাকে দেখা যায় কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় শহীদদের কবর জেয়ারত করছেন। বরকতের মা ও বোন কবরস্থানে আগমন করলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক শূন্যতত্ত্ব

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতির বিরোধীতা করে পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিরোধীশক্তি হিসেবেই জিন্নাহ আওয়ামী লীগের জন্ম দিয়েছিলেন। পরে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগে যুক্ত হয়ে যায়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যে বিরাট প্রভাব ছিল তা আওয়ামী মুসলিম লীগের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের ব্রিটিশ ও মার্কিনঘেঁষা নীতিতে আওয়ামী লীগকেও জড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগকে পূর্বের তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা থেকে যে শুধু সরে আসতে হয় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ হিসেবেও কাজ করতে হয়। যে কাজ করার কথা ছিল মুসলিম লীগের, শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ দ্বারা তা করিয়ে নিয়েছিলেন।

এর পেছনে তৎকালীন পাকিস্তানি রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক শূন্যতত্ত্ব কাজ করত। সোহরাওয়ার্দী প্রায়ই সভা-সমাবেশে এই শূন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, জোটনিরপেক্ষতার নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে মৈত্রী অযৌক্তিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা শূন্য। সুতরাং পাকিস্তানের মতো দেশ 'শূন্য' হয়ে আরেকটি 'শূন্যের' সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে

www.pathagar.com

তার ফল শূন্যই হবে, (শূন্য+শূন্য=শূন্য)। কিন্তু যদি ব্রিটেন অথবা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী হয় তাহলে তাদের শক্তির বহর যদি ৫ হয় তাহলে শূন্যের সঙ্গে যোগ করলে তাও অর্থাৎ পাকিস্তান পাঁচ হবে (০+৫=৫)।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই তত্ত্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এই নীতির প্রশ্নে শেষপর্যন্ত ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়েছিল।

শেখ মুজিবকে ফিরে যেতে হলো

১৯৫৬-৫৭ সালের ডাকসু সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা সভা করার জন্য ঢুকবেন না। এই সময় ডাকসুর সঙ্গে ছাত্রলীগের এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ছাত্রলীগ নেতা আবদুল আউয়াল প্রস্তাব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবকে আনবেন।

এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট দিনে শেখ মুজিবকে নিয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার মুহূর্তে ডাকসুর সহ-সভাপতি (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত) একরামুল হকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র ফটকে শেখ মুজিবকে প্রবেশ করতে বাধা দান করে। শেখ মুজিব ডাকসু নেতৃবৃন্দের যুক্তি মেনে নেন এবং সভা না করে ফিরে যান।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন

ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশে ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা তখন ক্ষমতায়। কমিশনের সুপারিশে বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশও কমিশন উপস্থাপন করে।

সংস্কৃতি সম্মেলনে স্বাধীনতার চিন্তা

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারীর সংস্কৃতি সম্মেলনে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে পশ্চিম পাকিস্তানে 'আচ্ছালামু আলায়কুম' জানানোর বাসনা প্রকাশ করেন। অবিলম্বে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে মাওলানা ভাসানী বলেন, তা না হলে ভবিষ্যতে পূর্ববাংলা 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলার প্রবণতা অনুভব করতে পারে। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এর মাধ্যমে মাওলানা ভাসানী সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বান জানাননি, তবে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আসহাবউদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান একে সমর্থন করে বক্তৃতা দেন।

একের পর এক মন্ত্রিসভার পতন

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ছিল এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিবিদদের ছেলেমিপনা, স্বার্থপরতা এবং দায়িত্বহীনতা সেদিন জাতিকে যেভাবে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিপতিত করে তাতে একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ঘাড়ে দোষ চাপালে আসল ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়। বরং বলা চলে, সে সময় তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ছিল প্রতিক্রিয়ারই নামান্তর।

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কোন্দলের কারণে ১৫ মে সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে ৯২(ক) ধারা জারি করা হয়। ২৩ জুলাই ফজলুল হকের রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা এবং সোহরাওয়ার্দীর সুইজারল্যান্ড যাত্রা। ১৪ নভেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির স্বঘোষিত অবসর গ্রহণকারী ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের মধ্যে ঢাকা বিমানবন্দরে তাকে মালা দেওয়ার এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কারস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারে আওয়ামী লীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দী (২০ ডিসেম্বর) আইনমন্ত্রী এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার (৪ জানুয়ারি ১৯৫৫) স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তাদের প্রভু কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ৩ জুন (১৯৫৫) পূর্ববাংলা থেকে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করেন। ৬ জুন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পূর্ববাংলায় নতুন সরকার গঠন করেন। ৫ আগস্ট (১৯৫৫) গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বিদায় নেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা নতুন গভর্নর জেনারেল হন। ১০ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত শেরে বাংলা ফজলুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিদায় নিয়ে বিরোধীদলে বসেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বিদায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় রাষ্ট্রদূতের চাকুরি ধরেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯৫৫) নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন কেন্দ্রীয় সরকারে।

প্রথম সামরিক শাসন : সাধারণ মানুষের উল্লাস[৭]

তবে ঘন ঘন ক্ষমতার রদবদল, একের প্রতি আরেকজনের কূটচাল, বিভেদ এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতি সাধারণ মানুষের মনকে সত্যি বিষিয়ে তুলেছিল, সমগ্র ছাত্র সমাজকে হতাশ করে তুলেছিল, তেমনি রাজনীতি ও আন্দোলনবিমুখও। ফলে প্রথম সামরিক আইন জারির সংবাদ মানুষ শুধু মেনেই নিল না তারা এ থেকে অতিরিক্ত

www.pathagar.com

আশাবাদীও হয়ে উঠল। সারাদেশে কথিত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সামরিক শাসনকে, সাধারণেরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই গ্রহণ করল। পাশাপাশি রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতনকে মানুষ এর থেকে আলাদা করে দেখতে চাইল না। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আর কিছু করার থাকেনি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আইয়ূব খান সামরিক শাসন জারির কয়েকদিন পরই ঢাকায় এলে সর্বস্তরে তিনি প্রাণঢালা সংবর্ধনা লাভ করেন। ঢাকা ষ্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় তিনি একটি বক্তৃতাও দিয়ে ফেলেন এবং তাতে তিনি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে তার জেহাদের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। চতুর জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। প্রথমে ইস্কান্দার মীর্জার অধীনে ৭ অক্টোবর শুধুমাত্র প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, এর ১৭ দিন পর ২৪ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জার অধীনেই প্রধানমন্ত্রী এবং এই ঘটনার ৩ দিন পরেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন।

সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণার বলে পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংসদগুলোকে বাতিল করে দেয়। বিক্ষুব্ধ ও সচেতন ছাত্রদের ঘাঁটি বলে পরিচিত অনেক প্রতিষ্ঠানই বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সৃষ্টির 'উসকানিদাতা' বলে পরিচিত অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন কৌশলে ছাত্র সংগঠন

সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই নয় শুধু, নির্বাচনেও তারা সংস্কৃতিমনা নাম নিয়ে আসরে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগের শিল্পসাহিত্য সংঘ, ছাত্রশক্তির সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ছাত্র মজলিশ ও তামিয়ে মিল্লাত নামে ইসলামী ছাত্রসংঘ কাজ করে। এমন নাম সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলোতেই ছড়িয়ে পড়ল, যেমন– অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক, দিশারী ইত্যাদি নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুব খান

সামরিক শাসন ও তার প্রণেতার প্রতি ছাত্রদের মোহ থাকতে থাকতেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় UOTC-এর ক্যাডেটরা তাকে 'গার্ড অব অনার' দেয়। এখানে তাকে দেখতে আসা সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন: আপনাদের চোখে আমি দেশপ্রেম জ্বলজ্বল করতে দেখছি। বস্তুত ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা সত্যি জ্বলজ্বল করছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা প্রবল আকার ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়। আইয়ুব খানকে

www.pathagar.com

সেদিন শুধু তা টের পাইয়ে দেয়নি, কাঁপিয়ে তুলেছিল সমগ্র সামরিক শাসনের ভিতকেই।

ডাকসু নির্বাচন : ১৯৫৯

সামরিক শাসনের মধ্যেই ১৯৫৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সে সময় ছাত্র সংগঠনের নামে নির্বাচন করা যায়নি, তথাপি ৪টি ছাত্র সংগঠন ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে– ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সরকারি এন. এস. এফ. ও ছাত্রশক্তি। নির্বাচনের ফলাফল সব মিলিয়ে আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই যায়:

ডাকসুতে	:	আমিনুল ইসলাম তুলা, ছাত্র ইউনিয়ন
		আশরাফ উদ্দিন মকবুল, যুক্তপ্রার্থী
সলিমুল্লাহ হল	:	যুক্তপ্রার্থী
ইকবাল হল	:	ছাত্র ইউনিয়ন
ঢাকা হল	:	ছাত্র ইউনিয়ন
জগন্নাথ হল	:	ছাত্র ইউনিয়ন
রোকেয়া হল	:	ছাত্র ইউনিয়ন

এবারের নির্বাচিত পরিষদই ডাকসু ও হল সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র তৈরি করে, যা আজো চালু রয়েছে।

www.pathagar.com

'৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলন

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইয়ুব খান দেশের ক্ষমতা দখল করার পর পরই সম্ভবত প্রথম ময়মনসিংহে এর বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। সামরিক চক্র মিছিলের নেতা ছাত্র নেতা কাজী আবদুল বারীকে গ্রেফতার করে এবং সামরিক আদালতে তাকে ১০টি বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। কাজী আবদুল বারী এর ফলে চিরদিনের জন্যে বধির হয়ে যান।

সামরিক শাসক চক্র বাংলার অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলো বাতিল করে দেয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অনেক শিক্ষককে ছাত্র আন্দোলনে সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ বিতাড়িত করা হয়।

সামরিক শাসকের শিক্ষানীতির বিরোধীতা

ক্ষমতা গ্রহণের পরেই জেনারেল আইয়ুব খান শিক্ষার সংস্কারকে তার আশু কর্তব্য বলে ঘোষণা করেন এবং সে উদ্দেশে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুব খানের শিক্ষক ডঃ এস এম শরিফের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষার ওপর খুব বেশি রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ছাত্রদের সব রাজনৈতিক কার্যকলাপ কিংবা রাজনৈতিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয় এবং এটাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

উক্ত রিপোর্টের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল :

১। ব্যাচেলর ডিগ্রী ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করা।

২। প্রতিটি সেশন বা বছর সমাপ্তির পর কেন্দ্রীয় একটি পরীক্ষা ব্যবস্থা করা যাতে কোর্স চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একজন ছাত্রের যোগ্যতা যাচাই করা যাবে।

৩। প্রথম বর্ষের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে সম্মান কোর্সের ছাত্রটি সম্মান কোর্স চালিয়ে যাবে, না পাস কোর্সে স্থানান্তরিত হবে।

৪। কোন ব্যাচেলর ডিগ্রী অধিকারী মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে দুটি বিষয়ের ওপর। যে বিষয়ে তিনি ভর্তি হতে চান তাতে অবশ্যই দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর পেতে হবে এবং ব্যাচেলার ডিগ্রীতে অন্যূন দুটি সম্মান বিষয়ে সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

www.pathagar.com

৫। ডিগ্রী বিষয়ে পাশ করতে হলে প্রতিটি পত্রে ন্যূনতম শতকরা ৪০ নম্বর পেতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষাধীন বিষয়সমূহের মোট নম্বরের শতকরা ৫০ ভাগের নিচে হলে চলবে না। দ্বিতীয় বিভাগে পাস করার জন্য শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর অর্জন করতে হবে এবং প্রথম বিভাগের জন্য শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পেতে হবে।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে দেন এবং ১৯৬০ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। স্পষ্টতই আয়ুব খান নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে গৃহিত '৫৬ সালের সংবিধানটি বাতিল করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র মার্কা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সংবিধান প্রবর্তন করবার ফিকির করছিলেন। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রচার করা হচ্ছিল তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এসব কারণে জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে আইয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছিলো। সেই সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ জন্যে জেনারেল আইয়ুব ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করেন। তখন পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ আবারো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন : নতুন দিগন্ত

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং জনমত গড়ে তোলা সে-সময় এক দুঃসাহসিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জটিই সেদিন গ্রহণ করেছিল এবং সফলও হয়েছিল। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইয়ুবের স্বৈরশাসনে প্রথম কাঁপন ধরাতে ছাত্ররা সক্ষম হয়।

১৯৬২ পয়লা ফেব্রুয়ারি সকালে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। একজন নিরপেক্ষ প্রগতিশীল ছাত্রকর্মী আনিসুর রহমান তাতে বক্তৃতা করেন।

পরদিন ২ ফেব্রুয়ারি কোনো সংবাদপত্রে ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ ছাপা হয়নি। ফলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় প্রেসক্লাবের দিকে। সেখানে ছাত্ররা সরকারিপত্রিকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা রহিম আজাদ। দীর্ঘবছর পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য রাস্তায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর ও হলগুলো প্রতিবাদী ছাত্রদের পোষ্টারে ছেয়ে গিয়েছিল।

সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্র দাবি ছাত্রদের

সেই সময় দেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রধান দুটি শক্তি ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। আরও ছিলো ছাত্রশক্তি এবং এন. এস. এফ। পরবর্তী দুটি ছাত্র সংগঠন মূলত

www.pathagar.com

ডানপন্থী। এনএসএফ ছিলো আইয়ুব সরকারের পেটুয়া বাহিনী। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি কিভাবে আইয়ুবের চামচা মোনায়েম খানের গুণ্ডা বাহিনী হিসাবে কাজ করেছিল সে কথা সবার জানা। প্রথম দুটি ছাত্র সংগঠন-ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ চিন্তা-চেতনায় কিছুটা কাছাকাছি থাকলেও মূলত তারা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। ছাত্র ইউনিয়ন তখনকার ভাল ছাত্রদের সংগঠন বলে পরিচিত ছিল। তারা নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলে দাবি করত এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কথা বলত। আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্পষ্টতই ছিলেন মার্কিন ঘেঁষা। তার একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল পূর্ব বাংলা ৯৮% স্বায়ত্বশাসন পেয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সেই অবিভক্ত বাংলা থেকে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন জননেতা। '৫৪-এর নির্বাচনে হক-ভাসানী তাকে সাথে নিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেওয়াল তুলে ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের উভয় অংশে সামারিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন। সেই সোহরাওয়ার্দীকে যখন সামরিক শাসক চক্র গ্রেফতার করল তখন বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্র ইউনিয়ন সোহরাওয়ার্দীর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও মনে করত যে তার গ্রেফতারের প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি ও গণতন্ত্রের দাবি। ছাত্রলীগও তখন তাদের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। ফলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র-ইউনিয়নের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। সেই অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের পরদিন অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশক্তি ও এনএসএফ এর মধ্যে এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এনএসএফ এবং ছাত্রশক্তি খানিকটা ভিন্নমত পোষণ করলেও ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কৌশলে পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আইয়ুবের সামরিক শাসনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় এই প্রথম একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ যা সংগঠিত করেছিল তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ।

১ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। তৎকালের বিখ্যাত আমতলায় একটি ছাত্রসভায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন হায়দার আকবর খান রনোসহ অন্যান ছাত্র নেতৃবৃন্দ। ৩ তারিখে পাকিস্তানের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনজুর কাদির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন বক্তৃতা করতে। ছাত্ররা মনজুর কাদেরের গায়ে থুথু দেয় এবং তার গাড়ি ভেঙে ফেলে।

৫ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি তার প্রতিবাদে কয়েক হাজার ছাত্র কার্জন হল প্রাঙ্গণে জমা হয়। তারা মিছিল বের করবার চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে খণ্ড লড়াই শুরু হয়। ছাত্ররা পুলিশের বাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। হামলা চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদানীন্তন জি. ও. সির গাড়িতে। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল করতে থাকে ছাত্ররা। দুই পাশের জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাততালি দিতে থাকে। পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি আবার মিছিল বের হয়,

www.pathagar.com

আবার হামলা চলে। হায়দার আকবর খান রনো, তৎকালীন ডাকসুর ভিপি রফিকুল হকসহ অনেকে গ্রেফতার হন। আন্দোলন কিছু দিনের জন্য ঝিমিয়ে পড়ে। এই সুযোগে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্র দাঁড় করালেন। বিপরীত দিকে ছাত্র নেতারা এই শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করে নয়া গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব দিয়ে একটি বিবৃতি রচনা করলেন। বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার ৯ জন নেতার স্বাক্ষর আদায় করে তা প্রচার করা হয়। এতে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন নূরুল আমীন। তারপর আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আব্দুস সালাম খান, পীর মহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া, মোহন মিয়া, আতাউর রহমান খান ও মাহমুদ আলী। ইতিমধ্যে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট সামান্য সংশোধন করে তা পুনরায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রথম সামরিক শাসনের ছদ্মবেশ

১৯৬২ সালের ৮ জুন পাকিস্তানে ৪৪ মাস ব্যাপী সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। এদিন ১৫ বছর বয়সী পাকিস্তানের ১৫৬ সদস্যবিশিষ্ট তৃতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরু হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসকরা প্রায় সকলেই সরকারে থেকে যায়। মন্ত্রিপরিষদের সামরিক আমলের মন্ত্রীরাও নতুন সরকারে স্থান পান। সামরিক শাসক আইয়ুব খানই প্রেসিডেন্ট থেকে যান।

সংবিধান নিয়ে বিতর্ক

এই সময় সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল বটে এবং সামরিক আইনের ভয়াবহতা কতখানি মাত্রায় যেতে পারে ছাত্ররা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতেও ছাত্রসমাজ একেবারে দমিত হয়নি। বরং কিছুদিন পর ১৯৬২-র সংবিধান প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলন আবার সংগঠিত হয়ে উঠল। আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে তার মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি ৯৫.৬ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা-ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর দুদিন পরই তিনি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে এপ্রিলের মাঝামাঝি ছাত্ররা 'শপথ দিবস' পালন করে। মূলত এই দিবসটির মধ্যদিয়ে নেতৃবৃন্দ ঝিমিয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনে একটা 'ওয়ার্ম আপ' করে নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও কেন্দ্রীয়ভাবে মধুর রেস্তোরাঁয় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানেও শপথ দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিটি পালিত হয় প্রধানত ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নীতিগতভাবে মনে করে যদিও বর্তমান শাসনতন্ত্র গণবিরোধী ও একনায়কতন্ত্রের পরিপোষক, তবু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী বলে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা উচিত। ছাত্ররা এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আন্দোলন গড়ে তুললে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে।

শরিফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন

আগস্ট মাস থেকে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের নতুন দিগন্তের শুরু। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি ক্ষেত্রে শরিফ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কমিশনের প্রতিবেদন অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে ছাত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনিতেই সেই সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ইস্যু পেলেই আইয়ুব খান তথা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছিল। এমন একটা অবস্থায় শরিফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ ছিল 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা' দেওয়ার মতো। ছাত্ররা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং শুধুমাত্র শিক্ষাসমস্যাকে কেন্দ্র করেই এত বিশাল ও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে আর হয়নি। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্ররা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। তবে এই আন্দোলন চলছিল অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে (অন্তত আগস্ট মাস পর্যন্ত)। অবশ্য এই সময় সারাদেশের মেডিক্যাল স্কুল ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররাও তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আন্দোলন, এমনকি অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

১০ আগস্টের এই সভায় ১৫ আগস্ট সারাদেশে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের কাছে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি

কারণ ছাত্রদের মতে এই রিপোর্টে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বাজারে যেমন পণ্য কেনাবেচা হয় তেমনি শিক্ষার বাজারে শিক্ষক নামক পণ্য বেচাকেনা শুরু করতে চায় এই রিপোর্ট। সাধারণ ছাত্ররা রিপোর্টের এই অন্তর্নিহিত ব্যাপারটি বুঝতে না পারলেও রিপোর্ট বাস্তবায়নের বেশকিছু পদক্ষেপ তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যেহেতু সমস্যাগুলো ছিল কলেজ ছাত্রদের সেহেতু কলেজের ছাত্ররাই প্রথমে এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। ঢাকা কলেজ থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। ডিগ্রির ছাত্ররা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করে। ১০ আগস্ট ১৯৬২ ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। যে সভায় ডিগ্রী ও এইচ. এস. সি-র ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে যোগদান করে।

এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন কাজী ফারুক আহমেদ। যিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদক ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কলেজ থেকে পাশ করে

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। কিন্তু ছাত্রদের দাবির মুখে তিনি ১০ আগস্টের ঐ সভায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি একটি বিশ্লেষণধর্মী বক্তৃতা করে বলেন শিক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সভায় ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী সাধারণ ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। সুলতান মাহমুদ খান, ২০১০ সালে নিজ গৃহে অগ্নিকান্ডে নিহত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ও গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি নুরুল ইসলাম, আহসান আলী, শাহ সালাহ উদ্দিন প্রমুখ তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। ইতিমধ্যে গঠিত হয় ডিগ্রী স্টুডেন্টস ফোরাম যার নেতৃবৃন্দ জগন্নাথ কলেজ, কায়েদ আজম কলেজ ও ইডেন কলেজে পরপর কয়েকটি সভা করে। ধীরে ধীরে ডিগ্রী স্টুডেন্টস ফোরাম ইস্ট পাকিস্তান ফোরামে রূপান্তরিত হয়। এর সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটারিয়ায়।

এতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা মিলিতভাবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার বাসু, ঢাকা কলেজের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক, জগন্নাথ কলেজের ভিপি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ ছাত্র সংসদের মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নুরুল আরেফিন খান, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ বাগমার প্রমুখ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। কাজী ফারুক আহমদ এবং আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমামকে যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত করে ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হয়। এই ফোরামের নেতৃতেই প্রথমে কলেজ ছাত্রদের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, প্রথম দিকে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতারা তখন মনে করতেন, শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী দাওয়ার প্রশ্নে বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ইতিহাস বলে যে, শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয় সেটাই সম্ভবতঃ এদেশের সবচেয়ে সফল ছাত্র আন্দোলন। যদিও '৫২ '৬৮ '৬৯ সালে ছাত্রদের আন্দোলন, অভ্যুত্থান হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ছাত্রদের সমস্যাভিত্তিক এমন ব্যাপক ও বিশাল আন্দোলন আর হয়নি বললেই চলে। অবশ্য পরে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগঠনের নেতারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী

বাষট্টির ১৫ আগস্ট দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট সর্বাংশে সফলতা অর্জন করে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী। আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় আন্দোলনের বিজয় অর্জনের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে মিছিলও বের করা হয়। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খান, রাশেদ খান

www.pathagar.com

মেনন, হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখও সব কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই সমস্ত সভায় ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন।

আন্দোলনের ভয়ে ভীত সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সরকারী প্রেসনোটে হুমকি দেওয়া হয় যদি কেউ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনের চেষ্টা করে তা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। ছাত্র নেতৃবৃন্দ অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে এবং তার পরিবর্তে ১৭ সেপ্টেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

হরতালের কর্মসূচী হিসাবে ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্র জনসভা ও সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল ঘোষণা করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীতে ছোট ছোট পথসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। তখন ছাত্রলীগের নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ ফজলুল হক মনি এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমেদ তুখোড় বক্তা ছিলেন। এদের বক্তৃতায় ছাত্র জনতার মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সব ক্ষেত্রেই হরতালের সমর্থনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

১৭ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ঢাকা শহর মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। সকাল ৯ টার দিকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ যখন বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় পৌছেন তখন সমস্ত আমতলায় হাজার হাজার মানুষ। আমতলা ছাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌছে গেছে।

১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল উপলক্ষে ডাকসু অফিস ও জগন্নাথ কলেজে দুটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়। তখন পুরান ঢাকার তথা সমগ্র ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল জগন্নাথ কলেজ। এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি। ভোর থেকেই তারা সেই এলাকার হরতালের পিকেটিং শুরু করেন। পুলিশও ছিল তৎপর। যেখানে তারা কর্মীদের সমাবেশ দেখেছে সেখানেই লাঠিচার্জ করেছে। কর্মীদের গ্রেফতার করেছেন। নবাবপুর রোড দিয়ে চলেছে লাঠিসোটা ও রামদা নিয়ে সরকারি দলের গুণ্ডাদের টহল। সব কিছুকে এড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার দিকে যেতে থাকে। পথের মধ্যে ছাত্র নেতারা গুলিস্তান এবং পল্টন ময়দান এলাকায় জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখেন।

ছাত্রমিছিলে গুলি

সকাল ১০টা মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ১০ হাজারের বেশি মানুষ সমবেত হয়। সেই সময় ১০ হাজার মানুষ মানে বিশাল ব্যাপার। বলা যায় প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল সেই জনতা। এরকম সময়ে খবর আসে যে নবাবপুর রোডে গুলি হয়েছে এবং সেখানে কয়েজন শহীদ হয়েছেন। ফলে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হলো জনতার মধ্যে। সভা করা গেল না। মিছিল শুরু হলো। মিছিলের আগে থাকলেন সিরাজুল আলম খান, মহিউদ্দিন, রনো, মেনন, রেজা আলি, আবদুর রহিম আজাদ, আইয়ুব রেজা চৌধুরী

www.pathagar.com

প্রমুখ। মিছিল যখন কার্জন হলের সামনে দিয়ে হাইকোর্ট পার হয়ে আবদুল গণি রোডের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখন মিছিলের পিছন দিকে গুলি হলো। এখানেই বাবুল ও ওয়ালিউল্লাহ্ শহীদ হন। সিরাজুল আলম খানসহ কয়েকজন আহত ও নিহতদের নিয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে গেলেন। কিন্তু মিছিল আসল না। মিছিল অগ্রসর হতে থাকল জগন্নাথ কলেজের দিকে। কারণ সেখান থেকে আরেকটি বড় মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিল যখন নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এ পৌঁছাল তখন আবার গুলি হলো। আহত হলো অনেকে, তবুও মিছিল থামল না। মিছিল যখন রথখলার মোড়ে তখন জগন্নাথ কলেজ থেকে কয়েক হাজার ছাত্র জনতা আরেকটি মিছিল নিয়ে সেখানে পৌঁছেছে। কিন্তু মাঝ পথে ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। ব্যারিকেড ভাঙার জন্যে মিছিলের উভয় পাশ থেকে পুলিশ ও আর্মির প্রতি ঢিল মারতে শুরু করল। পুলিশ আর্মি প্রথম অবস্থায় হটে গেলেও কোর্ট প্রাঙ্গনে ঢুকে টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুঁড়তে লাগল। দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলল। অবশেষে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

শহীদদের লাশ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ

ঢাকা মেডিকেলে তখন এক মর্মান্তিক দৃশ্য। চার দিকে শুধু রক্ত আর আহতদের আর্তনাদ। এত বেশি মানুষ আহত হয়েছিল যে হাসপাতলে তাদের রাখার জায়গা হচ্ছিল না। ঐ দিকে মর্গে ছিল বাবুল ও ওয়াজিউল্লার লাশ। তাদের আত্মীয়স্বজনরা লাশ নিতে আসছিল আর একটি মিলিটারী ভ্যান আসছিল লাশ ছিনিয়ে নিতে। শত শত মানুষ সেখানে জমায়েত হলো যাতে লাশ কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। ছাত্র জনতার প্রতিরোধের মুখে মিলিটারী ভ্যান সে জায়গা পরিত্যাগ করল।

'৬২ শিক্ষা আন্দোলন বলা যেতে পারে এখানেই পরিসমাপ্তি। যতদূর জানা যায় ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় সলিমুল্লাহ হলে শহীদের গায়েবানা জানাযা ও মোনাজাত করা হয়। অতপর একটি বড় শোক মিছিলও করা হয়। কিন্তু সেই পর্যন্তই। এরপর আর আন্দোলনকে অগ্রসর করবার চেষ্টা করা হয়নি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি বা অসহযোগিতা আন্দোলনকে আর সামনের দিকে নিয়ে যেতে দেয়নি।

আমি আগেই বলেছি এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল মূলত দুটি সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। ছাত্র ইউনিয়ন যে আদর্শে বিশ্বাস করত সেই হিসাবে তাদের মূল নেতৃত্ব, কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনে ছিল না। তারা ভাবতেই পারেনি যে, শিক্ষার দাবিতে এত বড় একটা আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। ও দিকে ৩১ জানুয়ারি গ্রেফতারকৃত শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্ত হয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসেন। তিনি ছাত্রদের এই আন্দোলনকে মূলত পছন্দ করতেন না। এর প্রভাব পড়ে ছাত্রলীগের উপর যা ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলে। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে সব সংগঠনের একজন ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আপাতত আন্দোলনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর

www.pathagar.com

গোলাম ফারুকের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তারই পরামর্শে ছাত্র-অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনের মধ্যে সরকার শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখবার ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালের জন্য যে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষায় ফরম পূরণ করেছিল, পরীক্ষা না নিয়েই তাদের সকলকে পাশ করিয়ে দিয়ে ডিগ্রী প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়।

এভাবে আংশিক বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলন ছাত্রসমাজ ও ছাত্র- সংগঠন সমূহের জন্য অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেয়। শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যাপক ও বিশাল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে তা ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা।

পরিপূর্ণ বিজয় না হলেও সরকার ৩ বছরে ডিগ্রী কোর্সের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে বলা যায় আন্দোলনের আংশিক বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু মূলদাবি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করা যায়নি। তবুও '৬২-এর ছাত্র আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ বলব এই কারণে যে এটি পরবর্তী ছাত্র আন্দোলন বিশেষত '৬৯-কে গড়ে তুলবার কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিল।

মোনায়েম খানকে কালো পতাকা

১৯৬২ সালের ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আব্দুল মোনায়েম খান আইয়ুব খানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সামরিক আইন জারির পর থেকে লেঃ জেনারেল আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে কাজ করছিলেন।

তিনি ঢাকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আইয়ুব খানের সাথে মতবিরোধ ঘটলে ১৯৬২ র এপ্রিল মাসে গোলাম ফারুক নতুন গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন। ছয় মাস পরেই মোনায়েম খান দায়িত্ব লাভ করেন।

এই সময় বাষট্টির তিন পর্বের ছাত্র আন্দোলনের পরপরই ঢাকা কলেজের শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করতে গেলে গভর্নর মোনায়েম খানকে ছাত্ররা কালো পতাকা প্রদর্শন করে বিক্ষোভ মিছিল করে।

১৯৬৩ : ডাকসু এবং শহীদ দিবস

বাষট্টির সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং শিক্ষানীতি ও শাসনতন্ত্র প্রশ্নে ছাত্রদের ব্যাপক বিক্ষোভ সরকারের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন দিয়ে ক্ষমতা দখলের পর থেকে ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্নতর অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। বস্তুত এই পরিবর্তিত অবস্থার সূত্রপাত করে ছাত্ররা, যদিও বড় বড় রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও নেপথ্যে থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির এতে ভূমিকা ছিল।

তবে বাষট্টির ঝিমিয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনে ১৯৬৩ তে প্রাণচাঞ্চল্য এনে দেয় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে ভিন্ন রীতি প্রচলিত

www.pathagar.com

ছিল। হল সংসদ নির্বাচনে পরিচিতি সভায় সংগঠনের নেতারা বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করতেন। এ রীতিকে বলা হত 'প্লাটফর্ম প্রচার'। সাধারণত কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলাতেই বক্তব্য রাখতেন। কিন্তু হল সংসদের নেতা ও নির্বাচন প্রার্থীকে ইংরেজিতেই বক্তৃতা দিতে হত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি,সাহিত্য,সংস্কৃতি সকল কিছুর ওপরই তাদের ব্যুৎপত্তি দেখাতে হত। যে প্রার্থী ইংরেজিতে এ ব্যাপারে সবথেকে ভালো করত সেই উচ্চ মেধাসম্পন্ন এবং প্রিয় প্রার্থী হিসেবে আলোচিত হত। ১৯৬৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে ও কোনো কোনো ছাত্রাবাসে এন এস এফ-এর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্যানেলে অংশগ্রহণ করে। তবে কেন্দ্রীয় সংসদ ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী জয়লাভ করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা মনে করেন বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের ভূমিকা তাদের এই ফলাফলে সহায়তা করে। সর্বমোট ৯৩ টি আসনের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন একাই এ বছর লাভ করে ৮০ টি আসন।

ছাত্রাবাস থেকে জিন্নাহর ছবি অপসারন

১৯৬৩ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে সলিমুল্লাহ হলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ হলে প্রথম থেকেই বামপন্থী ছাত্রদের প্রাধান্য বলে স্বীকৃত ছিল। হলের প্রগতিশীল ছাত্ররা একদিন 'জাতির পিতা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি হল সংসদ ও কার্যালয় থেকে অপসারণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় এন.এস.এফ-এর পান্ডারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জঘন্য সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ধরে ধরে তারা প্রগতিশীল ছাত্রদের আক্রমণ করে এবং ত্রাস সৃষ্টি করে। এ সময় কায়েদে আযম কলেজে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এক ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষ হয়। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালে জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। কিছুদিন পর এমনি অনাহুত ছাত্র সংঘর্ষ আরো কয়েকটি কলেজে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের ফলে অনেকদিন বন্ধ থাকে।

প্রথম শিক্ষা দিবস

বাষট্টি সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শরিফ কমিশনের প্রতিবেদন বিরোধী যে ব্যাপক ছাত্রবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে পরের বছর ১৯৬৩ সালে এই দিনকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বছরে এসে ছাত্ররা দিবসটি পালনের ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষণা করে।

ভোর ৬ টায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন করে এবং কালো ব্যাজ পরিধান করে। সারা প্রদেশে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের দ্বন্দ্ব কি আদর্শিক ?

ছাত্র ইউনিয়ন জন্মের পূর্বে আর কোনো সংগঠন না থাকায় সমাজতন্ত্র মনোভাবাপন্ন ছাত্ররাও সাধারণত ছাত্রলীগেই কাজ করত। ছাত্র ইউনিয়ন আসার পর এ ব্যাপারে সাধারণের মাঝে স্পষ্টতই দুটি ধারা কাজ করত-গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু এর পরেও ছাত্রলীগে বিভিন্ন সময়ে সমাজতন্ত্র ও প্রগতিশীল নীতিসমূহের ব্যাপারে আদর্শের সংঘাত হয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে ছাত্রলীগকে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রগতিশীল নীতিসমূহের প্রশ্নে বারবার আপসই করতে হয়, কখনো কখনো এসব প্রচার-প্রপাগান্ডার বাহনও হতে হয় ছাত্রলীগকে। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগে আন্তঃমতাদর্শগত সংগ্রাম নিয়তই ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯৬৩ সালের সম্মেলনে তা আবার ধরা পড়ে। শেখ ফজলুল হক মনি সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন মুখে মুখেই উপস্থাপন করেন। পাকিস্তান ময়দানে এবারের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সংগঠনে এই সময় ভিন্নমতাবলম্বী বলে পরিচিত ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী গণতান্ত্রিক কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মসূচির একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনে এই প্রস্তাব নিয়ে তীব্র মতানৈক্য সৃষ্ট হয়।

এই সময় ছাত্রলীগের কমিটি গঠনেও দ্বন্দ্ব বাধে। একদল সিরাজুল আলম খানকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সমর্থন করে, অন্যদল ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন সিরাজুল আলম খানের সমর্থক। ফলে বিদায়ী সভাপতি হিসেবে তিনি ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর খসড়া ঘোষণাপত্র (যাতে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল) সম্মেলনে পড়তে অনুমতিই দেননি। অনুমতি দেওয়া হয়নি এই ভাষ্য দিয়েছেন ফেরদৌস আহমদ কোরেশী। কিন্তু সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মফিজুর রহমান জানিয়েছেন, ছাত্রলীগে এ ধরনের কোনো আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিল না। শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান ঘটনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে লঙ্কাকাণ্ড

মোনায়েম খান গভর্নর হিসেবে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য ছিলেন। ফলে তার শখ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি যোগদান করবেন।

প্রথম পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে এসে ছাত্রদের দ্বারা তিনি শুধু হোঁচট খেলেন তা-ই নয়, এক লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দিলেন। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ কার্জন হলে সমাবর্তনের এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। ছাত্ররা পূর্বেই মোনায়েম খান কর্তৃক সনদপত্র বিতরণে অস্বীকার ও আপত্তি করেছিল এবং প্রতিবাদে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল করে।

ছাত্র সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ডাকসু'র সহ-সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরী, ইকবাল হলের

www.pathagar.com

(বর্তমান জহুরুল হক হল) সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মুঈদ চৌধুরী ও আলী হায়দার খান, সলিমুল্লাহ হলের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফরাসউদ্দীন ও মোহাম্মদউল্লাহ ভুইঞা, ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) সহসভাপতি বজলুর রহমান এবং ফজলুল হক হলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এ উপলক্ষে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আচার্য নিয়োগের দাবি জানান।

২২ মার্চের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের বিষয় নিয়ে ২১ মার্চ ডাকসু অফিসে সর্বদলীয় ছাত্রনেতাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলাকালীন এন.এস.এফ-এর বাহিনী এক অতর্কিত কিন্তু পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ দ্বারা সভা লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। অভিযোগ উঠেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস থেকেই হকিষ্টিক ও রড সংগ্রহ করেছিল তারা। এমতাবস্থায়ও অনুষ্ঠানের দিন ঘটনা অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি জটিল ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে গভর্নর মোনায়েম সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এই সময় ছাত্র-পুলিশ উভয়েই এক মারাত্মক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পাইকারি হারে চলে গ্রেফতার। কাঁদুনে গ্যাস ও অন্যান্য আঘাতে বহু ছাত্র আহত হয়। রাতের অন্ধকারে ছাত্রাবাস ঘেরাও করে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ডাকসুর সহসভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদিকা মতিয়া চৌধুরী সহ অন্যান্য ছাত্র-নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিন্দা করে এক বিবৃতি দেন। কিন্তু দনমনীতি বন্ধ হয় না। উল্টো ৩০ মার্চ রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, গিয়াস কামাল, এ. কে. বদরুল হক (ছাত্র ইউনিয়ন), শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, এন. এম. সিরাজুল আলম (ছাত্রলীগ) প্রমুখের নামে হুলিয়া জারি করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এতে আন্দোলন দ্বিগুণ তেজে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, সরকার উপায়ন্তর না দেখে, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ৭৪টি কলেজ, ১৪০০টি উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। সারাদেশে ছাত্র গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২০০ জন।

নির্যাতন-নিপীড়ন এই সময়ে ছাত্রদের উপর চরম আকার ধারণ করে। এ সংবাদ যাতে জনগণের কাছে না পৌছে তার জন্য বিধিনিষেধ জারি করা হয়। শুধু তাই নয়, ইতোপূর্বে 'আপত্তিকর' সংবাদ পরিবেশনের দায়ে 'কারণ দর্শাও নোটিশ' ও ত্রিশ হাজার টাকা করে জামানত তলব করে আজাদ, সংবাদ ও ইত্তেফাককে সমন দেওয়া হয়।

পত্রিকাগুলিও প্রতিবাদে সম্পাদকীয় পাতা শূন্য রেখে প্রকাশ করে এবং হাইকোর্টে বিচারপতি মোর্শেদের কক্ষে মামলা দায়ের করে জয়লাভ করে। এরপর ২৮ মে (১৯৬৪) তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি ছাত্র-নির্যাতনের ৩০দিনের এক খতিয়ান প্রকাশ করে।

এদিকে ছাত্ররাও বসে থাকেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। রীট আবেদনে ছাত্রপক্ষে এসে দাঁড়ান

www.pathagar.com

এডভোকেট জাকির আহমদ (তিনি নিজেও একজন ভুক্তভোগী ছিলেন) ও আহমদ ফারুক। হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ ৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ছাত্র-বহিস্কার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

মামলায় জিতে ছাত্ররা বিজয় মিছিল বের করে শহর প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এখানেও পুলিশবাহিনী ছাত্রদের শোভাযাত্রার ওপর লাঠিচার্জ করে।

গণ গ্রেফতার

১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে সরকার টলটলায়মান অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। সরকার কর্তৃক ছাত্র-নির্যাতনও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ের একটি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, ১৯৬৪ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে মাত্র ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতি ৪২ ঘন্টায় ১ জন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আগস্ট মাস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। ২৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশদ্বারে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের রেশ চৌষট্টিতে এসেও থামছিল না। সারাদেশে প্রবল ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে ১৯৫১ সালে গঠিত এবং ১৯৬২ সালে প্রকাশিত শরিফ কমিশন প্রতিবেদন বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছাত্র-বিক্ষোভের কারণসমূহ অনুসন্ধান ও শরিফ কমিশন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রতিবেদনেও সে উদ্দেশ্যের কথাই লেখা আছে:

The high Power commission would be appointed to investigate into the problems of the student.

বিচারপতি হামুদুর রহমান এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

আইয়ুব খান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ছাত্র-অসন্তোষের কারণসমূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু হামুদুর রহমান অনাহূত ভাবেই ছাত্রদের সম্বন্ধে বিভিন্ন অপ্রীতিকর মন্তব্য করে সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন এবং শরিফ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলেন। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধেই ছাত্রদের আবার নতুন করে রাজপথে নামতে হয়।

কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই ১৯৬৫ সাল ছাত্রদের কাছে আগমন করে নতুন সঙ্কটের বছর হিসেবে। এ বছর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ছাত্রসমাজের এই আন্দোলন ও সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর 'কিছু একটা করার' সুযোগ ঘটে পাকিস্তানের প্রথম

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। এই নির্বাচনে নতুন রাজনৈতিক দল কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থী হন আইয়ুব খান স্বয়ং। পাকিস্তানের সকল বিরোধীদল মিলে একজন ঐকমত্যের প্রার্থী দিতে সমর্থ হয়। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী হন। আইয়ুব খান 'ফুল' প্রতীক নিয়ে এবং ফাতেমা জিন্নাহ 'হ্যারিকেন' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

তবে নির্বাচনে ভোটার ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্রীরা'। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের সদস্যরা এই 'মৌলিক গণতন্ত্রীরা' সদস্য ছিলেন। যদিও সাধারণ মানুষ ভোটার ছিল না, তবু সারাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও উৎসাহে প্রচরণায় জোয়ার সৃষ্টি করে।

এই অবস্থায় ছাত্র সমাজের কাছেও বৃহত্তর কর্তব্য উপস্থিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করে ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে জনমত সংগঠনে নেমে পড়ে। তিন সংগঠনের এক যৌথ প্রচারপত্রে আইয়ুবের কঠোর সমালোচনা করে দেশবাসীকে ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের মনে মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ঝড় উঠলেও ভোটার যেহেতু ছিল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা, তাই ভয়-ভীতি, কারচুপি ও টাকার বিনিময়ে আইয়ুব খান নির্বাচনের ফলাফল তার পক্ষে নিতে সমর্থ হন। যারা নির্বাচনে আইয়ুবকে ভোট দেননি, ফলাফলের পর তাদের বহুদিন পালিয়ে থাকতে হয়। যারা টাকার বিনিময়ে আইয়ুবকে ভোট দেন, নির্বাচনের পরের দিন নোট ভাঙাতে গিয়ে দেখে তা 'জাল নোট'।

শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন

আইয়ুবের শাসনামল থেকে শুরু করে শেষ অবস্থা পর্যন্ত (১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত) মোট তিনটি অত্যন্ত আলোচিত শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে শরিফ কমিশন, ১৯৬৪ সালে হামুদুর রহমান কমিশন এবং ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশন (আইয়ুবের বিদায়ের অল্প পরেই এই কমিশনটি গঠিত হয়েছিল)

এরও পূর্বে ১৯৫২ সালে গঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি, ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন গঠিত হয়েছিল (মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান কর্তৃক) পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে গঠিত হয় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, জিয়াউর রহমানের শাসনমলে কাজী জাফরের উদ্যোগেও একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। এরপর এরশাদ আমলে আবদুল মজিদ খানের শিক্ষা কমিশন নিয়ে দেশে বাষট্টির থেকেও বড় রক্তপাত ঘটে। তারও পর শিক্ষাবিদ মফিজ চৌধুরীর নেতৃত্বে আরও একটি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৪ সালে আক্রমণ তীব্রতর করে তোলে যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের এই হামলা বন্ধের দাবিতে ঢাকার বার কাউন্সিলে সর্বদলীয় ছাত্র-জনতার এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এই জমায়েতের আয়োজন করা হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অবিলম্বে ভিয়েতনাম থেকে হাত গুটানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ ব্যাপারে তিনদিন ধরে বিতর্ক চলে। ছাত্রলীগের যেসব নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল তারা এ প্রস্তাব গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করছিল। কিন্তু প্রস্তাবকরা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এটা কমিউনিজমের ব্যাপার নয়, এটা আগ্রাসনের ব্যাপার। যে-কোনো আগ্রাসনকে ছাত্রলীগের নিন্দা করা উচিত। অবশেষে তিনদিন পর সর্বসম্মতভাবে ছাত্রলীগ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গন

আগে বলেছি '৬২ নানা কারণে পূর্বপাকিস্তানে রাজনীতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। '৫২-র আন্দোলন '৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় এবং '৬২-র ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনীতির ধারা তৈরি করে। '৬২-র আন্দোলন পুরোপুরি বিজয় অর্জন করতে না পারলেও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও উঠতি ধনীর শ্রেণীর রাজনীতি পরাজিত হয়, যে উগ্র ধর্মীয় চেতনা দ্বারা পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে আছন্ন করে রাখতে চেয়েছিল তা ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানী শাসক চক্র এটা বুঝতে পেরেই আপতিক দমননীতি পরিহার করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়াতে শুরু করে। সরকার এ ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচারে নেমে যায়। এই সময়ে কাশ্মীরের হরতালের ঘটনায় সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। উপরের এই ঘটনার সূত্র ধরে এ পারেও অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানেও দাঙ্গাকারীরা তৎপর হয় যাতে প্রত্যক্ষভাবে মদদ দেয় গর্ভনর মোনায়েম খান ও তার প্রশাসন।

বিভৎস এবং ভয়বাহ এই দাঙ্গার শুরু '৬৪-র একেবারে শুরুতেই যখন দেশব্যাপী সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে একটি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। এই সময় ছাত্র সমাজ কিন্তু বসে ছিল না। তারা আন্দোলনের পাশাপাশি সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে তারা দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক নির্মূল করা এবং দেশে সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার আদায় করার শ্লোগান সামনে নিয়ে আসে। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তি নিজেরা কথা বলে এবং তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আলোচনা করে। সেই হিসাবে ১৯ মার্চ দেশব্যাপী ভোটাধিকার দিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিন দেশের সর্বত্র যে ব্যাপক হরতাল হয় তাকে সফল করার ব্যাপারেও ছাত্র সমাজের অবদান যথেষ্ট।

বুদ্ধিজীবী, সংবাদসেবী ছাত্রজনতার প্রতিরোধের মুখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন শাসক চক্র ছাত্রদের উপরে গোদের উপর বিষফোড়ার মত নতুন যন্ত্রণা চাপিয়ে দেয় ঘোষণা করা হয় গভর্নর মোনায়েম খান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেবেন। স্মরণ করার দরকার ১৯৬২ সালে ছাত্ররা বর্জন করবে এই ভয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। অথচ মাত্র দুই বছর পরেই তারা এই সমাবর্তন চাপিয়ে দেয় ছাত্রদের উপর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েন মোনায়েম খান। সেখান থেকে ফিরে ঐ জেদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠান সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্ররাও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় এর মোকাবেলা করার। অতএব নির্দিষ্ট দিনে শুরু হয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের যুদ্ধ। ছাত্ররা লণ্ডভণ্ড করে দেয় সমাবর্তন উৎসব।

www.pathagar.com

মধ্য ষাটে যখন এভাবে একটার পর একটা ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনে জয়লাভ করে এগিয়ে যাচ্ছিল ছাত্র সমাজ, তখন ছাত্রদের সবচাইতে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাঙনের সুর বেজে ওঠে। বিষয়টি ছিল গভীরভাবে তত্ত্বগত যা অধিকাংশ ছাত্রদের বোধগম্য ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতো রুখতে হবেই। কিন্তু কী ভাবে? তার কৌশল কী হবে? ভারতে কোন একটা অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি করা কী যুক্তিসঙ্গত হবে? এতে কী স্থানীয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেওয়া হবে না?

রাজনৈতিক প্রশ্নে বিভক্তি

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে। মার্চের শেষে পত্রিকায় খবর বের হয় যে মার্কিন নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করবে। কিছু দিন পূর্বে ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সপ্তম নৌবহর উক্ত অঞ্চলে তৎপরতা শুরু করে। সেই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর হয়ে কলকাতা বন্দরে ভিড়লে ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এটা হয় প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার প্রশ্ন নিয়ে। যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। দেশে তখনো চলছে গণতন্ত্রের আন্দোলন। একপক্ষ প্রশ্ন তোলে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা ছাড়া গণতন্ত্রের আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না, যেহেতু গণতন্ত্র বিরোধী এই সামরিক চক্র, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের মদদেই টিকে আছে।

অপর পক্ষের বক্তব্য, সপ্তম নৌবহর কলকাতা বন্দরে উপস্থিতির প্রতিবাদ করলে তা ভারত বিরোধিতায় পরিণত হবে এবং তা নতুন করে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগাবে। দ্বিতীয়, তাদের বক্তব্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করলে ছাত্রলীগের সাথে ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে। এ কারণেও সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি বিরোধিতা করা এখন ঠিক হবে না।

এসব বিতর্ক মূলত তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির চলমান বিতর্ক। আন্তর্জাতিক-ভাবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি যে লাইন গ্রহণ করেছিল তাকে একপক্ষ সমর্থন করছিল, অপর পক্ষ তাকে সংশোধনবাদ বলে সমালোচনা করছিল।

ছাত্র ইউনিয়ন সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন। তরুণ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের মনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধ অত্যন্ত ভালোভাবেই দোলা দিতে থাকে। এই সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বেও তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ

পার্টির অভ্যন্তরে যখন এই ধরনের একটা বিতর্কের সূত্রপাত হয় তখন অনেকটা পার্টি নেতৃত্বের অজান্তে ছাত্র ইউনিয়নের পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা পার্টি মনাদের মধ্যে একটা স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এ স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হলো পার্টি নেতৃত্বের আস্থা কে অর্জন করতে পারবেন? এতে একদিকে প্রতিনিধিত্ব করতেন মোহাম্মদ ফরহাদ (পরবর্তীতে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক) অপর দিকে ছিলে কাজী জাফর আহমদ।

www.pathagar.com

'এদের প্রথম জন ছিল ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ এবং দ্বিতীয়জন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। মোহাম্মদ ফরহাদ তখন আত্মগোপনে থাকতেন আর কাজী জাফর' '৬২-এর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্র মহলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছেছেন। ফরহাদকে পার্টি নেতৃত্ব ছাত্র ইউনিয়ন পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এটা কাজী জাফর আহমেদ মনঃপুত হলো না। তখনকার দিনে পার্টির আশীর্বাদ না থাকলে যতই জনপ্রিয় হোন না কেন, তাঁর পক্ষে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব বজায় রাখা সুদূর পরাহত ছিল। সুতরাং কাজী জাফর পার্টির নেতৃত্বের উপর আস্থা হারালেন এবং মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গেও তার বিরোধী তীব্র হয়ে ওঠল। জনাব ফরহাদ পার্টি নেতৃত্বের সেই অংশেরই আস্থা অর্জন করেছিলেন যারা ছিলেন রুশপন্থী।

জনাব কাজী জাফর ও জনাব ফরহাদের মধ্যেকার এই বিরোধে কতখানি রাজনীতি ছিল এবং কতখানি ব্যক্তিগত সদ্ভাবের অভাব ছিল তা বিতর্ক সাপেক্ষ্য। ইতিহাস তা নির্ধারণ করবে। '৬২ সালের ছাত্র ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্মেলনে জনাব কাজী জাফর আহমেদ যে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন তাতে রাজনৈতিক বিরোধ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। কাজী জাফর আহমেদ জনাব মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে তার কোন ব্যক্তিগত বিরোধ আছে একথা কস্মিনকালেও স্বীকার করেননি। তিনি সবসময় বিরোধটাকে রাজনৈতিক বিরোধ বলেই প্রচার করতেন। অপর দিকে ছাত্র ইউনিয়নে জনাব মোহাম্মদ ফরহাদের অনুসারীরা এই বিরোধকে নিছক ব্যক্তিগত বলেও উড়িয়ে দিত। তারা কাজী জাফরকে একজন রাজনৈতিক উচ্চভিলাষী হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেত। কাজী জাফর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই নিজেকে সংশোধনবাদ বিরোধী ক্রুসেডের অগ্রসেনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৩ সালের সম্মেলনে এই বিরোধ দ্বন্দ্বে পরিণত হলে দুই পক্ষের সমঝোতা হিসেবে বদরুল হককে সভাপতি ও হায়দার আকবর খান রনোকে সাধারণ সম্পাদক করে একটা জোড়াতালি দেওয়া হয়। কাজী জাফর আহমদ এই সময় সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ ফরহাদের বিরোধীতার কারণে তিনি সফল হননি। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও কাজী জাফরকে আবার সভাপতি হিসেবে চাননি।

মোহাম্মদ ফরহাদ বা কাজী জাফর আহমদের পরিবর্তে এ. কে. বদরুল হকের মনোনয়নও সাধারণ কর্মীমহলে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। তবু ১৯৬৩-তে বদরুল হক-রনো কমিটি শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালের ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নে আরেকপশলা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ডাকসুতে সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে মতিয়া চৌধুরীর মনোনয়ন ছিল চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত। কিন্তু সহ-সভাপতি পদে রাশেদ খান মেনন ও জাকির আহমদ-এর দ্বন্দ্ব অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালের মতিয়াপন্থীরা জাকির আহমদের সমর্থক ছিল। কিন্তু পরে রাশেদ খানকে তারা সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে মেনে নেয়।

তাই বিরোধের কারণ মতাদর্শগত ছিল না। নেতৃত্বের সমস্যার কারণেই শেষ পর্যন্ত দু-দল দুই শিবিরে অন্তর্ভূক্ত হয়। এই দুই শিবিরের এক দলের নেতা ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, অন্য দলের নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ। এমন একটা অবস্থায়

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের এপ্রিলের ১. ২ ও ৩ তারিখে আহূত হয় ছাত্র ইউনিয়নের পরবর্তী সম্মেলন। আর তা উদ্বোধন করেছিরেন অধ্যাপক আবুল ফজল। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সময় সভাপতি এ. কে. বদরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রনো ছিলেন আত্মগোপনে। ফলে কার্যকরী সভাপতি ও কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও নূরুর রহমান। প্রথম থেকেই সম্মেলন ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। শুরুতেই প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক (কাউন্সিলার ও ডেলিগেট) তালিকা নিয়ে একপশলা হাতাহাতি হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে প্রচার সম্পাদক জামাল আনোয়ার বাসু (তিনি মতিয়াপন্থী ছিলেন) হাসপাতালে নীত হন। এরপর দুই পক্ষের আর একসঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে। ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গে মেনন গ্রুপ ও মতিয়া গ্রুপ হিসেবে বিভক্ত হয়

এই সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মেনন ও মতিয়া গ্রুপ নামে ছাত্র ইউনিয়নের দুটি পৃথক সংগঠন কাজ করতে থাকে।

পাক ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে চীন তাতে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায়। এছাড়া ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে আইয়ুব খানের ভালো সম্পর্ক থাকায় ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) মাতৃভূমি রক্ষার আওয়াজ তোলে এবং ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে মতিয়াপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পাক-ভারত বিরোধ নিস্পত্তির কথা বলে ।

অবশ্য যখন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একটি শান্তিচুক্তি সই করেন, তখন পাকিস্তানের জামাত-মুসলিম লীগ প্রমুখ দলসমূহ এর তীব্র বিরোধিতা করলে মেনন ও মতিয়াপন্থী উভয় সংগঠনই তাশখন্দে সইকৃত এই চুক্তিকে সমর্থন করে।

জাতীয় প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৬-দফা পেশ করলে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) একে সি.আই.এ. প্রণীত একটি দলিল বলে প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ৬-দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে একটি ভালো কর্মসূচি হিসেবে বর্ণনা করে, কিন্তু একে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে অসম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করে।

ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে আইয়ুব খানের ভালো সম্পর্ক থাকায় মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নও এই সময় আইয়ুব খান সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চীন এই সময় জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি। ফলে জাতিসংঘ-বিরোধী একটা মনোভাব তাদের মনের মধ্যে কাজ করত। মেননপন্থীরা তখন জাতিসংঘ বর্জনের কথা প্রচার করা শুরু করে। অপর দিকে মতিয়াপন্থীরা জাতিসংঘের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরবার চেষ্টা করে। এভাবে ক্রমাগত ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন গ্রুপ পরস্পর পরস্পরের থেকে অনেক দূরে চলে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে। কাশ্মীর বিরোধের কারণে সংঘটিত যুদ্ধে এটা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয় হয় যে, বিদেশী আগ্রাসনের মুখে পূর্ব পাকিস্তান দখল করা একটা ইচ্ছার ব্যাপার ছিল মাত্র। এতদিন পর্যন্ত বাঙালীদের মধ্যে যে শোষণ-বঞ্চনার কষ্ট ছিল তার সাথে এখন যুক্ত হয় নিরাপত্তাহীনতাবোধ।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বিরোধী দলীয় নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধিকারের প্রশ্ন তুলে ধরেন। কিন্তু পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাতে তেমন কর্ণপাত করেননি। শেখ মজিব সেই সভা থেকে বেরিয়ে লাহোরে (মতান্তরে ঢাকায়) ফিরে বিমান বন্দরে 'বাঙালীর মুক্তিসনদ' ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

৬-দফার পটভূমি

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬-দফা পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে, বিশেষভাবে শাসকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ শেখ মুজিব কর্তৃক যে-পটভূমিতে ৬-দফা উপস্থাপন করা হয়েছিল তা সমগ্র শাসক এবং তাঁদের লেলিয়ে দেওয়া শোষক সম্প্রদায়কে কাঁপিয়ে তুলেছিল।

এরই পাশাপাশি ষাটের দশকের পূর্ব থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের কাছে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের মারাত্মক অবনতিশীল পরিস্থিতির চিত্রটি ধরা পড়ে এবং দুই অর্থনীতি তত্ত্বের যৌক্তিক বিশ্বাসের প্রসার তাদের মধ্যে ঘটে।

এরই ফলে আইয়ুব খান দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার অসমতা দূর করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে সাংবিধানিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য এ পর্যন্তই। বরং এরপর থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে যেতে থাকে যে, একপর্যায়ে এসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে বিচ্ছিন্নতার চিন্তা অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এ চিন্তা প্রসারের কারণ ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নাকি দুই প্রদেশের মাথাপিছু ব্যয়ের বৈষম্য কমানো হয়েছিল। তাতেও দেখা যায় মাথাপিছু পূর্ব পাকিস্তান ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২২৯ টাকা।

www.pathagar.com

অথচ আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্বাণিজ্যে প্রথম দশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ৪০৭.৬ কোটি টাকার ঋণাত্মক ভারসাম্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ৮৬৮.৯ কোটি টাকা ধনাত্মক ভারসাম্য বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। এর 'পুরস্কারস্বরূপ' কেন্দ্রীয় সরকার এ সময় প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের বোঝা মেটানো হতে থাকল পূর্ব পাকিস্তানের ধনাত্মক আয় থেকে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি মেটানোর বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয় পূর্ব পাকিস্তান। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদও পাচার হতে থাকে। অর্থনীতিবিদদের মতে, ১৯৫৬ সালের পূর্বপর্যন্ত প্রতিবছর পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিম অঞ্চলে জাতীয় আয়ের প্রায় ২% পাচার হত।

এভাবে বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ প্রশ্নে কথা ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ভূমিকা

সামরিক শাসনের মধ্যেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক গতিধারার সফলতা প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নতুন আশার আলো জাগ্রত করে। এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সফলতা তাদের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। বিশেষ করে এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থবৈষম্যে এবং পশ্চিম কর্তৃক পূর্বকে শোষণের স্বরূপ বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদরা দুই অংশের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও তার গুরুত্বকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের এই ভূমিকা পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং ৬ দফা প্রণয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৬ দফা উত্থাপন

১৯৬৬ সালে লাহোরে ৬-দফা দাবি পেশ করার পর ১৩ এপ্রিল করাচী থেকে ফিরলে তাঁকে (শেখ মুজিবকে) ঢাকা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে আগত ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে ঐদিনই তিনি তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করতে ডেকে পাঠান।

শেখ মুজিব এদিন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এদের (আওয়ামী লীগ নেতাদের) অধিকাংশই মুসলিম লীগ থেকে এসেছে- হতাশ হয়ে, সুযোগসুবিধা না পেয়ে। তাদের দিয়ে ৬-দফার আদর্শ বাস্তবায়ন করা যাবে না। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের একটা বড় অংশ পাকিস্তানপন্থী বলে শেখ মুজিব এদিন তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার

www.pathagar.com

অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখল করার জন্যে ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের নির্দেশ দেন এবং ৬ দফার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

এই ৬ দফা প্রণয়নে অবদান রেখেছিলেন কয়েকজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তারা ষাটের দশকের প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরতে শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ মির্জা হুদা, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান, আবু মাহমুদ, মাজেদ খান প্রমুখ খুব সোচ্চার ছিলেন অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারে। তাদের বেশির ভাগই ছিলেন বামপন্থি চিন্তার অনুসারি। রেহমান সোবহান সম্পাদিত ফোরাম নামের পত্রিকাটিতে এসব অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও স্বায়ত্বশাসনের দাবি নিয়ে লেখালেখি করতেন। এসবের সঙ্গে আরও জড়িত ছিলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফজলে আলী, ব্যারিষ্টার ভিখারুল ইসলাম, চিত্র পরিচালক আলমগীর কবির, রফিকুল ইসলাম, খয়ের খান প্রমুখ। মাঝে মধ্যে তারা সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা পত্রিকাও বের করতেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক মহলের বাইরেও ছিলো চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশ যারা পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির কথা ভাবতেন এবং এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন।

বাঙালী অর্থনীতিবিদদের কয়েকজন শেখ মুজিবকে বৌদ্ধিক সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসেন। অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, ড. এ আর খান, স্বদেশ বোস মিলিতভাবে একটি ইকনোমিক মেনিফেস্টো তৈরি করে শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেন। এভাবে ৬ দফা হাতে পেয়ে শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন।

৬ দফার বিরোধীতা

পূর্ব পাকিস্তানের নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ৬ দফার ব্যাপারে। ন্যাপ তখনও ঐক্যবদ্ধ। ন্যাপের সভাপতি মওলানা ভাসানী সরাসরি নাকচ করে দেন ৬ দফাকে। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ৬ দফাকে 'মুক্তিসনদ' হিসাবে মানতে অস্বীকার করে। মতিয়া গ্রুপ ৬ দফাকে অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করলেও ৬ দফাকে স্বায়ত্বশাসনের কর্মসূচী বলে স্বীকার করে।

ইতিহাসের এই সময় বাংলাদেশের রাজনীতির জন্যে, বিশেষভাবে ছাত্ররাজনীতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিব তখনও বাংলাদেশের একক কোন নেতা নন। বলা যায় আর দশটা নেতার মতোই। মওলানা ভাসানী তার চাইতে অনেক বড় নেতা। শেখ মুজিব এমন কি তার দল আওয়ামী লীগের মধ্যেও প্রশ্নাতীত ছিলেন না। তার প্রমাণ প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফাকে সমর্থন করেননি। মার্চের যে সভায় আওয়ামী লীগ ৬ দফার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে সেটি ছিল গোলযোগপূর্ণ।

www.pathagar.com

ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা প্রায় সমস্তটা সময় সভাকক্ষ ঘেরাও করে রাখে। তারা বাইরে থেকে ৬ দফার পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে এবং ভেতরের নেতাদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয় যেন ৬ দফা গ্রহণ করা না হলে তারা আজ সভা থেকে ফিরে যেতে পারবেন না। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ শেখ মুজিবের পক্ষে দাঁড়ায় এবং ধীরে ধীরে শেখ মুজিব গড়ে উঠতে থাকেন।

দেশব্যাপী প্রচারণা

৬ দফা দেবার পরে শেখ মুজিব সারাদেশে এর পক্ষে প্রচারে নেমে পড়েন। তিনি তার প্রচারের প্রথম সভাটি করেন চট্টগ্রামে। কথিত যে তখন ঢাকায় ৬ দফার পক্ষে জনসভা করার শক্তি শেখ মুজিবের ছিল না। সে যাই হোক ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বামপন্থীরা তখন ৬ দফা মূল্যায়ন করতে ব্যস্ত। তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় যে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যখন মওলনা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপের জন্ম হয় তখন মওলানা প্রিয় '১৪ নম্বর' সেক্রেটারী শেখ মুজিব মওলানার সাথে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে। তখন এবং তারও আগে থেকে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্রইউনিয়ন ওয়ালারাই স্বায়ত্বশাসনের কথা বলতেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলতেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্যে ইতিমধ্যে ৯৮% ভাগ স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের পরিহাস সেই সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য শেখ মুজিব যখন বাঙালীর মুক্তির সনদ ৬ দফা ঘোষণা করলেন তখন বামপন্থীরা তার বিরোধীতা শুরু করলো। শেখ মুজিব সারাদেশে ঘুরে জনসভা করতে লাগলেন। অল্প দিনের মধ্যে ৬ দফা কর্মসূচী দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করেন সেখানেই তাকে গ্রেফতার করে সরকার একটা করে মামলা দেয়। শেখ মুজিব জামিনে মুক্তি নেন এবং পরবর্তী জনসভায় যান। এ সবের ফলে শেখ মুজিব আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অবশেষে '৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে সরকার। তাঁর গ্রেফতারের প্রতিবাদে পল্টন ময়দানে জনসভা হয়।

ছাত্রলীগ এ প্রতিবাদসভার আয়োজন করে। ছাত্রদের পাশাপাশি দেশের শ্রমিক সমাজও তাদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে এবং ৬ দফার সমর্থনে ৭ জুন হরতাল পালন করেন। হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়াসহ অনেকে নিহত হয়।

ইত্তেফাক নিষিদ্ধ

৭ জুন আওয়ামী লীগের সফল হরতালে আইয়ুব সরকারের ভিত কেঁপে ওঠে। এদিকে এই প্রথম আওয়ামী লীগও শ্রমিকদের মাঝে নিজেদের ভিত গড়ে তোলে।

৭ জুনের হরতালকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিকরাও মাঠে নেমে পড়েছিল। ইত্তেফাক ৭ জুনের খবর সারাদেশ থেকে সংগ্রহ করে ফলাও করে ছাপে।

www.pathagar.com

এতে প্রাদেশিক মোনায়েম সরকার খেপে ওঠে এবং ১৭ জুন (১৯৬৬) দৈনিক ইত্তেফাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আগের দিন ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকেও সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে।

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ ও তার সম্পাদকের গ্রেফতারের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা এই প্রশ্নে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের জরুরী সভা আহ্বানেরও দাবি জানায়।

আগরতলা মামলা ও শেখ মুজিব গ্রেফতার

৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা শুরু করেন যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিত ছিল।

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের সাথে সাথে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ৭ জুন হরতালের পর তার অনুগামী শক্তিশালী কোন কর্মসূচীও দিতে পারেনি আওয়ামী লীগ। কারণ সাংগঠনিকভাবে এ সময় আওয়ামী লীগ ছিল দ্বিধাবিভক্ত। এক অংশ ছিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা পিডিএম পন্থী, অপর অংশ শেখ মুজিবের অনুসারী বা ছয় দফা পন্থী। ১৯৬৮ সালের ১৯ ও ২০ অক্টোর হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কাউন্সিল এই গ্রুপিংয়ের প্রকাশ ঘটে।

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) চুক্তি

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ছাত্র আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে ঐক্যপ্রয়াসের ক্ষীণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সবেমাত্র ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙেছে এবং তীব্র মতাদর্শগত লড়াই সর্বস্তরে শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ছয়দফা দাবি পেশ করলে ছাত্রলীগও এ কর্মসূচিকে মুখ্য করে তোলে।

ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত সহ-সভানেত্রী মাহফুজা খানম ও সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ আলী ক্ষমতায়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সূত্রপাতের উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

চুক্তি অনুযায়ী ডাকসু পরিচালনায় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সঙ্গে ছাত্রলীগও অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়া আন্দোলনগত প্রশ্নে ছাত্রলীগ ছয়দফার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও কৃষক শ্রমিকের কতিপয় দাবি সংযুক্তিতে সম্মত হয়।

এর পূর্বে ছাত্রলীগ ছয়দফা প্রশ্নে কোনো আপসে রাজি হত না। যেকোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি পালনের সময় ছাত্রলীগ থেকে প্রথম শর্ত হিসেবে ছয় দফাকে তুলে ধরা হত। ফলে এতে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপ সবচেয়ে বিব্রতবোধ করত। কারণ ছয় দফা প্রশ্নে তাদের দ্বিধা ও আপত্তি ছিল। পক্ষান্তরে ছাত্রলীগ যেকোনো ইস্যুতেই ছয়দফা সমর্থন করাকে ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে দাবি করত। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) গ্রুপ এ ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কারণ তারা ছয়দফাকে একেবারে নাকচ করে দেয়নি। শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ কর্মসূচি মনে করত।

১৯৬৭ সালে এভাবে ডাকসুতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে ঐতিহাসিক বলা চলে। কারণ পরবর্তী সময়ে আইয়ুব-বিরোধী

www.pathagar.com

গণআন্দোলনে ছাত্রদের এগার দফা রচনার ক্ষেত্রে এই চুক্তি একটা প্রাক-কর্মসূচি হিসেবে কাজ করে।

সরকার বিরোধিতায় ঐক্য

৬ দফার সমর্থন না করেও মাওলানা ভাসানী দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ চালাতে থাকেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক, শ্রমিক ও জনসমাবেশে তিনি আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাম রাজনীতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধারা নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায় সে আন্দোলন গতি পায় নি। অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। এদিকে পাকিস্তান সরকার সব দিক দিয়ে বিকাশমান বাঙালী জাতীয়তাবোধকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। তারা আক্রমণ চালায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা বানান এবং বর্ণমালার পরিবর্তন সাধন করতে উদ্যত হয়। তখন দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এভাবে বুদ্ধিজীবীরাও এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।

একটি হত্যাকাণ্ড

১৯৬৮-র অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ঘটনা ঘটে। ১৫ অক্টোবর রাতের বেলা এস. এম. হলের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় এনএসএফ এর পাণ্ডা সাইদুর রহমান পাঁচপাণ্ডু। এম এ শেষ পর্ব পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত মাসিক ভোজের পর সরকারপন্থী জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এনএসএফ) সাইদুর রহমান পাঁচপাণ্ডুসহ নেসার উদ্দিন, আব্দুল আলীম ও শেলি আহত হন। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পালিত হচ্ছিল আইয়ুব শাসনের উন্নয়নের দশক। এই ঘটনায় এনএসএফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ফলে ২২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৪ তারিখ সাইদুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।

এই ঘটনার একটি সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়। পাঁচপাণ্ডু ছিল এনএসএফ এর সবচাইতে ভয়ঙ্কর পাণ্ডা। তার মৃত্যুর ফলে সেই ভয়ের ছায়া সরে যায় যায়। যদিও আইয়ুব সরকার তখন উন্নয়নের দশক পালন করছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে।

এগার দফা রচনা

সকল ছাত্র সংগঠনের মিলিত কর্মসূচিভিত্তিক একটি মঞ্চ তৈরি করা ছিল কঠিন ব্যাপার। কারণ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে ৬-দফা ঢোকাতে চেষ্টা করত। আর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ছিল নীতিগত দিন থেকে ছয় দফার শুধু বিরোধীই নয়, প্রতিবাদীও। ডাকসুর পক্ষ থেকেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ডাকসু এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও এন. এস.

www.pathagar.com

এফ.-এর মধ্যে বিভক্ত ছিল। ডাকসু সহ-সভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমদ (ছাত্রলীগ) এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী (এন.এস.এফ)।

তবু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাতের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয়। কারণ বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল নৈরাজ্য ও বৈষম্য ছাত্রসমাজকে কঠিন শপথে উচ্চকিত করে তোলে। ডিসেম্বরের (১৯৬৮) মাঝামাঝি থেকে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

অবশ্য এ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৭ সাল থেকে। যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি আসলেই ছাত্রলীগ বলত ৬-দফা মানতে হবে। অন্যদিকে মেনন ও মতিয়া পন্থীরাও ভাঙনের পর একই মঞ্চে একসঙ্গে আসতে চাইত না। এমন সংকটের সময়ও ১৯৬৭ সালের একুশেকে কেন্দ্র করে ৯-দফাকে ১১-দফার একটা প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ধরা চলে।

ছাত্ররা এগিয়ে আসে

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। সেই দিন ছাত্র নেতৃবৃন্দ বটতলায় এক সভা আহ্বান করেন। আহ্বানকারীরা হলেন ডাকসু সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার। তখন ১৪৪ ধারা জারি করা ছিল ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে। ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে সেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক হয়। যদিও সেখানে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে সভা চলে পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায়। ছাত্ররা বটতলা থেকে পুলিশের উদ্দেশে ইট, পাটকেল ছুঁড়তে থাকে এবং কলাভবনে মিছিল করে।

ছাত্রসমাজের ১১ দফা

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ছাত্রনেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন। ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ছিল এই সব আলোচনার কেন্দ্র। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন তিনটি ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এবং ডাকসুর নেতৃবৃন্দ ডাকসু কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এই সংবাদ সম্মেলনেই ছাত্রনেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলী ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ সময় একদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে বাঙালি জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হলো, অন্যদিকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজ বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে আসে। ৬ দফা

www.pathagar.com

দাবির সম্পূরক হিসেবে ঘোষিত হলো ছাত্র সমাজের ১১ দফা । শুরু হলো সর্বাত্মক আন্দোলন।

১১ দফা প্রণয়নের কাজটি সহজ ছিল না। কারণ আগেই বলা হয়েছে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন দুই গ্রুপের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধতা ছিল। ছাত্রলীগ যে কোন ইস্যুতেই ৬ দফা সমর্থন করাকে ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে দাবি করত। অপর দিকে ছাত্র ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে প্রধান শর্ত হিসেবে হাজির করত। সচেতন পর্যবেক্ষক খেয়াল করবেন ১১ দফার ৩নং দফায় ৬টি উপধারায় হুবহু ৬ দফাকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য দফার মধ্যে কৃষক শ্রমিকের দাবীসহ সিয়োটো, সেন্টো বাতিলসহ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদানও যুক্ত করা হয়েছে। আরও একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এনএসএফ এর পাণ্ডারা যখন ছাত্র আন্দোলন দমন করবার জন্যে সাপ ও তলোয়ারসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নিচ্ছে তখন এনএসএফ নেতা ডাকসুর জিএস নাজিম কামরান চৌধুরী আন্দোলনের সনদ ১১ দফায় সই করছেন।

তবে এই আন্দোলনে সবচাইতে বেশি লাভবান হয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং দলগতভাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তোফায়েল আহমদ পরবর্তীতে আন্দোলনের প্রতীকী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন, যদিও আন্দোলন শুরুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগঠনসমূহের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক যারা বিবৃতিতে সই করেছিলেন তাদের চেয়ে বড় মাপের নেতা তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঐ নেতাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কেউ কাউকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে চাইতেন না। ফলে সমস্ত ছাত্রের প্রতিনিধি হিসাবে তারা ডাকসুকে মেনে নেন। ডাকসুর ভিপি হিসেবে জনাব তোফায়েল আহমেদ হয়ে ওঠেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মুখপাত্র। এই জন্যে অনেকে তাকে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনে করতেন। যদিও তিনি তা ছিলেন না।

৪ জানুয়ারি ১১ দফা ঘোষণার পর ১৭ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হয়। বলে রাখা ভাল, ৪ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনের দিন পর্যন্ত কেউই, বিশেষ করে সংবাদ পত্রগুলো একে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

ঐতিহাসিক ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান

এদিকে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগ রাজনীতিক শিবিরেও নাড়া দেয়। সেখানেও জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ন্যাপ মোজাফ্ফর, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামিয়াতুল উলেমা-ই-ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ টি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক অ্যাকশান কমিটি (ডাক) নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। সেদিনই শেখ মুজিব নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এর ঘোষণা দেন।

ছাত্ররা যখন ডাক নেতৃবৃন্দের কাছে ১১ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন দাবি করে তখন তারা সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেন। ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে

www.pathagar.com

দাবি দিবস পালনের আহবান জানান তারা। ছাত্ররাও ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় সভা আহবান করে। সরকার সেদিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে।

ঢাকা শহরে ১৭ জানুয়ারি শুক্রবার দু'টি জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। একটা ডাকের আহবানে গণজমায়েত আরেকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের বটতলায় ছাত্র জমায়েত। এ সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না-করা নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। একদল ছাত্র উত্তেজিত হয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ২৫ জন আহত ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বায়তুল মোকাররমে ডাকের সমাবেশেও পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সারাদিন চলে ছাত্র-পুলিশ লড়াই। ছাত্ররা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে ইপিআরটিসির বাসে আগুন দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইপিআর বাহিনী তলব করা হয়। সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে হলে 'দুষ্কৃতিকারী' দমনে নিযুক্ত হয় ইপিআর।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন ১৯ জানুয়ারি রবিবার কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র জমায়েতের কোনো কর্মসূচী ছিল না। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বের করলে পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে এতে বেশ কিছু ছাত্র আহত এবং ৮ জন গ্রেফতার হয়।

পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ২০ জানুয়ারি সোমবার, ১৯৬৯ সকালে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। হাজার হাজার জঙ্গী ছাত্র লাঠি সোটা সহকারে সভায় উপস্থিত হয়। বক্তৃতার পালা শেষ হলে ফুলার রোড ধরে মিছিল বেরিয়ে পড়ে। শুরুতে মিছিলে কোনো পুলিশী হামলা হয় নি। শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে গিয়ে মিছিল যখন চানখাঁর পুল এলাকায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন রশীদ বিল্ডিং অতিক্রম করছিল তখন পুলিশ বাধা দিলে মিছিল দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। প্রথম অংশ পুরনো ঢাকার রাস্তা অতিক্রম করে শেষ হয় বাহাদুর শাহ পার্কে।

রশীদ বিল্ডিং-এর কাছে হামলা চালানোর পর কোনো সতর্কবাণী না দিয়ে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। ঘটনাস্থলে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের অন্যতম নেতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র, আসাদুজ্জামান গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন। গুলিতে আরও আহত হয়েছিলেন পাকিস্তান অবজারভারের ষ্টাফ ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হক (মরহুম), সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাইস্কুরের নবম শ্রেণীর ছাত্র আবু, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আবদুল মজিদ। ছাত্ররা ধরাধরি করে আসাদকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরী বিভাগে নেয়ার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। ঘটনার প্রতিবাদে দুপুরের পর পর এক ঐতিহাসিক শোক মিছিল বের হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারাদেশে তিনদিন ব্যাপী শোক ঘোষণা করে। কর্মসূচীতে ছিল, ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার হরতাল, ২২ জানুয়ারি বুধবার শোক মিছিল এবং ২৩ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় মশাল মিছিল। ২০ জানুয়ারি সোমবার কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই যে শোক মিছিল বের হয় তাতে মেয়েরা নেতৃত্ব দেয়।

ছাত্রীদের অধিকাংশই ছিল ইডেন কলেজের ছাত্রী। তারা যাতে হরতালে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেজন্যে পূর্বাহ্নেই কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রী নিবাসের গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। ছাত্রীরা সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে ও পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের অনেককেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়। এদের কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক স্রোতধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন।

ন্যূনতম প্রস্তুতি ছাড়াই, ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয় ঢাকায়। সকাল থেকেই সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসতে শুরু করে। ২০ জানুয়ারি সোমবার রাতে আসাদের লাশ নিয়েও এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন আসাদের লাশ তার গ্রামের বাড়ি হাতিরদিয়ায় পাঠানো হবে। নরসিংদীর শিবপুর হাতিরদিয়া শুধু আসাদের বাড়ি নয়, ১১ দফা আন্দোলনের সময় হাতিরদিয়া ছিল কৃষক জনতার সংগ্রামের প্রতীক। অপরদিকে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত ছিল লাশ নিতে না দেওয়া। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদদের সহ-সভাপতি ছিলেন অগ্রগামীর প্যানেল থেকে নির্বাচিত আশিকুল আলম (মরহুম)। তার উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৬৯ ভোর চারটায় ট্রাকে করে আসাদের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় হাতিরদিয়ায়। ২১ জানুয়ারি মঙ্গলবার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় শহীদ আসাদুজ্জামানের গায়েবানা জানাজা। জানাজা শেষে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে লক্ষ লোকের মিছিল বের হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিল শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে ২২ জানুয়ারি বুধবার দুপুর একটায় এক ঐতিহাসিক শোক মিছিল বেরিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৩ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মশাল মিছিলের জন্য বিকেল থেকেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা জমায়েত হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়। সন্ধ্যা হতে না হতেই উপস্থিতির সংখ্যা দাঁড়ায় লক্ষাধিক। সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয় এই জমায়েতে।

২৩ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার যে মশাল মিছিল বের হয় তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তখন পর্যন্ত বৃহত্তম মশাল মিছিল । বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে বের হয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে মিছিল শেষ হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৬৯ হরতাল।

ঘোষিত হরতালে ঢাকা শহর মানুষে মানুষে প্লাবন ডেকে আনে। সেনাবাহিনীও তলব করা হয়েছিল সেদিন। সমগ্র শহর এক অভূতপূর্ব শিহরণে জেগে ওঠে। ছাত্র-জনতার মধ্যে এমন একটা লড়াকু মনোভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে যে, তা যে কোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারতো। ছাত্র নেতারাও জনতার এই অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়াবহ কিছুর আশংকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। এই অবস্থায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অবশেষে শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দরুদ

www.pathagar.com

পাঠ করার জন্য মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়। দরুদ পড়ার ঘোষণা সেদিন লক্ষ প্রাণ রক্ষার সহায়ক হয়ে উঠেছিল। শহীদদের জানাজা শেষে দরুদ পড়তে পড়তে মিছিল পল্টন ময়দান থেকে এগিয়ে যায় ইকবাল হলের দিকে। জনতার মিছিলের জঙ্গিভাব অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে আসে। ইকবাল হলে এ সময় এক বিশাল ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৬৯ গণ জাগরণের জোয়ার প্লাবিত করে দেয় ঢাকা শহরকে। দুপুরের দিকে ১ ডিআইটি এভিনিউতে (বর্তমানে রাজউক এভিনিউ) অবস্থিত সরকার সমর্থন দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ অফিস এবং বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লীগের অফিস ও নেতাদের মালিকানাধীন পেট্রোলপাম্পে জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়।

এ জন্যেই পরবর্তী সময়ে এ তারিখকে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদিন সেনাবাহিনীর গুলিতে সেক্রেটারিয়েটের সামনে প্রথম মৃত্যুবরণ করে রুস্তম। রুস্তমের লাশ কাঁধে করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন ভাসানী ন্যাপ নেতা আনোয়ার জাহিদসহ কয়েক জন। পরবর্তী পর্যায়ে গুলিতে নিহত হয় স্কুল ছাত্র মতিউর। সমগ্র নগরী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দুপুরে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জানাজা শেষে লক্ষাধিক লোকের মিছিল পুরনো ঢাকার রাজপথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছে ইকবাল হলের মাঠে। এখানে অনুষ্ঠিত জমায়েতে বক্তৃতা করেন শহীদ মতিউরের পিতা। তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ঘোষণা করেন, 'এক মতিউরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিউরকে পেয়েছি।' সেদিন টহলদানকারী সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে ঢাকায়, আদমজীনগরে পুলিশের গুলিবর্ষণে এবং নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও ব্যাটন চার্জে ২ জন নিহত এবং তোলারাম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকসহ কমপক্ষে ৩০ জন ছাত্র আহত হয়। খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুরে পুলিশের গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকা শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে। সন্ধ্যায় যুগপৎ এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে গভর্নর মোনায়েম খান ঘোষণা করেন, বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে এবং শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। সান্ধ্য আইন জারির পর থেকে এক থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার ১৯৬৯ রাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু ২৫ জানুয়ারি শনিবার সেনাবাহিনী ও ইপিআর ঢাকা শহরে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বেপরোয়াভাবে গুলি চলে নিরীহ জনসাধারণের উপর। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় নাখালপাড়ায় গুলিতে নিহত হন আনোয়ারা বেগম। দু'এক জায়গায় জনগণ সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও কোনো সংঘর্ষ বাধে নি। এ দিন গুলিবর্ষণে নিহত ৬ ও ১৪ জন আহত হন।

www.pathagar.com

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

অথচ ১৭ জানুয়ারি বটতলায় যে সভা হয় সেটা পত্র পত্রিকায় তেমন গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়নি। কিন্তু তারপর যে বিক্ষোভ শুরু হয় বেশ দ্রুতই তা একটি গণঅভ্যুত্থানের রূপ লাভ করে। বিশেষ করে ২০ জানুয়ারি আসাদ মারা যাবার পর আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। সেদিন বটতলায় যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে হাজার হাজার ছাত্র লাঠি হাতে উপস্থিত হয়। ঐ মিছিলে যখন আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হন তখন সারাদেশ প্রতিবাদে জেগে ওঠে।

ঝানু রাজনীতিবিদ মাওলানা ভাসানী পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাস্তায় নেমে আসেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর নেতৃত্বেও শুরু হলো সরকার বিরোধী আন্দোলন। দ্রুতই তা পরিণত হলো ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে। ১৯৬৯ সালে ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৪ দিনব্যাপী স্থায়ী ৬৯'রের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের অগ্রভাগে ছিল সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। এ সময় সশস্ত্র পুলিশ, ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে; নিহতদের রক্ত রাজপথ-জনপদ হয়েছে রঞ্জিত; কারফিউ-এর বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে মিছিলে মিছিলে গর্জে উঠেছে সারাদেশ। শহর থেকে গ্রামেও এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। যা আইয়ুব শাহীর ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়।

পহেলা ফেব্রুয়ারি শনিবার মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, এগার দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ব্যতিত কোনো প্রকার আপস মীমাংসার অবকাশ নেই। তারা আরও বলেন, এগার দফা সমর্থন করে না এমন কোনো দল বা নেতার পেছনে ছাত্রসমাজ থাকবে না। পক্ষান্তরে যে কোনো রাজনৈতিক দল, নেতা, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রদের তথা শোষিত জনগণের প্রাণের দাবি এগার দফার সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, ছাত্রসমাজ তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হবে। এ ধরনের বক্তব্যের কারণ ছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারের একটি আশু গোলটেবিল বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে কানাঘুষা। ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তৃতা করেন শামসুদ্দোহা, মাহবুব উল্লাহ, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও ফখরুল ইসলাম।

শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে পরিষদ নেতা খান এ সবুর এগার দফার একটি দাবি ব্যতীত বাকি দশটি দাবিই ছাত্রদের নয় বলে যে মন্তব্য করেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ তার জবাবে ঘোষণা করেন, ছাত্ররা এদেশের সমাজেরই সচেতন অংশ। সে হিসেবে দেশের শোষিত জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক মুক্তির জন্য ছাত্র সমাজ অবশ্যই কর্মসূচী গ্রহণ করবে। দেশের সন্তান হিসেবে এ তাদের পবিত্র কর্তব্য। এর বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এগার দফার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। নেতৃবৃন্দ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, ১৯৫৮ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার পরিণতি কখনই শুভ হতে পারে না। তারা বলেন, দেশরক্ষার পবিত্র কাজেই সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত রাখা উচিত। তারা অভিযোগ করেন, গত ১৭ জানুয়ারি হতে এই পর্যন্ত পুলিশ, ইপিআর ও মিলিটারীর

www.pathagar.com

গুলিবর্ষণে কেবলমাত্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে শতাধিক ছাত্র ও নাগরিক নিহত হয়েছে। এমনকি সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকার সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী মা বোনদের মর্যাদা পর্যন্ত ক্ষুন্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

শত নির্যাতন, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ছাত্র জনতার আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ১৯৬৯ এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, 'শীঘ্রই আলাপ আলোচনার জন্য আমি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাবো। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পর পর, একটি সম্ভাব্য গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।

গুজব ছড়িয়ে পড়ে, শেখ মুজিব প্যারোলে পিণ্ডি যাবেন। মাওলানা ভাসানী তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেও মতভেদ দেখা দেয়। ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৬৯ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এক সভায় মধুর ক্যান্টিনে এ নিয়ে বিরোধ বাধে। ছাত্রদের অভিমত ছিল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করা।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার শপথ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই লক্ষাধিক ছাত্র জনতার এই সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে, আশু গণদাবি আদায় ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হতে দেওয়া হবে না। জনতা হাত তুলে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতিও সমর্থন জানায়।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, এগার দফা কর্মসূচি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের দাবি নয়, এটা দেশের আপামর জনসাধারণের বাঁচার দাবি। সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এই কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। তিনি বলেন, ছাত্ররা ক্ষমতায় আসীন বা উজির হতে চায় না, তারা কেবল জনগণের মুক্তিসনদ এগার দফার বাস্তবায়ন দেখতে চায়। সভার শুরুতে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মঞ্চে পোড়ানো হয় ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ও আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় বন্ধু' বইয়ের কপি। জনসভা শেষে এক বিরাট গণমিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার মিছিলের আয়োজন করেন মহিলারা। শহীদ মিনারে জমায়েত শেষে মিছিল বাহাদুর শাহ্ পার্ক পর্যন্ত যায়। পরদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে জরুরী আইন প্রত্যাহার করা হবে। এই তারিখে পল্টনের ময়দানে অনুষ্ঠিত ডাক-এর জনসভায় নূরুল আমীন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে জনতার পক্ষ থেকে তাকে অপমান করে নামিয়ে দেওয়া হয়। নূরুল আমীনের পক্ষে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ। তিনি এজন্য ভাসানী ন্যাপকে দোষারোপ করেন। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরাও উগ্রমূর্তি হয়ে বিক্ষোভকারীদের তেড়ে আসে। সন্ধ্যায় ভাসানী ন্যাপের কর্মীরা ১৬ তারিখের

www.pathagar.com

জনসভার প্রস্তুতিকল্পে মাইক প্রচারে বেরুলে ছাত্রলীগ কর্মীরা এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাদের উপর হামলা চালায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় ১৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৯৬৯ মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিহত হন। সরকারিভাষ্যে বলা হয়, আসামী পালাতে চেষ্টা করলে প্রহরীর গুলিতে নিহত হয়। এই ঘটনা জনমনে এক দারুণ অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ১৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার ১৯৬৯ মওলানার জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। সভায় মওলানা ভাসানী বলেন, প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে নিয়ে আসব। তিনি আরও বলেন, দু মাসের মধ্যে ১১ দফা কায়েম এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হলে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। জনসভার শুরুতে মওলানা ভাসানী সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা পরিচালনা করেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা মিয়া আরিফ ইফতেখার ঘোষণা করেন জাতীয় পরিষদ থেকে তার পদত্যাগের কথা। জনসভার শেষ পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ জনতা প্রথমে প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহম্মদ ও পূর্তমন্ত্রী মং শু প্রু'র আবদুল গণি রোডস্থ সররকারি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। এ অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে সভার কাজ শেষে হয়। এছাড়া, আগরতলা মামলার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমানের বাসভবন (স্টেট গেষ্ট হাউজ), কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পরিবাগস্থ বাসভবন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনসহ বিভিন্ন সরকারি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সন্ধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনী তলব এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। অপরদিকে সারা দেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেন প্রেসিডেন্ট। ১৮ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, ১৯৬৯ রাজশাহীতে ছাত্রজনতা বিক্ষোভ মিছিলে ইপিআরের গুলিতে নিহত হন সিটি কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নূরুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয় গেটে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্রদের মিছিল করা থেকে বিরত রাখতে গিয়ে সেনা সদস্যের গুলি ও বেয়নেটের খোঁচায় নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। এই খবর ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর রাত এগারটায় সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নাখালপাড়া থেকে সান্ধ্য আইন উপেক্ষাকারীদের মিছিল আসে নিউমার্কেট পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে গুলি করে সেনাবাহিনী বহু লোককে হত্যা করে।

২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার অবস্থা চরমে পৌঁছে। চারদিকে খণ্ড খণ্ড মিছিলে গগন বিদারি স্লোগান, 'পিন্ডি না ঢাকা-ঢাকা ঢাকা,' 'গোলটেবিল না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ,' 'জেলের তালা ভাঙব-শেখ মুজিবকে আনব।' উল্লেখ্য, লাহোরের গোলটেবিলে অংশ নেওয়ার জন্য কারাবন্দি শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেল পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা এবং সভাশেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কালো ব্যাজ পরে, কালো পতাকা কাঁধে নিয়ে খালি পায়ে শত শত মানুষ মিছিল করে দুপুর হতেই পল্টন ময়দানে

www.pathagar.com

সমবেত হতে থাকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এক বিশাল জনসমুদ্রে রূপ নেয় পল্টন ময়দান। মাঠের মানুষ, কারখানার শ্রমিক, নৌকার মাঝি হতে শুরু করে সবাই এসেছিলেন এই জনসভায়। কারও হাতে ফেস্টুন, কারও হাতে পতাকা। সদরঘাট হতে মিছিল করে নৌকার মাঝিরা এসেছিলেন কাঁধে বৈঠা নিয়ে। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন তোফায়েল আহমেদ এবং বক্তৃতা করেন শহীদ আসাদুজ্জামানের ভাই ডাঃ রাশেদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য মাহবুবুল হক দোলন, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, আবদুর রউফ, মোস্তফা জামাল হায়দার এবং নাজিম কামরান চৌধুরী। সভাপতির ভাষণে তোফায়েল আহমদ বলেন, এদেশের মুক্তি পাগল মানুষ আজ জেগে উঠেছে, ১১ দফা হচ্ছে তাদের মুক্তির সনদ।

শেখ মুজিবের মুক্তি

পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের সামরিক কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা আইনে আটক আরও ৩৪ জন বন্দী মুক্তি লাভ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেই শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'সংগ্রামী ছাত্র যে ১১ দফা দিয়েছে তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ ১১ দফার মধ্যে ৬ দফার রূপরেখাও রয়েছে'। মুক্তি লাভের পর প্রথম জনসভায় তিনি প্রায় ৫০ মিনিট কাল ভাষণ দেন। ৬ দফা দাবির ব্যাখ্যাদান করে শেখ মুজিব বলেন, আমি রাওয়ালপিন্ডি যাবো এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে তাদের দাবি তুলে ধরব। দেশ আমরা কারুর কাছে বিকিয়ে দেই নি। ৬ দফার সাথে আমার দল ও জনগণ রয়েছে।

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চের নেতৃত্ব তার হাতে চলে যায়। জনগণের মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, তার পক্ষেই সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা। রাজনৈতিক বাস্তবতার কাছে নতিস্বীকার করে পাকিস্তানী শাসকচক্র যখন তার বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা প্রত্যাহার করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায় তখনই মুজিবের একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে শেষ প্রতিবন্ধকটুকু অপসারিত হয়।

সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঐতিহাসিক ১১-দফা বাস্তবায়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। তারা ঘোষণা করেন, ১১-দফা দাবী পূরণের মধ্যেই শহীদদের রক্ত ও নির্যাতিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মেহনতী জনতার দাবী পূরণ হতে পরে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পদত্যাগ, জনগণের হাতে আশু ক্ষমতা অর্পণ এবং বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১১-দফার ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। ১১-দফা দাবীকে শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলন যখন জয়যুক্ত হয় তখন জনাব তোফায়েল বিজয়ী বীর হিসাবে আবির্ভূত হন। নিজের বিজয়ের তিলক তিনি তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কপালে এঁকে দেন। তিনি অনেকটা একক সিদ্ধান্তে ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ গণসংবর্ধনায় রাজনীতির সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দেখা গেল। বামপন্থিদের কথা ছিল, মওলানা ভাসানীর পথ ধরে শেখ মুজিবকেও প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক 'বয়কট' এর সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে এবং ১১ দফাকে বাঙালিদের মূল দাবি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু সে দাবি পূরণ হলো না।

গোলটেবিলে যোগদান

এ ইতিহাস সকলের জানা। ভাসানী এবং ভুট্টো যেখানে গোলটেবিল বৈঠক 'বয়কট' করেছিলেন; সেখানে ২৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার ১৯৬৯ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য শেখ মুজিব লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। শেখ মুজিব লাহোরে আসগর খান, বিচারপতি মোরশেদ ও আযম খানের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার ১৯৬৯ সকাল সাড়ে দশটায় রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্ট গেস্টহাউসে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠকের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঈদুল আযহার কারণে ১০ মার্চ সোমবার পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

এদিকে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ মার্চ মঙ্গলবার ১৯৬৯ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। সেদিন বগুড়ায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় লোকের তেমন সমাগম হয় নি। সভায় সভাপতিত্ব করেন তোফায়েল আহমেদ।

গোলটেবিল বৈঠক পুনরায় শুরুর পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, বৈঠক ব্যর্থ হলে দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের দুটি জনসভায় আসগর খান এবং মওলভী ফরিদ আহমদ এ ধরনের ইঙ্গিতও দেন। আওয়ামী লীগ ১৩ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৬৯ ডাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। গোলটেবিল বৈঠকে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব (ক) প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন (খ) দেশে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু করতে সম্মত হন। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তিনি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ফলে গোলটেবিল ভেস্তে যায়।

অমীমাংসিত গোলটেবিল বৈঠক শেষে ১৪ মার্চ শুক্রবার ঢাকা ফিরে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া অন্যান্য নেতাদের দায়ী করে বক্তব্য দেন।

পরবর্তীতে ঘটনা দ্রুত মোড় নিতে থাকে। ১৯ মার্চ বুধবার এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর ভাই ও আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমার সনির্বন্ধ আহ্বান, অবিলম্বে আপনারা দেশের আপামর জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি বজায় রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

www.pathagar.com

সেনাশাসন জারি হওয়ার আগে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দশজন নেতাও সর্বশেষ ঐক্যবদ্ধ বিবৃতি দেন ১৯ মার্চ বুধবার ১৯৬৯। বিবৃতিতে গণবিরোধী শত্রু ও সমাজ বিরোধীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তারা বলেন, অবিলম্বে গণবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করলে ছাত্ররা সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। তারা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ শুক্রবার ১৯৬৯ মোনায়েম খানের পরিবর্তে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ ড. এম এন হুদা। গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ও নূরুল আমীনের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় এক বেতার ভাষণে সর্বমহলের সহযোগিতাও কামনা করেন। এ পরিস্থিতিতে কাউকে কিছু না জানিয়ে ২৫ মার্চ, মঙ্গলবার সপরিবারে ঢাকা ত্যাগ করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান।

পরিবর্তনের আভাস

২৫ মার্চ (১৯৬৯) ইকবাল হলের প্রাধ্যক্ষের বাসায় ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন পুলিশের নতুন ইন্সপেক্টর-জেনারেল কে.জি.মহিউদ্দিন। উনসত্তরের আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থা থেকে প্রশাসনের উর্ধ্বতন অফিসাররা এমন করে নিয়মিতই আসতেন ছাত্রনেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে। আর কী কী পদক্ষেপ প্রশাসনে নেওয়া যায়, দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা ইত্যাদির উদ্দেশ্যেই নতুন আই.জি. এসেছিলেন।

ঠিক এমন সময়ই সাধারণ ছাত্ররা হল থেকে প্রাধ্যক্ষের বাসায় দৌড়ে আসে এবং উত্তেজনাকরভাবে বেতারে একটি ঘোষণা প্রচারের কথা জানায়। বেতারে তখন নতুন করে সারাদেশে সামরিক আইন জারির কথা প্রচারিত হচ্ছিল। ছাত্ররা অস্থির হয়ে পড়েছিল প্রতিবাদ মিছিল বের করার জন্য। ছাত্রনেতারা করণীয় কী জানার জন্য সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধুকে ফোন করেন। বঙ্গবন্ধু খুব ধীরে এবং স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন : "Wait and see"

আইয়ুবের বিদায়

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান তার ১০ বছরের শাসনামলকে 'উন্নয়নের এক দশক' হিসেবে পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এটা ঠিক যে, রাজনৈতিক অধিকার ও গণতন্ত্র না থাকলেও এ সময়ে দেশের কাঠামো গত উন্নয়ন হয়েছিল । কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সবকিছু ভেস্তে যায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ আইয়ুব খান সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন । পরদিনই ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় সারাদেশে সামরিক আইন জারি হয়। ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান দেশবাসীকে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

ইয়াহিয়ার আগমন : নতুন কৌশল

পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক আইন জারির ঘটনার প্রতিবাদে সারাদেশব্যাপী বড় ধরনের কোনো বিক্ষোভ বা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল না। বিশেষ করে ঊনসত্তরের উত্তাল গণজোয়ারের পর ইয়াহিয়ার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে কোনোকিছু করতে না পারার ঘটনার মধ্যদিয়ে ছাত্র আন্দোলন, তৎসঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা ব্যর্থতার ছবি ফুটে ওঠে। কারণ প্রথম সামরিক শাসনের সঙ্গে এ দ্বিতীয় সামরিক শাসনের, সময়ের ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

আইয়ুব খান প্রবর্তিত প্রথম সামরিক আইন জারিতে পাকিস্তানের অস্থির, কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে হতাশ দেশবাসী একটি মুক্তির আস্বাদই পেয়েছিল-এ একটি কঠিন সত্যই বটে। কিন্তু ইয়াহিয়া প্রবর্তিত দ্বিতীয় সামরিক আইনজারির সময়টা ছিল রাজনীতিকদের পক্ষে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক মহল তেমন কিছুই করতে পারল না।

রাজনৈতিক নেতাদের সমসাময়িক আচরণ ও কার্যাবলি থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁরা পূর্ব থেকেই দেশে সামরিক আইন জারির কথা জানতেন। বিশেষ করে, পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা সামরিক আইনের ঘোষণাকে মৌন সমর্থনই জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও অদ্রুপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। মাওলানা ভাসানী এসময় পশ্চিম পাকিস্তান সফরে ছিলেন সামরিক আইন জারির মাত্র পূর্বদিন তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। সামরিক আইন জারি হতে পারে এ সংবাদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাওলানা ভাসানীই পূর্ব পাকিস্তানে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে সামরিক বাহিনীর সেনাপতিদের সাথে তার বৈঠক হওয়ার সত্যতা প্রশ্নাতীত ছিল না। তাঁর অনুসারী ছাত্রনেতাদের কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন নতুন করে 'মার্শাল ল' আসলে তারা কী করবে, কিন্তু তিনি নিজে কোনো নির্দেশ দেননি। বরং তার পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার নির্ধারিত কর্মসূচি রেখে রাতের বেলায় রহস্যময়ভাবে ঢাকা ছেড়ে তিনি সন্তোষ চলে যান।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অপর নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ইকবাল হল থেকে টেলিফোন করে সামরিক শাসন ঘোষণার প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরামর্শ চেয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিমুখ হন। বঙ্গবন্ধু তাদের অপেক্ষা করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দান করলে সংগঠিতভাবে আর কিছুই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তবু সামরিক আইন ঘোষণার বিরুদ্ধে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ও আশপাশ এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল করে। এ মিছিলে যোগদান করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্ম্পার্শ্বে গড়ে ওঠা প্রচুর সংখ্যক বস্তিতে বসবাসকারী মানুষজন। এ বস্তিবাসীরা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অত্যন্ত বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। ছাত্রদের সামনের কাতারে শামিল হয়ে বস্তিবাসীরা মিছিল করে এবং অনেকে আত্মাহুতি দেয়।

www.pathagar.com

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংকুচিতভাবে হলেও অনুষ্ঠিত হয়। তবে এসব মিছিলে শুধু ছাত্ররাই নয়, ব্যাপক হারে শ্রমিকরাও যোগদান করে। সামরিক আদালতে এজন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে ৩১ জনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য গ্রেফতার করা হয় তাদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক অঞ্চল থেকে গ্রেফতারকৃত।

এল এফ ও জারি

২৮ মার্চ প্রদত্ত ভাষণে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা ,৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন । একই সঙ্গে তিনি ৩০ মার্চ হতে আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order) বা এল এফ ও জারি করেন ।

ছাত্রদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

এদিকে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও ছাত্রদের সম্বন্ধে অধিক মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। ২৮ মার্চ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, 'ছাত্ররা আগের মতোই যানবাহনে বিশেষ ছাড় (কনসেশন) পাবে'। ৩০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডি থেকে এ ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়– বাস, রেল ও বিমানে যাতায়াতে ছাত্রদের সুযোগসুবিধা অব্যাহত থাকবে। শুধু তাই নয়, সামরিক কর্তৃপক্ষ ৩০ মার্চ এক ঘোষণাবলে ধর্মঘট, গোলযোগে ক্লাস না-হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের একমাসের বেতন মাফ করে দেওয়ার কথা প্রচার করে। ৩১ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের জন্যও অনুরূপ 'উৎকোচের' ব্যবস্থা করে ছাত্রদের খুশি করার চেষ্টা করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়-যাদের বেতন ১০০ টাকা, তারা ২০% এবং যাদের বেতন ১০১-২০০ টাকা তারা ১৫% ভাতা পাবেন।

রাজনৈতিক নেতাদের দ্বিধা-সংশয় সত্ত্বেও বাঙালীরা তাদের দাবীর প্রশ্নে অনড় থাকে। ছাত্র সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। দেশব্যাপী সামরিক আইন উপেক্ষা করে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক আইন বিরোধী প্রচারণা ও মিছিলের অপরাধে অসংখ্য নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। দ্রুত সামরিক বিচারে অনেকের সাজা হয়।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে বিভক্তি

আইয়ুবের বিদায়ের' সময় থেকেই ছাত্র আন্দোলনে মারাত্মক বিভেদ শুরু হয়। বিভেদের সূত্রপাত করে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে তখন চীনপন্থী রাজনীতির বহু উপদল কাজ করত। এদের অনেকেই ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করাকে সংশোধনবাদী কার্যকলাপ মনে করত। ফলে একটি উপদলের সবসময়ই প্রচেষ্টা ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-কে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে বের করে আনা। এ উদ্দেশ্যে তারা মাঝে মাঝে বিভেদমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিত।

www.pathagar.com

২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর গুরুতর মতবিরোধ ঘটে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে সংগ্রামী জননেতাদের মধ্য থেকে শেখ মুজিব, মাওলানা ভাসানী, মণি সিংহ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে একযোগে সংবর্ধনা দেওয়ার বিরোধিতা করে ছাত্রলীগ। তারা শেখ মুজিবকে একা সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য জেদ ধরে এবং মণি সিংহকে কোনোপ্রকার সংবর্ধনা দেওয়ার বিরোধিতা করে। তারা শেখ মুজিবকে একা সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য জেদ ধরে এবং মণি সিংহকে কোনোপ্রকার সংবর্ধনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে থাকে। অবশেষে আপস ফর্মূলায় রেসকোর্স ও পল্টনে দুটি পৃথক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও ছাত্রলীগ (তোফায়েল-এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

এ মতভেদ ও বিরোধের রেশ শেষপর্যন্ত এমন পর্যায়ে যায় যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়ে। সংগ্রাম পরিষদের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি না ঘটলেও মার্চ (১৯৬৯) পর থেকেই ছাত্র সংগঠনগুলি আলাদা-আলাদা দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো জরুরি ইস্যুতে এবং মঞ্চে বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা অথবা বিবৃতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কখনোই আর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে কিছু ঘটেনি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যকার মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব-বিরোধে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সংগঠনগুলি সর্বশেষ যৌথ বিবৃতি দেয় ২৯ অক্টোবর (১৯৬৯)। পূর্ব পাকিস্তানে অব্যাহত খাদ্যসংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (দুলন) সর্বশেষ যুক্ত বিবৃতি দেয়।

এরপরই ছাত্র সংগঠনগুলির মতানৈক্য বিরোধে পর্যবসিত হয়। আর এ বিরোধের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত পয়লা জানুয়ারি (১৯৭০)। এদিন থেকে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের অধীনে প্রথম রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ ২৮ ডিসেম্বর (১৯৬৯) এক যৌথ বিবৃতিতে পয়লা জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ছাত্র জমায়েত, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

এ বিবৃতির কারণেই অনেকেই ভেবেছিলেন ছাত্রদলগুলি সম্ভবত আবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু পয়লা জানুয়ারি (১৯৭০) বৃহস্পতিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগ (তোফায়েল), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও এন.এস.এফ. (দুলন)-এর যে যৌথসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা শেষ পর্যন্ত তো অনুষ্ঠিত হলোই না, বরং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির মধ্যে পাশাপাশি দুটো উত্তেজনাকর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের পূর্বেই সভার প্রস্তাব নিয়ে বিরোধ বেধে উঠে। সামরিক আইন বলবৎ থাকার প্রশ্ন ও ৬-দফা ভিত্তিক ১১-দফা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর সুরাহা না হওয়ায় ছাত্রলীগ এককভাবে একটি এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও এন.এস.এফ.

www.pathagar.com

(দুলন) যৌথভাবে অন্য আরেকটি পৃথক সভার আয়োজন করে। উভয় সভাতেই মাইক ব্যবহৃত হওয়ায় পাল্টাপাল্টি উচ্চ-আওয়াজে কারো বক্তব্যই শোনা যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তেজনাকর এ সভা কোনোপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়।

জটিলতা বৃদ্ধি

এর মধ্যেই ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজবন্দি মুক্তির দাবি আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার তৎপরতা অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে নানা ধরনের জটিলতাও বাড়তে থাকবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৪ জানুয়ারিতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে। এদিনের সংবাদপত্রে ছাত্রলীগের সভাপতি ও ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমদ এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, ১২ জানুয়ারি তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এক সভায় 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছে।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, দেখা যাচ্ছে, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৩টি অঙ্গদলই ১১-দফার বিরোধীতা করছে। ছাত্রলীগ ১১-দফার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

১৯ জানুয়ারি (১৯৭০) সংবাদপত্রে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর সভাপতি সামসুদ্দোহা ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান খান, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহীম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

তাঁরা বলেন: সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা থেকে অসংখ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ সংগ্রাম পরিষদ সম্পর্কে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে। ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর কাছে প্রকৃত ঘটনা পরিস্কার করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর সকলেরই জানা আছে যে, গত বছর ৪টি সংগঠন-পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ও ডাকসুর মিলিত ১১-দফার ঐক্যজোটই ছিল সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। গত বছর এই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১১-দফার দাবিতে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতার মরণপণ সংগ্রামের ফলে দেশে গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব শাসনের অবসান ঘটে।

বর্তমান সামরিক শাসনের আমলে আসন্ন ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনে আমরা বিস্মিত হয়েছি। শত শত শহীদের রক্তদান ও গণঅভ্যুত্থানের ফলে আজ সামরিক সরকার গণদাবির কয়েকটি ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে সত্য কিন্তু পূর্ব বাংলার

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার দাবি তথা ১১-দফা যেখানে আজো আদায় হয়নি, সেখানে ছাত্রঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বাইরে গিয়েছে। শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। এমতাবস্থায় আমরা ঘোষণা করছি যে, ছাত্রলীগের এককভাবে গঠিত নিজস্ব সংগ্রাম পরিষদের সার্থে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজের কোনো সম্পর্ক নেই।

নূর খান শিক্ষা কমিশন

ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যে বিষয়টির প্রতি প্রকাশ্যে তাদের বেশি তৎপর দেখা যায় তা হচ্ছে, ছাত্র এবং শিক্ষা। প্রথম থেকেই এ সরকার ছাত্রদের খুশি রাখার জন্য বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনুরূপ শিক্ষকদের সম্পর্কেও তাদের অধিক মনোযোগ দেখা যায়।

সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক, এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খান ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথম থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন।

২৮ এপ্রিল, ১৯৬৯ সংবাদপত্রের পাতায় সর্বপ্রথম এ নয়া সামরিক সরকারের শিক্ষা নীতি বিষয়ে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নতুন একটি শিক্ষানীতির রূপরেখাও তারা ঐদিন প্রকাশ করে। এতে বলা হয় ছাত্ররা শুধু পরিচালিত হবে না, পরিচালনায়ও অংশ নেবে। ছাত্রদের ইউনিয়ন ও সংগঠন করার অধিকার থাকবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি মঞ্জুরি কমিশন গঠন করা হবে।

এ রূপরেখার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ৩ জুলাই, ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের প্রশাসন কাউন্সিলের সদস্য ও সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার মার্শাল নূর খান একটি নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

শিক্ষানীতির প্রশ্নে ছাত্র সমাজ

নূর খান প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতি নিয়ে উভয় পাকিস্তানে বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে বক্তৃতা, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, সেমিনার ইত্যাদি হতে থাকলেও ছাত্র সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলে, তবে অনেক দেরিতে।

পূর্ব পাকিস্তানের ৩১ জন ছাত্রনেতা ১৩ আগস্ট (১৯৬৯) এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রথম জানান নূর খান ঘোষিত শিক্ষানীতির প্রতি তাদের কোনো সমর্থন নেই। তারা বলেন, এটা ছাত্রদের ১১-দফার পরিপন্থী।

ছাত্রনেতারা দাবি করেন, শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে এবং আদর্শ রক্ষার নামে স্কুলসমূহে ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা চলবে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা ও উর্দু বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে নেতারা বলেন, অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর এ ভাষার বোঝা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ, ছাত্রলীগ (তোফায়েল), রোকেয়া হল ছাত্র সংসদ, ইউকসু, রাকসু, ডাকসু, বাকসু, জগন্নাথ হল, ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ স্বাক্ষর করেন।

শিক্ষানীতি নিয়ে বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি এর পরেও অব্যাহত থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের ৩টি সংগঠনের ৬ জন নেতা পুনরায় আরেক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্রসমাজ খসড়া শিক্ষানীতিকে সমর্থন করতে পারে না। কারণ এ খসড়া শিক্ষানীতিতে এমন বক্তব্য ও সুপারিশ রয়েছে যা আইয়ুব আমলের শিক্ষানীতির চেয়েও অগ্রহণযোগ্য। এ শিক্ষানীতিতে আর নতুন কলেজ খুলতে না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বাতিল করেছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব। পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশের মতো বৈষম্যমূলক প্রস্তাবও করেছে।

বিবৃতিদাতারা বলেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রসম্মত ও সহজলভ্য করা হোক। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিরোধীতা নয়। কিন্তু একটি গোষ্ঠীবিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ইসলামবিরোধীতা হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেশে উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

১১-দফা আন্দোলনের এক বছর পূর্তি

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের সর্বশেষ দুঃখজনক পরিণতির পটভূমিতে ঊনসত্তরে গড়ে ওঠা ১১-দফা আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে থাকে। একসময়ে শুধু যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে গেল তাই নয়, প্রায় প্রতিটি ছাত্রসংগঠনই (একমাত্র ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ব্যতীত) তাদের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছাত্রপ্রভাব কমতে থাকে এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রভাব বাড়তে থাকার কারণে ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের পিতৃদলের রণকৌশলের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অব্যাহত ভাঙন, আন্তঃবিরোধ, কলহ এবং আন্তঃদলীয় মতাদর্শগত লড়াই তীব্র হতে থাকে।

এ অবস্থার মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানের সকল ছাত্র সংগঠন ১৯৭০-এর ১৭ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১-দফা সপ্তাহ পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সপ্তাহের কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন, ছাত্রসভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, শহরের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিফলক স্থাপন, চিত্র প্রদর্শন, প্রভাতফেরি, বিক্ষোভ মিছিল এবং পল্টনে জনসভা ও গণসঙ্গীতের আসরের কথা ঘোষণা করে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ১১ জানুয়ারি (১৯৭০) সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ১৭ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত এগার দফা সপ্তাহ এবং ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এ

www.pathagar.com

উপলক্ষে প্রচারপত্র বিলি, পোষ্টার, মিছিল, খণ্ড মিছিল, শহীদ স্মরণে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরি প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১২ জানুয়ারি সোমবার, ছাত্র ইউনিয়ন মেনন ও মতিয়া গ্রুপ, এন.এস.এফ. (দুলন গ্রুপ) এবং বাংলা ছাত্রলীগ (আলমুজাহিদী) ঐক্যবদ্ধভাবে ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে এক যুক্ত বিবৃতি দেয়।

১৪ জানুয়ারি সংবাদপত্রে উপরিউক্ত ৪ সংগঠনের বিবৃতি প্রকাশিত হলে ১৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগ (তোফায়েল) তাদের এককভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে আরেকটি সমান্তরাল কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সামরিক আইন ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা-ধরপাকড়

সামরিক আইন ঘোষণার পরপর সরকারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের খুশি রাখতে চায়। এজন্য তারা ছাত্রদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দানের কথাও একে একে ঘোষণা করছিল। কিন্তু সরকারের গোয়েন্দা শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে সারাদেশে সামরিক সরকার ছাত্রনেতাদের হয়রানির জন্য বিভিন্ন মামলা দায়েরও করতে থাকেন। কোথাও কোথাও আবার লোক-দেখানোর জন্য ছাত্রদের মামলা প্রত্যাহারও হতে থাকে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে ১৪৪-ধারা ভঙ্গ ও অন্যান্য অভিযোগে প্রায় ২৮০ জন সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে আইয়ুব-মোনায়েম সরকার ৩৫টি মামলা দায়ের করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রসাশনের নির্দেশে ৭ মে এসব মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক মহল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে তার ২৮ নভেম্বরে জাতির উদ্দেশে দেওয়া বেতার ভাষণে ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দানের কথা ঘোষণা করেছিলেন ।

তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ ডিসেম্বর (১৯৬৯) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (তোফায়েল) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এক যুক্ত বিবৃতিতে পয়লা জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ ছাত্র জমায়েত, মিছিল ও সভা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, জানুয়ারি মাসেই শহীদের বুকের রক্তে গণঅভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল এবং ১১-দফা দাবির সনদ রচিত হয়েছিল। তারা পয়লা জানুয়ারি সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে ১১-দফা কায়েমের শপথ নেওয়ার জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ অবস্থায়ও ছাত্র সংগঠনগুলো ১৯৭০ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১ দফা সপ্তাহ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) ১৭ থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১ দফা সপ্তাহ এবং ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানায়। ১২ জানুয়ারি এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া গ্রুপ) ঐক্যবদ্ধভাবে ২৪ জানুয়ারি

www.pathagar.com

গণঅভ্যুত্থান দিবস পালনের আহ্বান জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এই কর্মসূচী থেকে দূরে অবস্থান নিয়ে স্বতন্ত্র কর্মসূচী গ্রহণ করে। তাদের স্বতন্ত্র কর্মসূচীর শেষ পর্যায়ে ২৫ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় জনসভা।

কিন্তু ২৪ জানুয়ারি (১৯৭০) গত বছরের গণঅভ্যুত্থান দিবস স্মরণে অনুষ্ঠান করার সাথে যুক্ত থাকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্মলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিধানচন্দ্র বিশ্বাসকে সামরিক আইনে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরা উভয়েই ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র জগন্নাথ হল শাখার নেতা। ২৪ জানুয়ারি হরতালের সময় এদের গ্রেফতার করা হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৭০) সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এ দু-ছাত্রনেতার কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা ও মিছিল করে। সভায় অন্যান্যর মধ্যে শওকত চৌধুরী, শেখর দত্ত ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বক্তৃতা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সংগঠনের ৩৭ জন ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে নির্মল ও বিধান বিশ্বাসের মুক্তি দাবি করে। পয়লা ফেব্রুয়ারি রোকেয়া হলে সর্বদলীয় ছাত্রসভায় নির্মল ও বিধানের মুক্তি দাবি করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৭০) তারিখে শহীদ দিবস উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত এক জনসভায় স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার ১১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই ১১-দফা কর্মসূচি মূলত ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের কর্মসূচি।

'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে বড় ধরনের ছাত্র আন্দোলন ছিল– 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামক একটি গ্রন্থ স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচি থেকে বাতিলের আন্দোলন। গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে যারা নবম ও দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের জন্য প্রথম পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা হয়েছিল, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পূর্ণ ২০০ নম্বরের প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্ধারিত হল।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলের সাধারণ ছাত্ররাই এ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করে যাচ্ছিল। রাজনীতির সাথে যুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি এর সাথে প্রথমে জড়িত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এ বিষয়ে দুটো আলাদা আলাদা স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় এবং সারাদেশে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। দুই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন সারাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব একান্ত শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করে দাবি আদায় করে নেয়।

তেসরা জুলাই (১৯৭০) ছাত্রদের এ সম্পর্কিত আন্দোলনের খবর প্রথম সংবাদপত্রে স্থান পায়। খবরে বলা হয়, সিলেটের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা

www.pathagar.com

বেশকিছুদিন ধরে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' নামক একটি বই পাঠ্যসূচি থেকে বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ ছাত্রদের দাবি সমর্থন করে বিবৃতি দেন।

এরপর দোসরা আগস্ট থেকে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ কাগজের পাতায় আসতে থাকে। এদিন ঢাকা সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ষান্মাসিক পরীক্ষায় 'দেশ ও কৃষ্টি' বিষয় বর্জন করে। পরীক্ষা বর্জন করে ছাত্ররা স্কুল-প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা করে অবিলম্বে পাঠ্যসূচি থেকে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বইটি বাতিলের আহ্বান জানায়।

এদিন ঢাকা শহরের পনেরটি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি যৌথ বিবৃতি দিয়ে অবিলম্বে বইটি প্রত্যাহারের দাবি তোলে। বিবৃতিদাতা স্কুলগুলি ছিল– সেন্ট গ্রেগরিজ, ঢাকা কলেজিয়েট, মুসলিম হাই, গ্রাজুয়েট হাই, ইস্ট বেঙ্গল ইনসটিটিউট, আরমানিটোলা হাই, কে এল জুবিলী, ওয়েস্ট এন্ড, পগোজ হাই, ইসলামিয়া গভ. ল্যাবরেটরি, নবাবপুর গভ. হাই, নারিন্দা গভ. হাই, গেন্ডারিয়া হাই ও সেগুনবাগিচা হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

৬ আগস্ট (১৯৭০) 'দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিলের দাবিতে সারা শহরের স্কুল ছাত্রদের নিয়ে শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সমাবেশ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)। সংগঠনের সভাপতি সামসুদ্দোহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করে। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বায়তুল মোকাররমে এসে শেষ হয়। এখানে ৮ আগস্ট পুস্তক বাতিলের দাবিতে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

এদিন বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আলমুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেনও বইটি প্রত্যাহারের দাবিতে বিবৃতি দেন।

৮ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বটতলায় এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও বাংলা ছাত্রলীগ যৌথভাবে শহীদ মিনারে পুস্তক বাতিলের দাবিতে সমাবেশ করে। এদিন সংগঠনগুলির ডাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটও পালিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বটতলায় সমাবেশের পর মধুর কেন্টিনে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পাল্টা আরেকটি পূর্ব পাকিস্তান স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এতে মোস্তাক হোসেন ও লুৎফা হাসিন রোজী যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং আবুবকর সিদ্দিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এরপরই দেশ ও কৃষ্টি আন্দোলনে দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি এসে পড়ে। ঢাকার ৬৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সভায় গঠিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ আগস্ট এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগ পরিচালনাধীন স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করে।

১০ আগস্ট ডাকসু ও ছাত্রলীগের সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট শেষে এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন আ. স. ম. আবদুর রব। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল ডি.পি.আই. অফিসে ধরনা দেয়।

www.pathagar.com

১৫ আগস্ট রোববার ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মধুর কেন্টিনে মো. হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক কর্মীসভায় 'দেশ ও কৃষ্টি' বাতিলের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান।

ইতোমধ্যে এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে পর্যন্ত সাধারণ ছাত্ররা বইটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করতে থাকে।

১৯ আগস্ট স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুই গ্রুপেরই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদ ২১ আগস্ট শুক্রবার ঢাকার সকল স্কুলে ও শনিবার প্রদেশের সকল স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদও অনুরূপ কর্মসূচি নেয়। ছাত্রলীগ, ডাকসু, চাকসু ও রাকসু এ গ্রুপের কর্মসূচি সমর্থন করে বিবৃতি দেয়।

পরদিন দুটি স্কুল সংগ্রাম পরিষদের ডাকেই ছাত্রধর্মঘট অত্যন্ত সফলভাবে পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত স্কুল সংগ্রাম পরিষদের সভা তকছিম আহমদের সভাপতিত্বে বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় থিসিস মার্কা বই 'দেশ ও কৃষ্টি' পুরোপুরি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভায় এক প্রস্তাবে সাধারণ বিজ্ঞান থেকে কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাস বাতিলেরও প্রতিবাদ জানানো হয়।

ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় শহীদ মিনারে। মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ডাকসু নেতা আ. স. ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন বক্তৃতা করেন। তারা দেশ ও কৃষ্টি পুনর্লিখনের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন।

দীর্ঘদিন বিরতির পর পূর্ব পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে মুখ খোলে এবং ঘোষণা করে, ১৯৭২ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য বইটি সহজ ভাষায় লেখা হচ্ছে এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০-এর বেশি হবে না। সরকার বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলে, ১৯৭১ সালে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের সুবিধার্থে এরই মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম খন্ডের ৫টি অধ্যায় তাদের পড়তে হবে না।

২১ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের ৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিচালক অনুরূপ আরেকটি বিবৃতি দেন। তিনি এতে অতিরিক্ত যোগ করেন যে, পাকিস্তানের উদ্ভব ইতিহাস ও আজাদী আন্দোলন সম্পর্কে একটা মুখস্থ ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই এ ধরনের একটি পাঠ্যবিষয় অপরিহার্য মনে করেন। তিনি আশা করেন ছাত্ররা এই হ্রাসকৃত পাঠ্যসূচি সহজ মনেই গ্রহণ করবে।

২২ আগস্ট শনিবারেও দুটি স্কুলছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শহরের স্কুল ছাত্রদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত সংগ্রাম পরিষদের শহীদ মিনারের সমাবেশে তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা

www.pathagar.com

বেগমকে বহিষ্কারের নিন্দা করে পুনরায় তাকে ভর্তি করার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্কুল ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তাদের বৃহত্তর সংগ্রাম আরো জোরদার করার দাবিতে পয়লা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুনরায় প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ তাদের ঐদিনের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দেয়।

২৯ আগস্ট পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও পয়লা সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ডাক সমর্থন করে বিবৃতি দেয়। এদিন ১৬জন বুদ্ধিজীবী 'দেশ ও কৃষ্টি' গ্রন্থখানি পুরোপুরি বাতিলের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানে নম্বর কমিয়ে এবং সাধারণ বিজ্ঞানে ব্যবহারিক ক্লাস বাতিল করে নতুন বই চালু করে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। এতে স্বাক্ষর করেন কবি সুফিয়া কামাল, কবি জসীমউদ্দীন, শহীদুল্লাহ কায়সার, ড. আহমদ শরিফ, ওয়াহিদুল হক, সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, বজলুর রহমান, জাহেদুর রহিম, জহির রায়হান, খান আতউর রহমান প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ স্কুলের ছাত্ররা ১০ সেপ্টেম্বর থেকে 'দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিলের দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্লাস থেকে বিরত থাকা শুরু করে। ছাত্রলীগ সমর্থিত স্কুল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার থেকে প্রদেশের সকল স্কুল-কলেজে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ দিন ব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে জেলা ও মহকুমা শিক্ষা অফিসারের কার্যলয়ে অবস্থান-ধর্মঘট ও মশাল মিছিলের আহ্বান জানায়।

৩০ সেপ্টেম্বর এ পরিষদের আয়োজিত বটতলার সভায় ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম. রব 'দেশ ও কৃষ্টি' বইটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

২২ অক্টোবর এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শিক্ষা বোর্ডগুলিকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মোতাবেক ৪টি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহযোগিতায় 'পাকিস্তানের ইতিকথা' নামে একটি নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করছেন বলে জানান। এ বই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বইটিও প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

ডাকসু নির্বাচন : ১৯৭০

২৮ জানুয়ারি (১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের নির্বাচন পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী গৃহীত হয়। সংশোধনীতে বলা হয়, এখন থেকে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যক্ষভাবে। এর ফলে ডাকসুর সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের সরাসরি ভোটে।

www.pathagar.com

পূর্বে ডাকসু নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। একেক বছর চক্রাকারে এক-একটি হল থেকে ডাকসু কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন।

গঠনতন্ত্র সংশোধনীর পর কর্তৃপক্ষ ১৬ মে (১৯৭০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-র নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। এ প্রথম প্রত্যক্ষ সরাসরি ছাত্রদের ভোটে ডাকসু কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে বলে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে নতুন উদ্যম ও সারা জাগে।

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দুইটি পরিষদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ আ স ম রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখনকে তাদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। এ সত্ত্বেও বিরোধী গ্রুপ মাহবুবুল হুদা ভূইয়াকে ডাকসুতে সহ-সভাপতি হিসেবে দাঁড় করায়। ছাত্রলীগের ইকবাল হল সংসদেও দু'টি পরিষদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ জিনাত-শফিক পরিষদকে তাদের অফিসিয়াল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। এ নিয়ে ছাত্রলীগে উত্তেজনা চলতে থাকে।

কিন্তু ১৪ মে ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের প্রাক্কালে কলাভবনে গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের মূলে ছিল ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাথে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর ৩টি উপদলের মতনৈক্য। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর ৩টি উপদল মাহবুবউল্লাহ, দিলীপ বড়ুয়া এবং মোস্তফা জামাল হায়দার ও জুনোর নেতৃত্বাধীন অংশগুলি সকলেই ডাকসু নির্বাচন বয়কট করেছিল। কলাভবনে তারা নির্বাচন বিরোধী ৩টি বিভক্ত মিছিল বের করে।

কলাভবনে এসময় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র মিছিল চলছিল। একপর্যায়ে বিভিন্ন পক্ষ স্লোগান দিতে দিতে পরস্পর মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ বেধে যায়। মতিয়াপন্থীদের সাথে প্রথমে সংঘর্ষ বাধে মাহবুবউল্লাহ গ্রুপের। পরে জামাল হায়দার-জুনো গ্রুপও এতে যোগ দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম সংঘর্ষে আহত হন। সকল সংগঠনই এ ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেয়।

নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্রলীগের আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন যথাক্রমে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ৮টি হল সংসদের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ৩টিতে এবং ছাত্রলীগ ৫টিতে জয়লাভ করে।

ইউকসু নির্বাচন

৩ জুলাই ১৯৭০, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের নির্বাচন ঘোষিত হয়। কেন্দ্রীয় ও হল সংসদের নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (তোফায়েল)-এর মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সবকয়টি আসনই ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) লাভ করে। ইয়াফেস ওসমান সহ-সভাপতি ও আবুল কাশেম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

বাকসু নির্বাচন

পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)-এর ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ আগস্ট (১৯৭০)। এখানেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে। জহিরউদ্দীন তালুকদার সহ-সভাপতি এবং আবদুল খালেক সাধারণ সম্পাদক-এর পদসহ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মোট ১৭টি পদে জয়লাভ করে। বার্ষিকী সম্পাদক ও দুটি সদস্যপদে ছাত্রলীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করে।

স্থানীয় ও বিষয়ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন

গণঅভ্যুত্থানের পর সারাদেশের ছাত্রসমাজের দৃষ্টি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে তাদের নিজ নিজ স্থানীয় সমস্যার দিকে নিবদ্ধ হয়। বস্তুত ছাত্ররা এ সময়টায় তাদের নিজেদের লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ের সমস্যা নিয়েই বড় বড় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র সংগঠনগুলি ছাড়াই ছাত্ররা যার-যার প্রতিষ্ঠান, বিভাগের ও এলাকার মাধ্যমে এসব আন্দোলনকে জাতীয় রূপ দিতে সক্ষম হয়।

সমসাময়িক সময়ে ছাত্রদের স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে যেসব ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন, বাণিজ্য ছাত্রদের আন্দোলন, প্রকৌশল ছাত্রদের আন্দোলন, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের আন্দোলন, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্রদের আন্দোলন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমস্যা , জগন্নাথ কলেজের প্রাদেশীকিকরণ বিরোধী আন্দোলন, গ্রাফিক আর্টস ছাত্রদের আন্দোলন, মাদরাসা ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা, সমাজকল্যাণ ছাত্রদের বিক্ষোভ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, সমাজবিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলন, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের আন্দোলন, মহসিন হল ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলন, শিক্ষক ধর্মঘট, আ.ই.আর ছাত্রদের ধর্মঘটসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। এসব আন্দোলন পুরোটুকুই হয় অরাজনৈতিক ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্র-সংগঠনগুলির প্রভাব ছাড়াই। তবে বিভাগীয় ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছাত্ররা স্থানীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বেই এসব আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে অথবা জাতীয় রূপ দিতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তানের রাজনীতির নতুন মোড়

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এভাবে ছাত্রদের স্থানীয় ও আশু দাবি সংবলিত লাগাতার আন্দোলনের ফলে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠতে থাকে।

আর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল, এই সময় একমাত্র নূর খান শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও 'পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি' বই বাতিলের আন্দোলন ছাড়া বাকি প্রায় সবগুলো স্থানীয় ছাত্র আন্দোলন ছিল সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়া।

www.pathagar.com

তবে এক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় দিক হল, এসব স্থানীয় ও আশু দাবির ছাত্র আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ ছাত্ররা ছিল ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উজ্জীবিত। এই মন্তব্যের উৎকৃষ্ট পরিচয় মেলে বিজ্ঞান ছাত্রদের আন্দোলনের দাবিনামায়। পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্যের রাজনৈতিক চেতনার আলোকে গড়া ছিল তাদের দাবিনামা।

যে পরিস্থিতি পাকিস্তানের সমগ্র রাজনীতিকে ঢিমে তালে নিয়ে গিয়েছিল, ৬৯ পরবর্তী সাধারণ ছাত্র আন্দোলনই তার থেকে রাজনীতিকে বের করে নিয়ে আসে। কারণ ইয়াহিয়া খান কোনোপ্রকার 'রাজনৈতিক অভিলাষ' নেই বলে এদেশের রাজনীতিতে পদচারণা শুরু করে নির্বাচনের যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন আর এই নির্বাচন থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা-ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুভ সূচনার ইঙ্গিতকে প্রতিষ্ঠিত করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খানের আগমন থেকে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত সময়টা মুক্তিযুদ্ধের প্রাক-প্রস্তুতির বিষয়গত অবস্থার শর্ত পূরণ করে। এই সময়েই বিভিন্ন সংগঠনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি, ইশতেহার রচনা, প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে এ নিয়ে মতনৈক্য শুরু হয় এবং ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ধরপাকড়, বিচার, গ্রেফতার, পরোয়ানা জারি ও শাস্তিদান চলতে থাকে।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের ভাঙন

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছিল মূলত বৃটিশ আমলের নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগেরই উত্তরসূরি। 'নিখিল বঙ্গে'র স্থলে এ সংগঠন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান' বসিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর পাকিস্তানে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে এ মুসলীম সরকারের তল্পীবাহক 'নিখিল' ছাত্রলীগ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলে বিদ্রোহী অংশ শামসুল হুদা চৌধুরী ও শাহ আজিজুর রহমানকে বাদ দিয়ে রাজশাহীর নইমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে নতুন করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ গঠন করে (শুধুমাত্র 'নিখিল' শব্দটি বাদ দিয়ে)। সে থেকে (১৯৪৮ সাল থেকে) ছাত্রলীগ শাহ আজিজ গ্রুপ ও নইমুদ্দীন গ্রুপ নামে প্রথম ভাঙন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলামের (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক কমিটির সভায় সংগঠনের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের প্রস্তাব অস্বীকৃত হলে কয়েকজন পদত্যাগ করেন। পরে নইমুদ্দীন আহমদও ১৯৪৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে বাদ পড়েন। জনাব দবিরুল ইসলাম সভাপতি ও খালেক নেওয়াজ খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্রলীগের ১৯৪৯-৫০ সালের সম্মেলনে একটি গ্রুপ, সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করে ব্যর্থ হয়ে সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। এদের অনেকে পরে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং যুবলীগ গঠন করেন। জনাব দবিরুল ইসলামের পর জনাব শামসুল হক চৌধুরী ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক করবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নাম রাখে।

এরপর ছাত্রলীগের প্রায় প্রতিটি সম্মেলনেই কমিটি গঠন প্রশ্নে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগের এ নিয়ে বড় ধরনের বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। শাহ মোয়জ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খানকে এবং পাল্টা শেখ ফজলুল হক মনি ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে সভাপতি বানাতে চাইলে কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এ সম্মেলনে ছাত্রলীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্রে 'সমাজতন্ত্র' শব্দ ঢোকানোকে নিয়েও গোল বাধায় দ্বন্দ্ব কিছুটা আদর্শিক রূপও পেয়েছিল। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগ শেষ পর্যন্ত ভাঙেনি।

১৯৬৬ সলে শেখ মুজিব কর্তৃক ৬-দফা ঘোষণার পর ছাত্রলীগে ৬-দফাপন্থী ও পি.ডি.এম. পন্থী আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও শেষপর্যন্ত ছাত্রলীগে ভাঙন আসেনি।

www.pathagar.com

কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৭ জুনে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে একদিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন প্রশ্নে ছাত্রলীগ দ্বিতীয়বারের মতো বড় ধরনের ভাঙনের সূত্রপাত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের এ সম্মেলন উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তিনি শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে যাননি।

১৯৪৮ সালের ভাঙনের পর আবুদর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলীই ঐক্যবদ্ধ ছাত্রলীগের শেষ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এ দুই ছাত্রনেতাই তোফায়েল আহমদ ও আ.স.ম. আবদুর রবকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত কমিটির সমর্থক ছিলেন। মূল দল ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের পুরো সমর্থনও এরা পেয়ে যান।

আলমুজাহিদী ও আবদুল মান্নান খানকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে পাল্টা যে কমিটি গঠিত হয় তার মূল সমর্থক ছিলেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী।

৭ জুলাই কেন্দ্রীয় নেতা তোফায়েল আহমদ ও আলমুজাহিদী-এ উভয়ের নেতৃত্বের প্রতিই অনাস্থা ব্যক্ত করে জগন্নাথ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগকে বিভক্ত করার অধিকার কারোরই নেই। তিনি কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সশস্ত্র গুণ্ডা দিয়ে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির জন্য তোফায়েল গ্রুপকে দায়ী করেন। আগামী এক মাসের মধ্যে তিনি নতুন করে কাউন্সিল অধিবেশন ডাকারও আহ্বান জানান।

দুই উপদলের এমন এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ৮ জুলাই (১৯৬৯) ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১৫/ক পুরানা পল্টন থেকে ৪২, বলাকা ভবনে স্থানান্তর করা হয়। নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। শেখ মুজিব কর্তৃক ছাত্রলীগ কার্যালয় এমন পরিস্থিতিতে ঘটা করে উদ্বোধনের অর্থ ছিল তোফায়েল আহমদ ও আ. স. ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন কমিটির প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন পুরোপুরি আছে এটা দেখানো। বঙ্গবন্ধু উদ্বোধনকালে তাঁর ভাষণে ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক অবদান ও গুরুত্বের তাৎপর্যকে ইঙ্গিত করে বলেন, যে সময়ে কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল না, এমনকি আওয়ামী লীগও ছিল না, সে-সময় ছাত্রলীগই বাংলাভাষার ওপর হামলাকে প্রতিহত করেছে।

ছাত্রলীগের ভাঙন ও ঐক্য আলোচনায় বিতর্ক ও তাগিদ এরপরও বহুদূর বিস্তৃত হতে থাকে। সারাদেশই এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তদবির, আলোচনা এবং কমিটি ভাঙনের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে। এমতাবস্থায় ছাত্রলীগ পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা-ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিকুইজিশন কাউন্সিল করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা বলে, বিগত সম্মেলনে গঠনতন্ত্র বিরোধিতা করে এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রয়োজনে তারা ঢাকা থেকে রাজশাহী এসে কাউন্সিল করার জন্যও উভয় উপদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের আহ্বান জানান।

ভাঙনের পর ছাত্রলীগের পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ২০ মার্চ শুক্রবার। তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে দুদিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রদেশের ১৭টি জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক

www.pathagar.com

প্রতিনিধি এতে যোগদান করে। ইকবাল হলের মাঠে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন-স্থানের সম্মুখভাগে 'জয়বাংলা' স্লোগান সংবলিত মনোরম তোরণ নির্মাণ করা হয়।

সম্মেলনে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বৃটিশ যুগের ছাত্রনেতা কামরুদ্দিন আহমদ। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কাজে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলা হয়। ছাত্রলীগের কোনো দলিলে সরাসরি 'সমাজতন্ত্র' শব্দ এই প্রথম ব্যবহৃত হল।

নতুন কার্যকরী পরিষদে সভাপতি হিসাবে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ ফারুক আহমেদ প্রমুখ নির্বাচিত হন।

অন্যদিকে বিভক্ত ছাত্রলীগের অপর অংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২১ মার্চ (১৯৭০) লালকুঠি মিলনায়তনে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব মাহবুব মোর্শেদ এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দুদিনব্যাপী বাংলা ছাত্রলীগের এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এ গ্রুপের সভাপতি আলমুজাহিদী।

কিন্তু (১৯৭০) সালে এ গ্রুপ (বাংলা ছাত্রলীগ) আবারও আরেক ধাপ ভাঙনের সম্মুখীন হয়। ৮ জুন এ সংগঠনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একটি রিকুইজিশন সভা আহ্বান করে পাল্টা আরেকটি ছাত্রলীগের কমিটি করার প্রক্রিয়া শুরু করে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগও, যা তোফায়েল গ্রুপ হিসেবে পরিচিত ছিল, তাও আবার একধাপ ভাঙনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দলে দুটি ধারণা প্রবলভাবে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছিল।

১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় স্বপন কুমার চৌধুরী 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাব উত্থাপন করলে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের বিভিন্ন সময়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামের তালিকা

১৯৪৮	নঈমুদ্দিন আহমদ	আহ্বায়ক
১৯৪৯-৫৩	দবিরুল ইসলাম খালেক নেওয়াজ খান	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৩-৫৪	কামরুজ্জামান এম. আবদুল ওয়াদুদ	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৪-৫৫	আবদুল মমিন তালুকদার এম. আবদুল ওয়াদুদ	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৫-৫৬-৫৭	আবদুল মমিন তালুকদার আবদুল আউয়াল	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৭-৬০	রফিকুল্লাহ চৌধুরী	সভাপতি

www.pathagar.com

১৯৫৭-৫৮	কাজী আজহারুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক
১৯৫৮-৫৯-৬০	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
১৯৬০-৬৩	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ ফজলুল হক মনি	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৩-৬৫	কে. এম. ওবায়দুর রহমান সিরাজুল আলম খান	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৫-৬৬-৬৭	মাজহারুল হক বাকী আবদুর রাজ্জাক	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৭-৬৮	ফেরদৌস আহমদ কোরেশী আবদুর রাজ্জাক	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৮-৬৯	আবদুর রউফ খালেদ মোহাম্মদ আলী	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৬৯-৭০	তোফায়েল আহমদ আ. স. ম. আবদুর রব	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৭০-৭২	নূরে আলম সিদ্দিকী শাজাহান সিরাজ	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৭৩	মনিরুল হক চৌধুরী শফিউল আলম প্রধান	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৭৭-১৯৮৭	ওবায়দুল কাদের বাহালুল মাজনুন চুন্নু	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৮১-১৯৮৩	মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন কে. এম জাহাঙ্গীর	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৮৪-১৯৮৫	আব্দুল মান্নান জাহাঙ্গীর কবির নানক	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৯৪-১৯৯৮	এ. কে. এম এনামুল হক শামীম ইহাক আলী খান পান্না	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
১৯৯৮-২০০২	বাহাদুর বেপারী অজয় কর খোকন	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
২০০২-২০০৬	লিয়াকত শিকদার নজরুল ইসলাম বাবু	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
২০০৬-২০১১	মাহমুদ হাসান রিপন মাহফুজুল হায়দার রোটন	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
২০১১-আজ পর্যন্ত	এইচ. এম. বদিউজ্জামান সোহাগ সিদ্দিকী নাজমুল আলম	সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

** শেষাংশ উইকিপিডিয়ায় ছাত্রলীগের পেইজ থেকে সংগৃহীত*

www.pathagar.com

'৭০-এর নির্বাচন ও স্বাধীনতা আন্দোলন

সারাদেশে রেডিও পাকিস্তান মারফত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) এক বেতার ভাষণের কথা আগেই বলা হয়েছে। এতে প্রেসিডেন্ট সর্বপ্রথম পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন। ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি নির্বাচনে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' প্রথার কথা উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আইনগত বুনিয়াদ প্রস্তুত হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। অন্যথায় পরিষদ ভেঙ্গে নতুন নির্বাচন দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। দুর্নীতিবাজ প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সামরিক আইন বহাল থাকবে। এজন্য ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হবে।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া

৩০ নভেম্বর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সমস্যাবলি অনুধাবন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মূল সমস্যা সম্পর্কে জাতির সাথে ঐক্যমত্য প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। তবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কোনো মতামত প্রকাশ না করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

চার মাস পর ২৮ মার্চ (১৯৭০) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে আরেকটি বেতার ভাষণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তার পূর্বের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি এদিনের ভাষণে কতকগুলি আইনগত কাঠামোর কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন : The legal framwork order, 1970 will be published on the 30th of this month. This order will form the main base for the operation of the National Assembly in the task of constitution-making' ৩০ মার্চ সরকারিভাবে আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করা হয়। পয়লা এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির দু'দিন ব্যাপী এ জরুরী বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত আইনগত আদেশ-কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবি জানানো হয়।

মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করে বলেন, শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত কাঠামোর ব্যাপারে নির্বাচিত সদস্যদের কোনো কথা বলারই অধিকার থাকবে না।

www.pathagar.com

আইনগত আদেশ কাঠামো জারির মাধ্যমে গণতন্ত্র দিয়ে আবার গণতন্ত্র নিয়ে যাওয়ার' আইনগত প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ 'এ্যাকশন পরিকল্পনা' গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৭ এপ্রিল এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১৩ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়।

৪ এপ্রিল বাংলা ছাত্রলীগের জরুরী সভায়ও শাসনতান্ত্রিক আইনগত কাঠামো আদেশের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করা হয়। ১০ এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রার প্রাক্কালে বলেন, আইনগত কাঠামো শতকরা ৯৯ ভাগ জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়েছে, শুধু নয়া শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কীভাবে অনুমোদিত হবে সে-সম্পর্কেই কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে।

২৪ জুন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে জবাব চেয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। কিন্তু এরই মধ্যে আইনগত কাঠামোতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে তিনি (মুজিব) এখন কী বলবেন ?

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সভাপতি খান সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে এ দলের কার্যনির্বাহী কমিটির দুদিনব্যাপী এক সভা শেষে আইনগত কাঠামো প্রত্যাহার না করলে নির্বাচনে অংশগ্রহণে তাঁরা অপারগ বলে ঘোষণা করেন।

দোসরা জুলাই, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম প্রার্থী মনোনয়নের কথা ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা পয়লা জুলাই পর্যন্ত মাওলানা মওদুদীর সভাপতিত্বে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় একশত প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করে।

৬ জুলাই আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৯ দিনব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে ঢাকা ফিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, আওয়ামী লীগ এককভাবেই নির্বাচন করবে, কারণ দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটি কোনোপ্রকার নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করার বিরোধিতা করেছে।

১৪ জুলাই অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, আতাউর রহমান খান সহ প্রদেশের ৪৬ জন রাজনৈতিক, ছাত্র, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক নেতা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯ জুলাই প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়।

দোসরা আগস্ট ভাসানী ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত নির্বাচনে অংশ নেওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বন্যার জন্য নির্বাচন তাঁরা ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।

www.pathagar.com

এর আগে পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি নূর মোহাম্মদ খান ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক নান্নু এক বিবৃতিতে ভাসানী ন্যাপের এই প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।

৭ আগস্ট কাইউমপন্থী মুসলিম লীগের প্রধান খান আবদুল কাইউম খান পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, ৫ অক্টোবর নির্বাচন হতে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনেকেই বন্যার জন্য ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে না।

ন্যাপ (রিকুইজিশনপন্থী) প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, বন্যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে গেলে তাঁর দল আপত্তি করবে না। তবে তাঁর দল ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্বের বিরোধী তিনি আরো বলেন, নির্বাচনে গণতান্ত্রিক দলগুলোর ঐক্যজোট হলে তিনি অভিনন্দন জানাবেন।

৯ আগস্ট আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে বক্তৃতাকালে বিভিন্ন মহল কর্তৃক নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবির বিরোধিতা করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বছরই বন্যা হয়। ২৩ বছরে এ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং বন্যার অজুহাতে নির্বাচন পেছানো চলবে না। তিনি বলেন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।

যারা নির্বাচন পেছানো চায় তারা ষড়যন্ত্রকারী। আওয়ামী লীগ প্রধানের এমন ঢালাও উক্তির প্রতিবাদ করে ১১ আগস্ট পৃথক পৃথক বিবৃতি দেন ন্যাপ (ওয়ালী) পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, পিডিপি নেতা মাহমুদ আলী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম।

সৈয়দ আলতাফ বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা দ্রুত নির্বাচনের জন্য এতটা বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যে, তিনি সকল প্রকার যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, এবারকার বন্যা পূর্বেকার সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

মাহমুদ আলী বলেন, বিপুল জনপ্রিয়তার দাবিদার শেখ মুজিব নিশ্চয়ই চাইবেন নির্বাচনে বিপুল জনগণ অংশ নিক।

ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতার গুজব

এ সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতার গুজবের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩০ মার্চ ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সক্রিয় আন্দোলন গড়ে না ওঠায় এটা বিশ্বাসযোগ্যতাও পেয়েছিল। সরকারও ৬ দফাভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করে স্বীয় ঘোষিত আইনগত কাঠামো আদেশের পরিপন্থী কাজ করতে দ্বিধা করেনি। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে সরকার স্পষ্টতঃ দ্বিমুখী নীতিই অনুসরণ করেছিল। হয়ত এভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নিজের ছককাটা পথে শেখ সাহেবের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি ও ভোগ করার চিন্তা করেছিলেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও সামরিক সরকারের আইনগত কাঠামো আদেশ ছিল পরস্পর পরিপন্থী।

www.pathagar.com

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

পরিস্থিতি বুঝেই সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন পেছানোর সিদ্ধান্ত নেন ১৬ আগস্ট। জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন ৫ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল তা তিনি ৭ ডিসেম্বরে (১৯৭০) অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। বলা হয়, তা অবশ্যই ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। পরে এর তারিখ ১৭ ডিসেম্বর হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

আগস্ট মাসে বন্যা দেখা দেওয়ায় নির্বাচন তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ণকারী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হাতিয়া, সন্দ্বিপ, ভোলাসহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি এবং অসংখ্য গবাদি পশু, ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। চীন সফর শেষে রাওয়ালপিণ্ডি ফেরার পথে ঢাকায় আসলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বার্তা বিধ্বস্ত এলাকায় যাননি। এই ঘটনা বাঙালীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগ সেটা নির্বাচনী প্রচারনায় কাজে লাগায়। অন্যসব দল অবশ্য নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি তুলে। ২৩ নভেম্বর ঢাকা পল্টন ময়দানে আহুত জনসভায় মওলানা ভাসানী সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে "স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের" আওয়াজ তোলেন।

বঙ্গবন্ধুর মুখে নতুন কথা

১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ঘোষণায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দ যুক্ত করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। এ সময়ের বিভিন্ন বক্তৃতা, বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে তিনি যে-বক্তব্য রাখেন তাও তাঁর রাজনৈতিক গতিধারায় সম্পূর্ণ নতুন।

১৮ জুলাই (১৯৬৯) বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমস্যার ভদ্রোচিত সমাধান। তিনি বলেন, ভদ্রলোকের চুক্তিতে কখনো বিচ্ছিন্নতার সুর ধ্বনিত হতে পারে না।

শেখ মুজিব বলেন, দরিদ্র জনগণের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার সংগ্রাম। আমি একজন সমাজতন্ত্রী।

'বিচ্ছিন্নতা' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপরিউক্ত কঠোর উক্তির কারণ ছিল এই যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে সবসময়েই যে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করা হত এটা ছিল তারই উত্তর।

এরপর ২৪ আগস্ট (১৯৬৯) ঢাকা জেলা বার সমিতিতে এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তানে ইসলাম টিকে থাকবেই। কিন্তু ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসন মানে আলাদা হওয়া নয়। শক্তিশালী কেন্দ্রের তুলনায় শক্তিশালী পাকিস্তান আরো বেশি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ঐক্যের বিরোধিতা

৭ জুন রোববার ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায়ও বঙ্গবন্ধু জামায়াতে ইসলামীর কর্মের সমালোচনা করেন। এদিন তিনি ন্যাপ (ওয়ালী-মোজাফফর)-এর বিরুদ্ধেও কঠোর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, একটি দল 'ঐক্য ঐক্য' করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তাদের আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানান।

এখানে উল্লেখ্য, নির্বাচনের পূর্বে ওয়ালী-মোজাফফর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ, আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ তা প্রত্যাখ্যান করে।

১৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২ টি আসনের জন্য মোট ৮ শত ৭০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান একযোগে বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে তাঁর নির্বাচনী ভাষণ দেন। বস্তুত শেখ মুজিবের ভাষণ দিয়েই পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশন নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতাদের সিরিজ-বক্তৃতা শুরু করে।

৩০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করে বলেন : We are commited to the immediate withdrawl from SEATO. CENTO and all other military pacts.

দোসরা নভেম্বর ঢাকার শহর এলাকা থেকে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রার্থী ও শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খয়েরউদ্দিন বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচন হবে পাকিস্তান টিকে থাকবে কি থাকবে না-এই ইস্যুর ওপর গণভোট।

এর মধ্যে ভাসানী ন্যাপের যারা নির্বাচন-বিরোধী ছিলেন, তারা দেশের সর্বত্র নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানিয়ে মিছিল-সভা করে বেড়াতে থাকেন।

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে ১২ নভেম্বর ঘটে যায় এক মহাপ্রলয়। প্রায় দশলক্ষ মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে এতে। এ প্রলয়ঙ্করী মহাদুর্যোগে নির্বাচন হবে কি হবে না এ বিতর্ক আবার শুরু হয়ে যায়।

ওয়ালী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক বিবৃতিতে, পূর্ব পাকিস্তানের এই মহাবিপর্যয়ে নির্বাচন কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

কয়েকদিন পর জলোচ্ছ্বাস কবলিত কয়েকটি এলাকায় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনী হাওয়ার পরিবর্তে এক শোকবিহ্বল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সারা প্রদেশ থেকে দলে দলে ছাত্র-যুবক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীরা আর্তমানবতার সেবায় দুর্গত এলাকায় যাত্রা করে।

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত : ফলাফল অভূতপূর্ব

শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেছিল বটে, কিন্তু সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছিল ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের ভোটাধিকার ছিল না, সে-সময় ভোট দিয়েছিল ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বি.ডি. মেম্বাররা। সুতরাং পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন) এক অভূতপূর্ব ও জটিল ফলাফল নিয়ে আসে।

পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬২ আসনের মধ্যেঃ
পাকিস্তান আওয়ামী লীগঃ ১৬০ টি
পি ডি পি : ১ টি
স্বতন্ত্র : ১ টি

পরে স্বতন্ত্র আসনটিও আওয়ামী লীগে যুক্ত হয়। স্বতন্ত্র সদস্য রাজা ত্রিদিব রায় পরে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ঘরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি আসনও না-থাকায় দলটি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আঞ্চলিক মর্যাদার বাইরে ফিরে আসতে সক্ষম হয়নি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখণ্ড পড়ে রইল তাতে আওয়ামী লীগের হয়ে কথা বলার কেউ থাকল না।

বস্তুত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল অভাবিত। পূর্ব পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের নির্বাচন-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যে রিপোর্ট ছিল, তার সাথে নির্বাচনের ফল শুধু অমিলই হল তা নয়, ফলাফল বিপরীতও হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয়, গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা

এমন একটি নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন দিতে সাহস করেছিল। তদের ধারণা ছিল পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী দলগুলো পি.ডি.পি, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, আসগর খানের গ্রুপ প্রমুখ নির্বাচনে আশাতীত ফল ভাল করবে। এমনকি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানও সত্যিকার অর্থে ফলাফল এতটা বেশি তার অনুকূলে যাবে ধারণা করতে পারেননি। তিনি পূর্বপাকিস্তানে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু নিরঙ্কুশ নয়, একেবারে মাত্র দু-একটি আসন বাদে পুরো গরিষ্ঠতা, এতটা হয়তো কল্পনায়ও আনেননি। শেখ মুজিব ৯০% আসন লাভের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করছিলেন। কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন ৯৯% ভাগ আসন।

নির্বাচনে এ অভাবিত এবং অসাধারণ ফলাফল পাকিস্তানের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সূচিত করেছিল। কিন্তু এ পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানের গণতন্ত্র চর্চা ও এর বিকাশের প্রশ্নে কে কতটুকু আন্তরিক নিষ্ঠাবান তা নিয়েই নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে।

১০ ডিসেম্বর (১৯৭০) ডাকসু ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের এই বিরাট সাফল্যকে অভিনন্দিত করে। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে ৬-দফা ও ১১-দফার সামান্যতম রদবদল সহ্য করবে না।

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে জটিলতা

১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে একই দিন দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে ৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

অন্যদিকে, এদিনই পশ্চিম পাকিস্তানের ৪ টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র ২ টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি করে সকলকে বিস্মিত করে দেন।

রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত দেশ

পাকিস্তান নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সর্বশেষ ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রথম বক্তব্য রাখেন ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান। তিনি পিণ্ডিতে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে দুটো রাজনৈতিক দল দুই অংশে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি। দুটোই মূলত আঞ্চলিক দল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের একটি আসন নেই, পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির অস্তিত্বই নেই। ওয়ালী খান বলেন, এক অর্থে এর গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দেশ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

পরিস্থিতির পরিবর্তন

৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়ে পুলিশের রায়টকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ছাত্রদের পর নির্যাতন চালাত। এ ছবি অনেক সময় বিরোধীদলের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি। দুবছর পর ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারি দৈনিক পাকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে রায়টকারের আলোকচিত্র প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, গণঅভ্যুত্থানের ওপর এদিন সরকারি দৈনিকটি সচিত্র ফিচারও প্রকাশ করে। অথচ ৬৯-এর আন্দোলনের সময়ে, এমনকি গণঅভ্যুত্থান দিবসের পরদিনও এ সরকারি দৈনিকটি পড়ে বোঝা যায়নি পূর্ব পাকিস্তানে একটা কিছু ঘটে গেছে।

জনতার সামনে প্রকাশ্য শপথ

তেসরা জানুয়ারি (১৯৭১) রোববার আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রকাশ্যে জনতার সামনে শপথ গ্রহণ করে। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। জনগণের সামনে প্রকাশ্যে এভাবে জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান দেখার জন্য এদিন রেসকোর্স ময়দানে জনতার ঢল নেমেছিল।

বঙ্গবন্ধু ৬-দফা ও ১১-দফার প্রতীকী ১৭ টি কবুতর আকাশে করতালির মধ্য দিয়ে উড়িয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু নিজের কণ্ঠে মোট ৬টি স্লোগান দেন। ১. নারায়ে তাকবীর:

www.pathagar.com

আল্লাহু আকবার, ২. পাকিস্তানঃ জিন্দাবাদ, ৩. আমার দেশ, তোমার দেশঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, ৪. জাগো জাগোঃ বাঙালি জাগো, ৫. জয় বাংলা, ৬. জয় পাকিস্তান।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে, 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ' স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থপতি একটি স্বাধীন ও নতুন দেশের স্বপ্নকেও জাতির সামনে তুলে ধরেন।

ঢাকায় ইয়াহিয়া

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১ জানুয়ারি প্রথম ঢাকা আগমন করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরে। তিনি বলেন, তার যে দায়িত্ব ছিল তা শেষ হয়েছে। জাতি কীভাবে পরিচালিত হবে সেই পথে আমি গতি সঞ্চার করে দিয়েছি। ভাসানীর সাম্প্রতিক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি একজন মুসলমান ও পাকিস্তানি।

ঢাকা এসেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের সাথে ১০০ মিনিট একান্ত আলোচনা করেন।

'শেখ মুজিব ভাবী প্রধানমন্ত্রী'

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দু-দফা আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া খান ১৪ জানুয়ারি ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তিনি বলেন, আমি বড় ক্লান্ত। আমি ভুট্টোর এলাকা সিন্ধুতে পাখি শিকারে যাচ্ছি। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন' বলে মন্তব্য করেন।

ক্লান্ত বলে ঘোষিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পাখি শিকারের নামে লারকানায় মূলত ভুট্টোর সাথে দেখা করতে যান। তারা সেখানে একান্তে ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠক করেন।

প্রেসিডেন্টের অস্বীকার

প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবের নাম ইতিপূর্বে ঢাকায় বলার কথা সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিবের নাম তিনি বলেননি। বরং পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন। এখন শেখ সাহেব যদি প্রধানমন্ত্রী হতে না চান তার পক্ষে জোর করারও কিছু নেই। এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট নতুন করে বলেন, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন তা তিনি বলতে পারেন না।

ভুট্টো ঢাকায়

২৭ জানুয়ারি ভুট্টো, বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য ঢাকা আসেন। এদিন ভুট্টোকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান ও পিপলস পার্টির পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থকরা সমবেত হয়।

এদিন ভুট্টো, বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব বাসভবনে আসেন এবং বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু নিজে নিচে নেমে এসে ভুট্টোকে গাড়িতে তুলে দেন।

২৮ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর দুই নেতা বেরিয়ে আসলে তাদের উৎফুল্ল দেখালেও আলোচনা সম্পর্কে উভয়েই কঠোর গোপনীয়তা পালন করেন। তবে দু-নেতা বিভিন্ন কৌতুক টিপ্পনীতে অংশ নেন। ভুট্টো মুজিবকে বলেন, আপনাকে কমবয়েসী মনে হচ্ছে। মুজিব ভুট্টোকে প্রত্যুত্তরে বলেন, আপনাকে দেখাচ্ছে সুন্দর।

এ সময় ভুট্টো হঠাৎ করে সবাইকে অবাক করে মুজিবকে বলে বসেন, 'তাহলে আপনাকে আমার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে।'

মুজিব খানিকক্ষণ হকচকিয়ে যান। পরে বলেন, 'আমি নতি স্বীকার করব না'। এরপর আবার মুজিব অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কুৎসিত থেকে আপনি কিইবা আশা করেন। যা কিছু দেওয়ার সুন্দররাই দেয়'।

২৯ জানুয়ারি মুজিব-ভুট্টো নৌবিহার করেন এবং আরো একদফা বৈঠকে মিলিত হন। ভুট্টো বলেন, তিনি এবং মুজিব দুজনই বৃহৎ শিল্প ও ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণের পক্ষে বলে দেশের শিল্পপতিরা ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। এই শোষকরা এখন ঘন ঘন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত করছে।

তিনি বলেন আইয়ুব আমলে তিনি ৬-দফার বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষার বিরুদ্ধে ভাষার অস্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলন। কিন্তু আইয়ুব খান তার কথা শোনেননি।

মুজিব-ভুট্টো আলোচনায় তাদের সহকারীরাও অংশ নেন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে তাজউদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত দক্ষ কূটনীতির পরিচয় দেন যা ভুট্টোকেও বিস্মিত করে। ভুট্টো পরে বিভিন্ন রাজনীতিকদের কাছে তাজউদ্দীন আহমেদ সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করেন।

কিন্তু মুজিব-ভুট্টো আলোচনা এ পর্যায়ে কতদূর এগিয়েছিল তার জন্য পাকিস্তানবাসীকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) পর্যন্ত।

পানি ঘোলা করে ঢাকায় অধিবেশন আহ্বান

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট আগামী ৩ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন। এর ফলে এতদিনকার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান হল।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল

১৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) সোমবার থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনসটিটিউটে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠক শুরু হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নীতিনির্ধারণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

www.pathagar.com

তিনি দুঃখ করে বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়, কিন্তু পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি গত ২৩ বছর দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার জের এখনো চলছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, কামানের গুলির মুখেও ৬-দফার ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোনো শাসনতন্ত্র তিনি গ্রহণ করবেন না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, এখনো পর্যন্ত তিনি তার প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছেন। তার আমলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ক্ষমতাও হস্তান্তর করবেন বলে বঙ্গবন্ধু আশা প্রকাশ করেন।

সংকটের শুরু

মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানের রাজনীতির সর্বশেষ সংকট শুরু হয়। এ সংকটের সূত্রপাত করেন স্বয়ং জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৫ ফেব্রুয়রি তিনি পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় যাব না।

১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে ভুট্টোর এক চাঞ্চল্যকর মন্তব্য ছাপা হয়। এদিন ভুট্টোর সেই পুরনো 'ভারত জুজু'র ভয় দেখানোর সংবাদসহ ঢাকা অধিবেশনকে 'কসাইখানা' বলার খবর ছাপা হয়।

দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জরুরি টেলিফোনে ভুট্টোকে করাচী থেকে ইসলামাবাদ ডেকে পাঠান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ৫ ঘন্টাব্যাপী বৈঠকের পরও ভুট্টো তার পূর্বসিদ্ধান্ত পাল্টাতে রাজি হননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ইয়াহিয়া-ভুট্টো মূলত এ সময় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এ গোপন বৈঠকে পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা ও শোষকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, মুদ্রা, করব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিধিগুলো সম্পর্কে মুজিবকে কিছু বাস্তবসম্মত আপস করতে হবে।

ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা

নির্বাচনের পর থেকে ঘন ঘন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসতে থাকেন। সফরের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত একটি বাসভবন। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকেন।

জানুয়ারির মাঝামাঝি জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফরের পর এই পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা সফর করেন বেলুচিস্তানের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা নবাব আকবর খান বুগতি। তার সাথে একই বিমানে ঢাকায় আসেন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ খান রাইসানী এবং ওয়ালী ন্যাপের সাইফুর রহমান। বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, তাজউদ্দীন আহমদ এবং তোফায়েল আহমদ প্রমুখ তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।.

www.pathagar.com

২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুরের প্রতি কোনোরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল থাকার আহ্বান জানানো হয়।

ছাত্রলীগ কর্মীরা এদিন যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করে।

মুজিববাদের ঘোষণা

ছাত্রলীগের এ দিনের সভাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শকে সর্বপ্রথম মুজিববাদ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। আর ঘোষণাটি দেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন। জনাব মাখন তার বক্তৃতায় ভুট্টোর সমালোচনা করে বলেন, তিনি যদি এখানে না আসতে চান, তাহলে তার আর আসার দরকার নেই। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশে কোনো 'ইজম' প্রতিষ্ঠা হতে দেব না। এখানে আমরা মুজিববাদের প্রতিষ্ঠা করব।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন

২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বহুদিন পর মুখ খুলেন। তিনি ৬-দফা সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মূলাও বের করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের প্রতি তিনি ৬-দফা চাপিয়ে দেবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশ স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ সুযোগলাভে অনিচ্ছুক হলে আওয়ামী লীগ জোর করবে না। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে ৬-দফা পুরোপুরি কার্যকর হতে হবে।

পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন কিনা জিজ্ঞেস করলে বঙ্গবন্ধু ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি তত মারাত্মক নয়। যখনি বাঙালিদের স্বার্থ-আদায় সম্পর্কে কথা উঠেছে, তখনি 'পাকিস্তান বিপন্ন' হওয়ার ধুয়া তোলা হয়েছে। গত ২৩ বছরই এটা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বস্তুত বাঙালিরা অনেকের চেয়ে ভালো পাকিস্তানি। বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি এ ধরনের ধুয়া তোলা আর শুনতে রজি নই।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ঢাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে অফিস-আদালতে পর্যন্ত সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বসাধারণের মধ্যে চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রসংগঠনগুলির ও রাজনৈতিক দলের অফিসে, সংবাদপত্র কার্যালয়ে, রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অনুসন্ধানী মানুষের ঢল নামে। সকলেই ক্রমাগত রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে খবরটির সত্যতা যাচাই করে দেখেছিলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তানের 'সর্বশেষ খবর' কলামে এ সংবাদ ছাপা হয় যে, ৩ মার্চেই অধিবেশন বসছে, স্থগিত হচ্ছে না। এদিন পত্রিকাটি আরো খবর দেয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল দলই অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে

www.pathagar.com

যাচ্ছে, এমনকি ভুট্টোর পিপলস পার্টিও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। খসড়া পত্রটি পাঠ করে শোনান ড. কামাল হোসেন।

চরম অনিশ্চয়তা

ফেব্রুয়ারির শেষ দিনটিতে ঢাকা নগরীসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটায়। একটা গুরুতর কিছু হচ্ছে-এই আশঙ্কায় রাজনৈতিক মহল চরম অস্থিরতায় থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এস.এম. আহসান বঙ্গবন্ধুর সাথে এদিন আরো একটি অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। পিণ্ডি থেকে ফেরার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে এটি তার তৃতীয় বৈঠক।

এদিন জামায়াতে ইসলামী প্রধান মাওলানা মওদুদী সংকট নিরসনে বঙ্গবন্ধুর কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠান। বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তাটির জবাব পাঠান। বঙ্গবন্ধু এতে বলেন, এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রত্যেক নেতাকে কথা বার্তায় সতর্ক এবং জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ড এদিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এসে তাঁর সাথে দেখা করেন। তাঁরা একান্তে কিছুক্ষণ কাটান। পরে শোনা গিয়েছিল, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সমর্থন করবে না, এ-কথাটি জানাতেই ফারল্যান্ড ঢাকা এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এরকম একটি ঘটনা ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আশা করেছিলেন এমন গুজব বাজারে ছিল।

গুজব সত্যি হল

পয়লা মার্চ সোমবার দুপুর ১.০৫ মিনিটে, রেডিও পাকিস্তানের সকল কেন্দ্র একযোগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার একটি বিবৃতি প্রচার করে। এতে প্রেসিডেন্ট বলেন, এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

প্রথম রণভূমি ঢাকা ষ্টেডিয়াম

রেডিওতে যখন জাতীয় অধিবেশনের স্থগিত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তখন ঢাকা ষ্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও বিশ্ব একাদশের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একাদশ তখন ৮ উইকেটে ৩০৬ রান সংগ্রহ করে। রেডিওতে খবর শোনার সাথে সাথে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ষ্টেডিয়ামের হাজার হাজার ক্রিকেট দর্শক। তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে– 'জয় বাংলা' বলে। একদল জাল টপকে ষ্টেডিয়ামে

www.pathagar.com

প্রবেশ করে ব্যাট, বল, ষ্ট্যাম্প, প্যাড ও ম্যাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধাওয়া করে পশ্চিম পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের। স্লোগান মুখরিত জঙ্গীমিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে পড়ে।

ষ্টেডিয়ামের দর্শকদের এ জঙ্গীমিছিল শহরে প্রদক্ষিণ করাকালীনই ঢাকার কর্মব্যস্ত রাজপথের মানুষজন প্রথম শুনতে পায় অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে মানুষ মিছিলে নেমে পড়ে। অফিস-আদালত আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মজীবী কলকারখানার শ্রমিক-শ্রমজীবী, কর্মচারী, ছাত্র, আদালতের আইনজীবীগণ যে,-যেখানে ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। রাজধানীর টাউন সার্ভিসের বাসগুলোও হঠাৎ করে থেমে যায়। লাঠি হাতে বজ্রকণ্ঠে মানুষ গগনবিদারী স্লোগান তুলে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যার পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিষয়টি দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি চেয়েছিলেন ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হোক, সংখ্যালঘু ভুট্টো চেয়েছিলেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে। ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথাই রাখলেন। আবারও ভুট্টো অধিবেশন বর্জনের হুমকি দিল। প্রেসিডেন্ট তার কথা মতোই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। তিনি বলেন, শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগুরু দলের ওপর সংখ্যালঘু দলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের পরিপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাকিস্তানি রাজনীতিতে ভুট্টোর 'না' করার ইতিহাস বর্ণনা করে বাংলার নেতা বলেন, যখন গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়েছিল, জনাব ভুট্টো তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি নির্বাচন পিছানোর দাবি তোলেন এবং এখন পরিষদ অধিবেশন স্থগিত না করলে ঢাকা না আসার বায়না ধরেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এ বেইনসাফির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে। তার পরিণতি যা-ই হোক না কেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র যদি আরো চলে, তাহলে বাংলাদেশ নিজ প্রশ্নের মিমাংসা করে নেবে।

মিছিলের নগরী ঢাকা

এরই মধ্যে শহরের বিভিন্ন অলিগলি পথ থেকে শত শত মিছিল পল্টন ময়দানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে জমায়েত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশ, জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এখানে এ সময় ছাত্রলীগ পরিচালিত একসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন সাবেক ছাত্রনেতা ও নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমদ। তিনি বলেন, আর ৬-দফা, ১১-দফা নয়, এবার বাংলার মানুষের ১-দফার সংগ্রাম শুরু হবে। আর এ ১-দফা হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব।

সমাবেশে উপস্থিত প্রতিটি মানুষের হাতেই ছিল বাঁশের লাঠি ও লোহার রড। জনতা এসব সর্বক্ষণ ঊর্ধ্বে উঁচিয়ে রাখে। এখানে আরো বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ নেতা

www.pathagar.com

নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, ডাকসু নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান ও সিরাজুল আলম খান।

দোসরা মার্চে কারফিউ ভঙ্গ এবং হরতাল

দোসরা মার্চ ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় শ্রমিকলীগ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কৃষক সমিতিসহ প্রভৃতি সংগঠনের যুগপৎ ডাকে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। প্রচার ছাড়াই এ হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয়।

এ দিন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে শহরে ১০ ঘন্টা ব্যাপী কারফিউ জারির ঘোষণা আসে। এই ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন স্তিমিত হয়ে আসলেও রাত ৮টার অব্যবহিত পরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গগণবিদারী স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। রাত প্রায় ১১ টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভকারীরা কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং স্লোগান দেয়।

৮ নেতার বৈঠক

পয়লা মার্চ রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হলে) ছাত্রলীগের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দের একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সভাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এবং বর্তমান নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। এটি ছিল ৮ নেতার ঐতিহাসিক বৈঠক।

এই সভায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতের কাঠামো ও রূপের বিশদ আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আগামীকাল দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগের সভায় 'স্বাধীনতার প্রস্তাব' পাঠ করা হবে। এটি পড়ে শোনানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় দপ্তর সম্পাদক এম. এ. রশীদকে।

পরদিন দোসরা মার্চ বটতলায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে লাখো ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সাবেক ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাজাহান সিরাজ, শেখ শহিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বেলা ১২-৪৫ মিনিটে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাঠ করেন পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রনেতা এ. এ. রশীদ।

রাজনীতির খেলা

৩ মার্চ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পাকিস্তানের নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের একটি বৈঠক ডাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই রাজনৈতিক সভাকে বন্দুকের নলের মাথায় 'নিষ্ঠুর তামাশা' বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

এদিন (৩ মার্চ) পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি এদিন ভুট্টোর উদ্দেশে বলেন, গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান, তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন, বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করব।

ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার প্রস্তাব

ছাত্রলীগ আয়োজিত সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় :

১. পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।
২. স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আহত বাঙালি ভাইদের বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালি ভাইদের ব্লাডব্যাংকে রক্ত প্রদান।
৩. পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিকরাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ।
৪. স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা।
৫. সভা দলমতনির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

হরতালে সহিংসতা

পল্টনের জনসভায় ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৬ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয়। ৫ মার্চ বায়তুল মোকাররম থেকে লাঠি মিছিল বের করারও কর্মসূচি ঘোষিত হয়। তেসরা মার্চে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল শেষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটে সহিংস ঘটনা ঘটে। ২০০ শতের বেশি আহত লোককে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের ৯৯ ভাগ লোকের দেহেই বুলেটের আঘাত ছিল। ঢাকায় নিহতের সংখ্যা ৪৭ বলে দাবি করা হয়। সর্বমোট আহতের সংখ্যা ৩০০ শতেরও বেশি বলে সংবাদপত্রগুলি রিপোর্ট করে।

সারাদেশেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নির্বিচারে মানুষের উপর গুলি চালায়। কারফিউ ভঙ্গ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এদের উপর গুলি চালানো হয়। দুষ্কৃতকারীদের লুটপাট, হাঙ্গামা প্রতিরোধ করতে গিয়েও ছুরিকাঘাত ও প্রাইভেট বন্দুকের গুলিতে আহত হয় অনেকে। স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে অনেক দুষ্কৃতকারীও নিহত কিংবা আহত হয়।

৪ মার্চ ঢাকাসহ প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় পূর্ব দিনগুলোর তুলনায় শান্ত অবস্থা গেলেও চট্টগ্রামে দু-দিনে পরিস্থিতি আরো সংকটের দিকে চলে যায়। দু-দিনে চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১ জনে। খুলনায়ও এদিন গোলযোগ বিস্তার লাভ করে। এখানে ৩৩ জন হতাহত হয়।

www.pathagar.com

ঢাকায় এদিন আকস্মিকভাবে কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। আনন্দে মানুষ নির্ভীক চিত্তে রাস্তায় মিছিল নিয়ে নেমে পড়ে।

৭ই মার্চের ভাষণ

৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল মাইল-ফলক। বঙ্গবন্ধু এদিন তার সর্বশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এ-কথা তিনি পয়লা মার্চ পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভার জন্য সমগ্র বাংলাবাসী যেমন, তেমনি পাকিস্তানের সকল রাজনীতি সচেতন মানুষ উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করছিলেন।

যদিও ৩ মার্চই পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ-শ্রমিকলীগ আয়োজিত সভাতেই বঙ্গবন্ধু তার চূড়ান্ত কথা– বাংলার স্বাধীনতার কথা বলে এসেছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধু সেদিন তার শেষ ভাষণও দেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, ভাষণের পরপরই তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এজন্য তিনি শেষ নির্দেশাবলী 'আমি যদি নাও থাকি' বলে এসেছিলেন।

সকাল থেকেই রেসকোর্স ময়দান লোকেলোকারণ্য হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ দূরদূরান্ত থেকে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ শোনার জন্য আগমন করে। এদিন বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়চিত্ত। তিনি মঞ্চে উঠেই সরাসরি মাইক্রোফোনের কাছে যান এবং বলেন, 'আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।' এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালি বঞ্চনা ও নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

২৫ তারিখ পরিষদ অধিবেশন বসা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শর্তারোপ করে বলেন :

১. সামরিক আইন মার্শাল-ল Withdraw করতে হবে
২. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে
৩. যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে
৪. আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রেডিও টেলিভিশন যদি আমাদের খবর না দেয়, তাহলে কোনো বাঙালি সেখানে যাবেন না। তিনি ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর বঙ্গবন্ধু সর্বশেষ দুটি বাক্য উচ্চারণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে বাঙালির সংগ্রামের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। বঙ্গবন্ধু বলেন 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নতুন গভর্নর টিক্কা খান

৭ মার্চ আরো একটি ঘটনা ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নতুন গভর্নর করে পাঠান লে. জেনারেল টিক্কা খানকে। টিক্কা খান ৭ মার্চ বিকেলে ঢাকা আসেন। খ

www.pathagar.com

অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পদস্থ সামরিক অফিসারগণ বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান।

ঘোলাটে পরিস্থিতি

ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক অফিসারও এ সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে গোপনে দেখা করেন। কিন্তু সে মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা সম্পর্কে কাউকেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেননি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেখানে যেভাবে যা যা গড়ে উঠেছিল তিনি তা শুধু নিরীক্ষণ করছিলেন এবং কাউকে বাধা দেননি বা দ্বিমতও করেননি।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ঢাকায় প্রকাশ্যে ট্রেনিং নেওয়া শুরু করে। এরপর ছাত্রলীগও পাড়ায় পাড়ায় একই ধাচের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নেয়। ২১ মার্চ পল্টন ময়দানে প্রাক্তন সৈনিকরা প্যারেড করে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্রতচারী আন্দোলন তাদের অনুশীলন বাংলা একাডেমিতে শুরু করে। অন্যদিকে আবার খুব জোরেশোরে আলাপ-আলোচনাও চলছিল।

বঙ্গবন্ধু তো ইয়াহিয়ার সাথে আলাপ চালাচ্ছিলেনই, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি সকল নেতারা এসে একজোট হয়ে ভুট্টোর বিরুদ্ধে নেমে পড়েন এবং বঙ্গবন্ধুকে বোঝাতে থাকেন।

বাস্তব অবস্থাটি ছিল একেবারেই ঘোলাটে। ফলে বঙ্গবন্ধু কাউকে সুনির্দিষ্ট তারিখ-সময় দিয়ে কোনো নির্দেশ দেননি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধের 'মাটির তলার' কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

গণহত্যার স্বীকারোক্তি

৯ মার্চ সংবাদপত্রে সামরিক কর্তৃপক্ষের একটি প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, 'হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং বাজে 'প্রোপাগান্ডা' ছড়িয়ে পড়েছে বলে প্রকৃত অবস্থা জানাতে হচ্ছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্পর্কিত প্রেসিডেন্টের পয়লা মার্চ তারিখের ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণ রাস্তায় বের হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে দোসরা মার্চ সকাল থেকে পূর্ণ হরতাল পালন শুরু হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্ষোভরত জনতা লুট, অগ্নিসংযোগ, ছুরিকাঘাত ইত্যাদির ন্যায় অন্যায় কার্যক্রমে লিপ্ত হয়।...

সেইরাতেই সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সান্ধ্য-আইন রাত ৯ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত বলবৎ হয়। সৈন্যরা পুলিশ ও ই.পি.আর. বাহিনীর সহযোগিতায় সান্ধ্য-আইন জারির জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে রাত ৯ টার পূর্বে বের হয়ে আসেনি।

সারা প্রদেশে সহিংসতায় ১৭২ জন প্রাণ হারায় এবং ৩৫৮ জন আহত হয়।...

ভাসানীর ঘোষণা

৯ মার্চ মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ ভান ভাসানী পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা সমন্বয় কমিটি আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণদানকালে অবিলম্বে পূর্ববাংলার

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন। তিনি ঘোষণা করেন, মুজিবের নির্দেশমতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোনো কিছু না হইলে আমি শেখ মুজিবের সাথে মিলে ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করব।

বিচারপতির সাহস

পূর্ব পাকিস্তানে নবনিযুক্ত গভর্নর টিক্কা খান শেষপর্যন্ত শপথ নিতে পারেননি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী শেখ মুজিবের নির্দেশ ব্যতীত টিক্কা খানকে শপথ করাতে অস্বীকার করেন। ফলে গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের অভিষেক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি সরকারিভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারলেন না।

অসহযোগ আন্দোলনের চতুর্থ দিবসে ১১ মার্চ প্রদেশের সর্বত্র স্বাধিকারের দাবিতে বাঙালি সমাজ অবিচল থাকে। হাইকোর্টের বিচারপতিসহ সরকরি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল শ্রেণীর নাগরিক অফিস বর্জন অব্যাহত রাখে। শহীদদের স্মরণে ঢাকার সকল সরকারি অফিসে কালো পতাকা ওড়ে।

আলোচনার পর আলোচনা

বাংলার মুক্তিকামী জনতার সর্বাত্মক অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের পঞ্চদশ দিবসে ১৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আড়াইঘন্টাব্যাপী আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু যে-গাড়িতে করে যান তার অগ্রভাগে শোকের প্রতীক কালো পতাকা উড়ছিল।

পরদিন বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করার জন্য প্রেসিডেন্ট ভবনে যান। প্রেসিডেন্ট ন্যাপ-নেতা ওয়ালী খানের সাথেও এক বৈঠকে মিলিত হন।

বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহ

ঢাকায় যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবের সাথে আলাপ চালাচ্ছেন তখন স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রথম মাইলফলকের উন্মোচন করে জয়দেবপুরের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও স্থানীয় জনসাধারণ যৌথভাবে।

১৯ মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ জয়দেবপুরে অবস্থানরত এক ব্যাটলিয়ান বাঙালি সৈন্যকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেয়, কিন্তু বাঙালি সৈন্যরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। ঢাকা থেকে একদল পাঞ্জাবি সৈন্য এ নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়েছিল। এ খবর আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হকের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ বাঙালি বিদ্রোহী সেনাদের পক্ষে লড়ার জন্য রাস্তায় নেমে আসে। গ্রামবাসী রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। জয়দেবপুরে অবস্থিত অস্ত্র নির্মাণ কারখানার রাস্তাও গ্রামবাসী বন্ধ করে দেয়।

এর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায় নিরীহ গ্রামবাসীর উপর। কিন্তু পাল্টা গুলিও শুরু হয়ে যায়। কমপক্ষে ২০ জন এতে নিহত হয়।

www.pathagar.com

আলোচনা চলতে থাকে

২০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংকট নিরসনে উভয়পক্ষে ৩ জন করে উপদেষ্টা এতে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্টের পক্ষে সাবেক আইনমন্ত্রী এ. আর. কর্নলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ড. কামাল হোসেন আলোচনায় অংশ নেন।

আবার ভুট্টো

২১ মার্চ পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো অভূতপূর্ব কড়া নিরাপত্তায় নির্বাচনের পরে দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা এসে পৌছান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদিন এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। এদিনের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন আহমদও উপস্থিত ছিলেন। ২২ মার্চ ইয়াহিয়া, মুজিব এবং ভুট্টোর তিনপক্ষের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া মুজিব মোট ৫ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বঙ্গবন্ধু জানান, তিনি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের কথা জানতেন না। প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করতে গিয়ে তিনি সেখানে ভুট্টোকে দেখতে পান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, সে-ই ভালো সিপাহসালার যিনি কম রক্তপাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন। তিনি বলেন, গত ২২ দিনের অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন চক্রের মাজা ভেঙে দিয়েছি। বাংলাদেশে যাতে একটিও শোষণকারী থাকতে না পারে সেইজন্য ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে।

ভিন্নভাবে ২৩ মার্চ

২৩ মার্চ বিভিন্ন দল ও ছাত্র-সংগঠন বিভিন্ন নামে দিবসটি পালন করে। স্বাধীনবাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দিবসটি প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে। ভাসানী ন্যাপ-স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস, বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ) স্বাধীন বাংলাদেশ দিবস, কৃষক শ্রমিক পার্টি-লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন দিবস, বাংলা ছাত্রলীগ-প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক-বাংলা দিবস হিসেবে ২৩ মার্চ পালন করে।

সংকট ঘনীভূত

২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এ. ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিকবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ বন্দর-এলাকা ঘেরাও করে রাখে। সৈন্যরা যাতে শহরে প্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে চালান করতে না পারে তার জন্য সারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা ক্যান্টনমেন্টের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী পথের কয়েকটি পুলও নষ্ট করে দেয়। এর মধ্যে প্রতিরোধকারী জনতার উপর সেনাবাহিনী গুলি ছুঁড়ছে বলেও খবর পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

রংপুর শহরে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইন জারি করা হয় এবং অবাঙালি বিহারি-অধ্যুষিত সৈয়দপুর শহরে শাদা পোশাকধারী সেনাবাহিনীর অস্ত্রধারীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বলে খবর বের হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অন্যান্য পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ আলোচনার ভান করে মূলত ভেতরে ভেতরে রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছিলেন। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এ সত্যটি টের পেয়েছিলেন অনেক পরে। ২৫ মার্চ রাত থেকেই পাকিস্তানি আর্মিরা আক্রমণ করতে পারে এমন একটা গুজব সকাল থেকেই শহরে চলছিল।

ফলে নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা দিনের বেলাতেই বঙ্গবন্ধুর সাথে শেষ দেখা করে সরে পড়েন। বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোকজন, ছাত্র এবং অন্যান্যরা বঙ্গবন্ধু এবং কর্নেল ওসমানীর সাথে যোগযোগ রক্ষা করে চলছিল। শহরের রাস্তায় এইজন্য অসংখ্য ব্যারিকেডও তারা তৈরি করে ফেলেছিল, যাতে সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে না পারে। পাকিস্তানিরা মাঝরাতের এই আক্রমণের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তখন আকাশে। গভীর রাতে তিনি ঢাকা ছাড়েন। সম্ভবত তিনি তখন কলম্বো-করাচির আকাশের মাঝপথে।

পাকিস্তানি কমান্ডোরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুজিবের বাড়ির সামনে এসে তার বাড়ির প্রহরীদের পাল্টা গুলির সম্মুখীন হল। এক পর্যায়ে প্রহরীদের নিরস্ত্র করতে সমর্থ হয় এবং স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করে চিৎকার করে মুজিবকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানায়। মুজিবের কক্ষ বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। পাকিস্তানি কমান্ডোরা গুলি করে তালা ভাঙল এবং মুজিবকে গ্রেফতার করল, তারপর ওয়ারলেসে খবর পাঠাল- 'বড় পাখিটা খাঁচার ভেতরে'।

সূর্য যখন উঠে গেছে, তখন ভুট্টোকে তার হোটেলকক্ষ থেকে বের করে আনা হল এবং সেনাবাহিনীর প্রহরায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। গত রাতে সেনাবাহিনীর অভিযানকে 'লারকানার লাড়কা' ভুট্টো প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে।

বিভ্রান্ত নেতৃত্ব : ছাত্র-সৈনিকদের প্রস্তুতি

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১ ডিভিশন (১৪ তম ডিভিশন) সৈন্য ছিল। এই ডিভিশনের জনবল ছিল প্রায় ১৪ হাজার। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ডিভিশন হিসেবে পরিচিত ৯ ডিভিশন ও কোয়েটা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ ডিভিশনকে গোপনে বেসামরিক পোশাকে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে ২ মার্চ 'এমভি সোয়াত' নামের একটি পাকিস্তানি জাহাজ প্রায় সাত হাজার টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। এতে বোঝা যায়, পাকিস্তানিরা কীভাবে দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছিল।

www.pathagar.com

এ সংবাদ আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে অনেকে জানতেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের (পাকিস্তানিদের) শক্তি বৃদ্ধির দিকে ছিল না। তাদের একটি ধারণা ছিল, তারা সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করে ফেলবেন।

শোনা যায়, মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্ররা নিজ উদ্যোগে পুরোনো ৩০৩ রাইফেল দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল।

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রক্ত-নদী সাঁতরে এসে বাংলার ছাত্র-যুবক আবাল বৃদ্ধ জনতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এক অসম যুদ্ধে দেশ-বিদেশের বন্ধুদের সহায়তায় অবশেষে বিজয় ছিনিয়ে আনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। সেখানেও ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

স্বাধীন দেশে ছাত্র আন্দোলন

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের যে সময় তাকে আমি তৃতীয় পর্যায় বলতে চাই। স্বাধীনতাপূর্ব ছাত্র আন্দোলনের সময়ের চাইতে এই সময় দীর্ঘ, চার দশক। এই চার দশকে চারটি দলের সরকার ক্ষমতা এসেছে। এর মধ্যে আশির দশকে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস এদেশের ছাত্রদের আছে। বাকী তিন দশক নানা রকম ঝঞ্ঝা ও বিতর্কের মধ্যে আবর্তিত।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় দেশে প্রকৃত পক্ষে কোন লেখা পড়া ছিল না। ছাত্ররা বই খাতা, কালি, কলম ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের যখন অবসান হলো এক গৌরব দীপ্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে, তখন সেই ছাত্ররাই আবার শিক্ষাঙ্গণে এসে যোগ দিল। তখনও তাদের হাতে অস্ত্র। সেই অস্ত্র ও বারুদের গন্ধ তাদের গায়ে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা দিতে বললেন তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিলেন অনেকেই। তারপরেও কথা থেকে গেল।

স্বাধীনতার পর

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, ভারতের বাহিনীর কাছেই পাকিস্তানের সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে যদিও নামে যৌথ বাহিনীর কথা বলা হয়েছিল এবং যদিও ঢাকায় রেসকোর্সে আত্ম সমর্পনের অনুষ্ঠানে মুক্তিফৌজের উপপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার উপস্থিত ছিলেন, তবু সে উপস্থিতি ছিল খুবই গৌণ। পাকবন্দিরা ভারতের দখলেই চলে গেল। বাংলাদেশ সরকারের কোন বক্তব্য থাকলো না। পাকিস্তানিদের সকল অস্ত্রশস্ত্র ভারত তার দখলে নিল। তা ছাড়াও প্রথম দিকে মিল কলকারখানার সম্পদও কিছু লুট ও ভারতে পাচার হয়। ভারতের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে নতুন বাজার ও লুটের জায়গা খুঁজতে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তৈরি করা হয়। জনগণ মুজিব সরকারকে ভারতের বশংবদ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে। মনে আছে পত্রিকার ডিক্লারেশন নিতে হলে, একটা শর্ত মানতে হতো, 'বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না'। বন্ধুদেশের নামটি উল্লেখ না থাকলেও, এটা স্পষ্ট যে, ভারতকেই বোঝানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন এবং

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা এলেন। সেদিন তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে প্রথম যে রাজনৈতিক পদক্ষেপটি নিলেন, তা হল রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রাক্তন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি করা হল। তখনও সংবিধান রচিত হয়নি। তবে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তিনি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলন করতে যাচ্ছেন। এটি একটি ভালো পদক্ষেপ ছিল। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি শুধু প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থাতেই ফিরে যান নি, এক দলীয় এক ব্যক্তির শাসনও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৭২ এর ১৯ মার্চ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির কিছু সমালোচনা যৌক্তিক ছিল।

শেখ মুজিব যে ভারত প্রসঙ্গে স্বাধীন ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন তার দু'টি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি দেশে ফিরে এসেই ভারতীয় সৈন্যদের ফিরে যেতে বললেন। তিনমাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেল। তবে এ প্রসঙ্গে অন্য ধরনের কথাও আছে। ভারত সরকারের তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব জে.এ. দীক্ষিত ১৯৯৫ সালে Indian Express পত্রিকায় নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, শেখ মুজিব নাকি চেয়েছিলেন ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে এক বৎসর থাকুক, ইন্দিরা গান্ধীই রাজী হননি নানা দিক বিবেচনা করে। যুদ্ধকালীন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরাও এই কথা বলেছেন এক সাক্ষাৎকারে।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC-এর সম্মেলন। বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হল, রাতারাতি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল, বিশেষ বিমান এল শেখ মুজিবকে লাহোরে নিয়ে যেতে এবং তিনি চলেও গেলেন। ভারত কিছু জানলো না, ভারতের সঙ্গে পরামর্শ করার বা নিদেনপক্ষে জানানোর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন না শেখ মুজিব।

প্রথম নির্বাচন

১৯৭২ সালের মধ্যেই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। ১৯৭৩-র মার্চে এই সংবিধানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। সে নির্বাচনে অরাজকতা, সন্ত্রাস কীভাবে সারা দেশকে বিশৃঙ্খল করেছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল মাত্র সাতটি আসন আওয়ামী লীগের বাইরে গেছে। শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন, দেশে কোনো বিরোধী দল নাই। তখনকার রাজনৈতিক মহলের ধারণা কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ আসনে নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করেছিলেন বিরোধী দলের প্রার্থীরা। বরিশালের বাবুগঞ্জে রাশেদ খান মেনন জয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী সার্জেন্ট ফজলুল হক তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরদিন ঢাকার ঘোষণায় দেখা গেল মেনন পরাজিত হয়েছে। জাসদের সভাপতি মেজর এম এ জলিল (বরিশাল), ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রশিদ (দাউদকান্দি) ড. আলিম আর রাজী (টাঙ্গাইল) প্রমুখেরও একই অবস্থা হয়েছিল। ভোলার জাসদ প্রার্থী ডা. আজহার

www.pathagar.com

উদ্দিনকে মনোনয়ন পত্র জমা দিতেই দেওয়া হয়নি। সেদিন সকালে হাইজাক করে তাকে অজানা স্থানে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। এভাবে সন্ত্রাস, রিগিং ও মিডিয়ার মাধ্যমে ভোটার ফলাফল নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টা বাংলাদেশের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল।

সংবিধান চালু হওয়ার পরপরই সংবিধানের কিছু কিছু ধারা সংশোধন করা হয়। জরুরী আইনের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়। স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ও প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশান্স অর্ডিন্যান্স ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী আইন যা ১৯৭৪ সালে প্রণীত হয়েছিল।

মোড় পরিবর্তন

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫, স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বড় ভয়ঙ্কর ছিল এই কালপর্বটি। এই সময় গঠিত হয় রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশের যে মুক্তিফৌজ যুদ্ধের মধ্যে তৈরি হয়েছিল তার সমান্তরাল আরেকটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হল। ফলে সেনাবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীতে বেছে বেছে আওয়ামী অনুগতদের নেয়া হয়েছিল অফিসার ও র‍্যাংক পর্যায়ে। রক্ষীবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছিল প্রধানত বিরোধীদলকে দমন করার জন্য। রক্ষীবাহিনীর বিভৎস অত্যাচারের কাহিনী স্মরণ করে এখনও অনেক এলাকার মানুষ ভয়ে শিউরে ওঠে। তবে পাক বাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার যারা স্বচক্ষে দেখেছে তাদের সংখ্যা এখন কমে গেছে, যারা বেঁচে আছে তারাও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়। রক্ষীবাহিনী বা সেদিনের আওয়ামী শাসনের টার্গেট ছিল বামপন্থী। পাক বাহিনীর দালালরা, রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর লোকজন প্রথমে কিছুদিন পালিয়ে থাকলেও তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল না। পাক দালালদের মধ্যে চিকন আলী নামে একজনেরই মাত্র ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, কিন্তু পরে আর ফাঁসি হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান এক সময় দালালদের ক্ষমাও করে দেন।

রক্ষীবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে প্রধানত বামপন্থী কর্মী ও তাদের সমর্থক এবং কিছু সাধারণ নিরীহ মানুষ। বলা হয় কুড়ি হাজার বামকর্মী নিহত হয়েছে। কোনো সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে গণনা করে এই সংখ্যাটি আসেনি। তবে কয়েক হাজার যে হত্যার শিকার হয়েছে তা এভাবে বলাই যায়। যেমন বলা হয়, পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তিরিশ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন।

এ সময়ের গণআন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং সদ্য গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ। ১৯৭২ সালেই আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে একটি তরুণ অংশ গঠন করে এই দলটি। এই দল গঠনের পেছনে নেপথ্য নায়ক ছিলেন সিরাজুল আলম খান। মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে সভাপতি ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও ডাকসু ভিপি আ.স.ম রবকে সাধারণ সম্পাদক করে জাসদ গঠিত হয়েছিল। জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান তোলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথাও বলে।

www.pathagar.com

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ : ভাসানীর অনশন

এদিকে হু হু করে জিনিসপত্তরের দাম, বিশেষ করে খাদ্যের দাম বাড়তে থাকে। মনে আছে ৭৩/৭৪ সালে শিশুদের জন্য বেবিফুড বা দুধ জোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আর দামও সাংঘাতিক। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে খাদ্যের দাবিতে মিছিল হয়েছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ভাসানী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের মে মাসে তিনি খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। মতিঝিলের ন্যাপ অফিসে দোতালায় একটি ঘরে তিনি ছিলেন। তিনি শুয়ে থাকতেন একটি সাধারণ চৌকিতে। সেখানেই তিনি অনশন শুরু করলেন। তাকে দেখতে ছুটে আসতে লাগলো হাজার হাজার মানুষ।

অনশনের দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার পর তিনটি গাড়িতে করে যারা ভাসানীকে দেখতে এলেন তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে দেখে সবাই চমকে ওঠে। মুজিব ভাসানীকে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান। তিনি মিনিট দশেক একান্তে কথা বলেন অনশনরত ভাসানীর কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী ভাসানীর দাবীর ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি।

মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে ডা. বি. চৌধুরী, ডা. আজিজুর রহমান, ডা. আব্দুল করিম প্রমুখ একদল ডাক্তার ও মেডিক্যাল কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র তার সেবায় এগিয়ে আসেন। এসময় মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরও এসেছিলেন। এ অবস্থায় বামপন্থী ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের আশঙ্কা থেকেই মওলানা ভাসানীকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানালে তিনি দাবী আদায়ে আন্দোলন করার লিখিত প্রতিশ্রুতি চান। এ সময়ে জাসদ নেতা মেজর জলিল, রব এবং শাহজাহান সিরাজ বিভিন্ন ছাত্রনেতাদের নিয়ে অনশন রত ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন। ভাসানী, মেজর জলিল ও রবকে দেশ বাঁচানোরও সংগ্রামে প্রতিরোধ গড়ার আহবান জানান। তারাও ভাসানীর সঙ্গে এক হয়ে সরকারের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবশেষে মওলানা অনশন ভঙ্গ করলেও দুর্ভিক্ষ এড়ানো যায়নি।

১৯৭৩ সালে মওলানা যে দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত শুনতে পেয়েছিলেন ৭৪ সালে সে দুর্ভিক্ষ সত্যি সত্যিই দেখা দিল। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের কথা যারা শুনেছেন তারা এবার সচক্ষে তা দেখলেন। কমলাপুর ষ্টেশনে, তোপখানা রোডের ফুটপাতেও লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। গাইবান্ধা, পার্বতীপুর রেলষ্টেশনেও অভুক্ত মানুষের সারি ছিল লাশের পাশেই। কঙ্কালসার মানুষের সারি ক্রমেই লম্বা হয়েছিল। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ আমলের ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের মতই মনুষ্য সৃষ্টি। দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্য উৎপাদন তার আগের বছরের চেয়েও বেশি ছিল। ১৯৭১ এর যুদ্ধকে, পরবর্তী বন্যাকে দুর্ভিক্ষের কারণ বলে চিহ্নিত করেন অনেকে, বিশেষ করে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা। আরও বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সময়মতো খাদ্য সরবরাহ করেনি বলেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। এভাবে দুর্ভিক্ষের জন্য খাদ্য ঘাটতিকে দায়ী করা হলেও বাস্তবে দায়ী ছিল সরকার এবং সরকারি দলের

www.pathagar.com

কিছু ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদের সীমাহীন লোভ ও মুনাফার প্রবৃত্তি। তখন শুধু চালের দামই আকাশচুম্বি হয়নি। এলাকাভেদে লবণ প্রতি সের ৪৮ টাকা হতে উর্ধ্বে ৯৬ টাকায় বিক্রি হয়েছে। যা ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। এ সময় বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে কঙ্কালসার মানুষের পাশাপশি ঢাকা ক্লাবে বা কোনো বড় হোটেলে বিলাসী ভোজ সভায় উল্লাস করছে কিছু মনুষ্যত্ববিহীন লোক।

বহুদলীয় গণতন্ত্র বনাম একদলীয় বাকশাল

১৯৭৫-র জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনী পাস হলো মাত্র ১০ মিনিটে। এটাই বাকশাল ব্যবস্থা। এই চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন রাষ্ট্রপতি এবং ডিক্টেটরে পরিণত হলেন। বাকশাল ব্যবস্থাটি ছিল: ১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং তিনি সকল ক্ষমতার মালিক ও উৎস। ২. দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে, যার সভাপতি হবেন স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান। কেন্দ্রীয় কমিটি, অন্যান্য সংস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পদে কে বা কারা থাকবেন, তা তিনিই ঠিক করে দেবেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে। পরে তিনি এই শাসক দলের নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল। ৩. শ্রমিক, কৃষক, নারী, ছাত্র, যুব এই ধরনের সকল গণসংগঠন বেআইনি হবে। একটি মাত্র কৃষক, শ্রমিক (ট্রেড ইউনিয়ন), ছাত্র, যুব, নারী সংগঠন থাকবে, যার নাম কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় পদে কে বা কারা থাকবেন, তাও শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক করে দেবেন। ৪. দেশে মাত্র চারটি সরকারি পরিচালনাধীন সংবাদপত্র থাকবে, বাকি সকল পত্রিকা বা সাময়িকীর প্রকাশ নিষিদ্ধ হবে। ১৬ জুন এই আদেশ জারী হয়। বহুদিন পর্যন্ত সাংবাদিকরা এই দিনটি কালো দিবস হিসেবে পালন করছেন। ৫. পার্লামেন্ট নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, তাকে শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব অনুমতি নিতে হয়। ৬. সেদিনের যে পার্লামেন্ট ছিল তার মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়ানো হল এবং যে সব সংসদ সদস্য বাকশালে যোগদানে অস্বীকৃতি জানাবেন, তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে।

বিরোধীদলের আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগ দিয়ে সংসদ সদস্য পদ রক্ষা করলেন। আওয়ামী লীগের জেনারেল ওসমানী ও ইত্তেফাকের মালিক মইনুল হোসেন বাকশালে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানালে সংসদ সদস্যপদ হারালেন। মানবেন্দ্র লারমা অবশ্য কৌশলগতভাবে বাকশালে যোগ দিয়ে সাংসদ হিসেবে রয়ে গেলেন। মরহুম আব্দুল্লাহ সরকার (পরবর্তীতে বাসদ নেতা এবং মৃত্যুর আগে নাগরিক ঐক্যের উপদেষ্টা ছিলেন) বাকশালে যোগ দেননি বলে সংসদ সদস্যপদ হারালেন। এই কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারী হয়েছিল।

আন্দোলনের শুরু ও শেষ

আমাদের দেশে জোটবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠার ইতিহাস আছে, শেষ হওয়ার নেই। হয়তো সর্বত্রই এরকম হয়, আন্দোলন যখন বিজয় অর্জন করে তখন আর জোটের

www.pathagar.com

প্রয়োজন থাকে না। যারা ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন করেছেন আইয়ুব শাহী পতনের পর তারা সম্ভবত এ ঐক্যের আর প্রয়োজনবোধ করেননি। ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিয়েছিলেন, যে নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। আওয়ামী লীগ গোটা পাকিস্তানে এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। প্রকৃত পক্ষে এ বিজয় ছিল সমগ্র ছাত্র জনতার বিজয়। ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের যথেষ্ট প্রভাব ছিল সেকথা আগেও বলেছিল। কিন্তু '৬৯ এ যখন গণআন্দোলন সংগঠিত হয় তখন ডাকসুর ভিপি ছিলেন ছাত্রলীগের তোফায়েল আহমেদ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ছাত্র ইউনিয়নের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব থাকলেও পরিষদের মুখপাত্র ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ। জাতীয়ভাবে মূল আন্দোলন ছিল ৬ দফার আন্দোলন যার নেতা ছিলেন শেখ মুজিব। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন এবং অতঃপর আন্দোলনের বিজয়ে তিনি বাংলার মানুষের একক নেতা রূপে আবির্ভূত হলেন। '৭০-এর নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ে প্রশ্নাতীতভাবে এদেশের অবিসংবাদিত কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হলেন।

এই বিজয় কি বাংলার মানুষের মুক্তিকে, বাংলার স্বাধীনতাকে নিষ্কণ্টক করে তুলেছিল? তখনো কী আর জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিলো? ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রয়োজন হলো? প্রশ্ন তখন উঠেনি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এ প্রশ্ন উঠেছিল।

যুদ্ধশেষে যখন সবাই ফিরে এলো তখনো এত বড় বিজয় সত্ত্বেও ঐক্যের সুর নেই। '৭২-এ ডাকসু নির্বাচন হলো এবং আগেই বলেছি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন একটি সদস্য বাদে পুরো প্যানেল জয়লাভ করলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছাত্র ইউনিয়ন যে রকম আলাদাভাবে স্বাধীনতার পক্ষে তাদের কর্মসূচী পালন করেছিল স্বাধীনতার পরে সে বিভাজন রেখা স্পষ্টই থাকলো। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার যে প্রশ্ন নিয়ে কাগমারী সম্মেলনে বিভক্তি দেখা দিয়েছিল সেই রকম বিরোধ এখানে দেখা দিল। ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী শুরু করে।

রাজধানীতে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ

উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী বোমাবাজীর প্রতিবাদে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের একটি মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ১ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সোমবার দু'জন ছাত্র নিহত এবং সাতজন আহত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে ছাত্ররা তোপখানা রোডস্থ মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের (ইউসিস) সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে।

নিহত দু'জন ছাত্রের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মতিউল ইসলাম এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র মীর্জা কাদেরুল ইসলাম মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হলে উভয়েই সেখানে প্রাণত্যাগ করে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বাংলার বাণী পত্রিকার ফটোগ্রাফার রফিকুর রহমান, ধানমন্ডি সরকারী হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র পরাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র আমীরুল ইসলাম, ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ফরিদ হোসেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-

www.pathagar.com

সভাপতি আবুল কাসেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুলতান আহমদ। [দৈনিক আজাদ, ২ রা জানুয়ারি (মঙ্গলবার), ১৯৭৩]

পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তীব্র সমালোচনা করে ডাকসু প্রদত্ত তার আজীবন সদস্যপদ বাতিল করেন ডাকসু সহ-সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

২ জানুয়ারি শহরে প্রতিবাদ মিছিল

ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বাজির বিরুদ্ধ ডাকসু ও বাংলাদশ ছাত্র ইউনিয়ন পরিচালিত মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সম্মুখে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিশী গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীতে বিভিন্ন রাজনীতিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ মিছিল ও ঘটনার নিন্দা এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করে।

বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ন্যাপ এর সভায় মোজাফফর আহমদ, মতিয়া চৌধুরী, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এ ঘটনায় নিন্দা জানান। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড দেবেন সিকদার, কৃষক সমিতি, বাংলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, মহিলা পরিষদের সভানেত্রী সুফিয়া কামাল এবং সাধারণ সম্পাদিকা মালেকা বেগম, উদাচী শিল্পী গোষ্ঠীর ছাত্রলীগ(র-সি) এর সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও জনাব আ.ফ.ম মাহবুবুল হক, বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের মাহবুবুল্লাহসহ আরও অনেকে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। [৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, দৈনিক আজাদ]

সারা বাংলায় বিক্ষোভ, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার দাবি

ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান পাট, অফিস আদালত, কল-কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২ জানুয়ারি বন্ধ ছিল। রাস্তা ঘাটে কোনো প্রকার যানবাহন চলেনি। বাংলাদেশ সচিবালয়ও বন্ধ ছিল। হাট বাজার অফিস আদালত স্কুল কলেজে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। মিছিলে মিছিলে ঢাকা নগরী সয়লাব থাকে। পল্টনে বিশাল ছাত্র সমাবেশে ডাকসু সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। দরকার হলে আমরা বুকের রক্ত আরো দেবো কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবো।

গুলিবর্ষণে নিহত মীর্জা কাদেরুল ইসলামের লাশ নিয়ে ২ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিলকারী জনতা কালো ব্যাজ পরিধান করে।

মাওলানা ভাসানীর বিবৃতি

২ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী বলেন কোনো অত্যাচারই বিপ্লবী জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারবে না। শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশের এরূপ গুলিবর্ষণ সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরোধীতা করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

এদিন ছাত্রলীগ রব-সিরাজ গ্রুপের সভায় আ.স.ম রব ছাত্র জনতার ওপর পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা

এদিকে ঢাকানগরী আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার ঘোষণা দেয়। ২ জানুয়ারি নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা এ কথা ঘোষণা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন দোসরদের আপত্তিজনক মন্তব্যের নিন্দা করেন। পিরোজপুর ও বরিশালের জনসভায় (২ জানুয়ারি) নির্বাচন বানচালের জন্য কোনো কোনো দল অপপ্রচার চালাচ্ছে বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

শহীদ স্মৃতি পাঠাগার

ছাত্রনেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সোমবার পুলিশের বুলেটে নিহত শহীদ মতিউর ও শহীদ মীর্জা কাদেরুলের স্মৃতি রক্ষার্তে মার্কিন তথ্য কেন্দ্রটিকে শহীদ মতিউল-কাদেরুল স্মৃতি পাঠাগার হিসেবে ঘোষণা করেন। ছাত্ররা মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে একটি সাইন বোর্ডও টাঙ্গিয়ে দেন।

বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মৌন থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে যান।

এর মধ্যেই ২ জানুয়ারী, ন্যাপ অফিসে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ হামলা চালায়। [৪ জানুয়ারি ১৯৭৩, দৈনিক আজাদ]

ইউসিস ভবন শীর্ষে ভিয়েতনামের পতাকা উত্তোলন

ছাত্র সমাজ ৩ জানুয়ারি ইউসিস (মার্কিন তথ্য কেন্দ্র) ভবন এবং মার্কিন চার্জ দ্য এফেয়ার্স ভবন শীর্ষে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এবং ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের পতাকা উত্তোলন করে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (রব-সিরাজ) এ পতাকা দুটো উত্তোলন করে।

ছাত্র ইউনিয়ন উত্তোলন করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েত নাম সরকারের এবং ছাত্রলীগ উত্তোলন করেছে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের পতাকা। ছাত্রলীগ মতিঝিলস্থ মার্কিন চাজ্য দ্যা এফেয়ার্স ভবনেও জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের পতাকা উত্তোলন করেন। জাসদের জনসভা বাংলাদেশ থেকে মার্কিন মিশন গুটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান আ.স.ম আব্দুর রব।

রাজনৈতিক মেরুকরণ

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঘরে যুবকটি তখন একেবারে নতুন মানুষ। ক্যাম্পাসে এসেছে দেহ-মনে বারুদের গন্ধ নিয়ে। জীবন বাজী রেখে দেশ স্বাধীন করে যেন এক নতুন জগতে

www.pathagar.com

এসেছে। নিজের ভবিষ্যতের পাশাপাশি দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও তার গভীর চিন্তা। ১৯৭২ সালে যে সরকার ক্ষমতা নিল তাদের ভূমিকা ও কর্মকান্ড অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার মতো তার মনেও নানান প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

ক্ষমতাসীন দল ও দলের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দাপট, দলবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস, স্বার্থ উদ্ধারের নানা অবিশ্বাস্য ঘটনা ক্ষুব্ধ করে তুলল অনেককেই। স্বাধীন দেশেও তারা নিজেদের বঞ্চিত, অবহেলিত ভাবতে শুরু করলো ফলে মুক্তিযুদ্ধ মানুষের মধ্যে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিল তা দ্রুতই ভেঙ্গে পড়তে থাকলো। কোথাও কোথাও বিরোধ সংঘাত-সংঘর্ষেও রূপ পেল। ছাত্রদের মাঝে প্রতিবাদি চিন্তা বেশ দ্রুত প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার আগে থেকেই ছাত্রলীগের একাংশের (রব-সিরাজ) সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে যে ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার পর ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সাংগঠনিক শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকার কারণে ছাত্রদের আকৃষ্ট করলেও তাদের সরকার সমর্থক ভূমিকা নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। ফলে ১৯৭২ সালে ডাকসুতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের(বাছাই) একক প্রাধান্য থাকলেও খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ৭৩ সালের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের (মুজিববাদী) সঙ্গে যৌথ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ে। কারণ এর মধ্যেই সামাজিক বিপ্লবের প্রবক্তা ছাত্রলীগ (মাহবুব-মান্না) ছাত্র সমাজে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। ফলে ডাকসু নির্বাচনে এক অচিন্তণীয় ঘটনা ঘটে যা বাংলাদেশের রাজনীতির অধঃপতনের প্রমাণ হয়ে আছে।

'৭২ সালে স্বাধীনতার পরে প্রথম ডাকসুসহ সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যার সবগুলিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ আলাদা আলাদা প্যানেল নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালযগুলোতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের আবেগ এককভাবে কাজ করেছিল। ছাত্র ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল এবং নিজেদের ঐক্য ধরে রাখতে পেরেছিল। তারই ফল পেয়েছিল তারা ডাকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন একটি সদস্য পদ বাদে পুরো প্যানেলে জয়লাভ করে।

ছাত্রলীগ (রব) স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে নতুন রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরে। তারা বলে, বাংলাদেশ রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক অর্থে স্বাধীন হলেও স্বাধীনতার যে মূল স্বাদ অর্থনৈতিক মুক্তি তা অর্জিত হয়নি। স্বাধীনতার পর তাই এখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে লড়াই করতে হবে। তারা সমাজবিপ্লবের শ্লোগান তোলে। তারা সরাসরি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে। 'আমরা লড়ছি শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে।' এটাকে তারা তাদের মূল বক্তব্য হিসাবে ছাত্রসমাজের সমানে তুলে ধরে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিতর্ক

মার্কসীয় দৃষ্টিতে একটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার বক্তব্য কতখানি সঠিক সে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও তাদের এ বক্তব্য ব্যাপক ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করে। প্রতিপক্ষ নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপ মুজিববাদ-এর শ্লোগান তোলে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে শেখ মুজিবের পর্বত প্রমাণ জনপ্রিয়তা থাকলেও কেবল তার নামের উপর একটি মতবাদ তো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ জন্যেই সম্ভবতঃ মুজিববাদী ছাত্রলীগের প্রতি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোন আকর্ষণই লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীনতার পরপরই দেশের মধ্যে যে অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে সরাকারি ভূমিকার সমালোচক হয়ে পড়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। সে তুলনায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপক সাড়া তোলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ১৯৭২-এ সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (উভয় গ্রুপ) হারলেও ১৯৭৩ সাল থেকে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যতগুলো ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছে তার অধিকাংশতেই জাসদপন্থী ছাত্রলীগ ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে।

ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন ছিল। বাংলদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং আওয়ামী ছাত্রলীগ এতে যৌথ প্যানেল দেয়। ছাত্র ইউনিয়নের নূহ উল আলম লেনিন ও ছাত্রলীগের ইসমত কাদির গামার নেতৃত্বে ডাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লেনিন-গামা পরিষদ। জাসদপন্থী ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মাহবুব-জহুর পরিষদ তাদের মোকাবেলা করে এবং এ নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে মাহবুব-জহুর পরিষদ বিশাল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ সমর্থিত লেনিন-গামা পরিষদকে পরাজিত করে। কিন্তু এ নির্বাচনের ফলাফল আলোর মুখ দেখেনি।

ডাকসু ভোট গণনা স্থগিত

সকাল থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ছোটখাটো দু'একটা ঘটনা বাদে মোটামুটি শান্তিময় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বিকেল ৩টায় তথাকথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গুণ্ডারা প্রথমবারের মতো হামলা চালায় ছাত্রলীগের দুর্গ বলে পরিচিত শহীদুল্লা হলে। শহীদুল্লা হলের হামলায় আহত হন ২ জন ছাত্রলীগ কর্মী। তাদের একজন হচ্ছেন এ হলের ছাত্র মকসুদ। তার কাছ থেকে সরকারের সর্বময় ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিটির সুযোগ্য পুত্র ঢাকা-এ ৬৩৮৭ নম্বরের একটি কাওয়াসাফি ৯০ সিসি হোণ্ডা ছিনিয়ে নেয়। অন্য একজন আহত ব্যক্তি হচ্ছেন তবারক হোসেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, উক্ত ঘটনার পরপরই শহীদুল্লা হলের ছাত্ররা হল ত্যাগ করতে থাকেন ও কয়েক মিনিটের মধ্যে এলাকাটি একটি জনমানবহীন প্রেতপুরীতে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী আরো জানান, তখন তারা শ'খানেক জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা চালায়। বিকেল ৫টার দিকে শহীদুল্লা হলের গেটে মুজিববাদী গুণ্ডাদেরকে প্রকাশ্যে সশস্ত্র অবস্থার অবস্থান করতে দেখা যায়। তাদের কাছে ষ্টেনগান ও রিভলবার ছিল। তার পর পরই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

এলাকাজুড়ে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা পালাতে থাকেন হল ছেড়ে। সন্ধ্যার দিকেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৩টি গাড়ীকে ব্যাপকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তন্মধ্যে ইউনিসিফের ২৫০ নং গাড়ীটিও রয়েছে (ঢাকা-খ ৮৫০)। অন্য দুটো গাড়ী হচ্ছে ঢাকা-ক ৮৪০৬ ও ঢাকা-ক ১৯২৭। সন্ধ্যা সতাটায় গুণ্ডারা প্রথমবারের মতো সলিমুল্লাহ হলের ব্যালটবাক্স ছিনতাই করে। তারা প্রথমতঃ বাতি নিভিয়ে ফেলে ও কয়েকশ' রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে গান পয়েন্টে তারা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। একই কায়দায় মুজিববাদী দস্যুরা সূর্যসেন হল, মহসিন হল, শহীদুল্লা হল, ফজলুল হক হল, জহুরুল হক হল ও রোকেয়া হলের ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। গুণ্ডারা শামছুন্নাহার হলেও ঢুকে। কিন্তু ততক্ষণে ভোট গণনা শেষ। দোষ স্খলন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্ট করার জন্যে তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জগন্নাথ হলের ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। রাত দশটার দিকে গুণ্ডাবাহিনী রোকেয়া হলে প্রবেশ করে এবং মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তখন ছাত্রী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল গণনার শেষ পর্যায়ে ছিল। সেই মুহূর্তেই গুণ্ডারা রেজাল্ট শীট ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। ছিনতাইকারীরা হলের রুমে রুমে প্রবেশ করে এবং মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। রাত পৌনে এগারোটার দিকে মুজিববাদী ও বাছাইর গুণ্ডাদলটি ডাকসুর ব্যালট বাক্স কলাভবনের সামনে ভস্মীভূত করে। এক খবরে জানা যায় যে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার জনাব ওয়াদুদুর রহমান খান তাদেরকে ডাকসু ভোট গণনা কক্ষের চাবি সরবরাহ করেন।

ভোট গ্রহণকালীন সময়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত না ঘটলেও সন্ধ্যায় শামসুন্নাহার এবং রোকেয়া হল ছাড়া বাকী ছয়টি হলের ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়েছে। সন্ধ্যার পরে কলা ভবন এবং তার আশে পাশের হলগুলোতে গুলির শব্দ শোনা গেছে।

গভীর রাতে জানা গেছে যে, ডাকসুর ভোট গণনা আপাতত মূলতবি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শহীদুল্লা হলে গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণকালে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি না হলেও বিকেল আনুমানিক পাঁচটায় দুদল ছাত্রের মধ্যে এক সংঘর্ষে তিনজন ছাত্র আহত হয়েছেন। শহীদুল্লাহ হলেও ভোট গণনা সম্ভব হয়নি। অভিযুক্ত যৌথ প্যানেল কর্মীরা একই দিন বাংলাদেশ ছাত্র লীগের (মাহবুব গ্রুপ) সভাপতি আ.ফ.ম মাহবুবুল হক অভিযোগ করেন যে, ডাকসু সহ বিভিন্ন হলের নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবির ভয়ে ছাত্রলীগ (শহীদ গ্রুপ) এবং ছাত্রইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) তথাকথিত যৌথ প্যানেলের কর্মীরাই অস্ত্রের মুখে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও ডাকসুর সহ-সভাপতি পদে ছাত্রলীগ মনোনীত সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থী জনাব আ. ফ. ম মাহবুবুল হক আন্দোলনের পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী গুণ্ডা ও তাদের পাঁচটা কুকুরদের ফ্যাসীবাদী

www.pathagar.com

কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টির জন্যে দেশের জাগ্রত ছাত্র সমাজ ও সকল বামপন্থী প্রগতিশীল ছাত্র-গণ সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনের ঘটনাবলীর সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্যে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সত্যসন্ধানী ও সত্য সেবীর দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বিনষ্টকারী মুজিববাদী ও তাদের পা-চাটা দালালদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের দাবী জানান।

ছাত্রলীগ সভাপতি জানান যে, নির্বাচনের পূর্বেই জাকসু ও দর্শন বিভাগের ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ও রাকসুতে ছাত্রলীগ কর্মীদের ভোট না দিতে দেওয়ার অভিজ্ঞতাও থেকে তার সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশ, বি-ডি-আর বা সেনাবাহিনী নিয়োগ করে হলেও কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের দাবী মানা হয়নি, তা তিনি জানতে চান।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহবুব সরকারপোষ্য গুণ্ডাবাহিনীর ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপকে সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, যেকোন মূল্যে ডাকসু দখলের লক্ষ্য নিয়ে সরকারপোষ্য গুণ্ডারা তাদের কার্যকলাপকে পরিচালিত করেছে। তাই যখন ভোট গণনার প্রাথমিক ফলাফলে তাদের ভরাডুবির ইঙ্গিত পাচ্ছিল তখন তারা বিচলিত হয়ে ওঠে। সেজন্যেই পূর্বপরিকল্পিত উপায়ে সারিবদ্ধভাবে জীপ নিয়ে তারা হলে হলে হামলা চালায়। এ হামলায় আহত হন অসংখ্য ছাত্রলীগ কর্মী ভাই-বোন। প্রহৃত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী, নিখোঁজ হন অনেক ছাত্রলীগ কর্মী। আহত হয়েছেন ডাকসুতে ছাত্রলীগ মনোনীত সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, জহুর হলে ছাত্রলীগ মনোনীত সহ-সভাপতি ফজলে এলাহী, ছাত্রলীগ কর্মী মকসুদ, তোবারক ও অনেকে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন অনেকে।

মাহবুবুল হক নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, নির্বাচন চলাকালে তারা ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে অস্ত্রের হুমকি দিয়েছে, জোরপূর্বক যৌথ প্যানেলের পক্ষে ভোট নিয়েছে, ছাত্রলীগ কর্মীদের মারধোর করেছে, ছাত্রলীগের প্যানেল কেড়ে নিয়েছে এবং ছাত্রলীগের পুলিং এজেন্টদেরকে জোর পূর্বক বের করে দিয়েছে।

তিনি বলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ প্রার্থীরা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী ভোট পেয়ে অগ্রগামী ছিল। বিভিন্ন হলে মুজিববাদীদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, রিভলবার, ষ্টেনগান ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সরকারী গুণ্ডারা সলিমুল্লাহ হলে প্রবেশ করে ছাত্রলীগ কর্মীদের বেপরোয়া মারধোর করে এবং লাইট নিভিয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সলিমুল্লাহ হল শাখার একজন কর্মী জামাল এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। আরও আগে তারা শহীদুল্লা হলে ঢুকে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর সশস্ত্র অবস্থায় চড়াও হয়। ইতিপূর্বে গুণ্ডাবাহিনী নির্বাচনী কেন্দ্রে ঢুকে ছাত্রলীগের পুলিং এজেন্টদেরকে জঘন্যভাবে অপমান করে বের করে দেয়। গুণ্ডারা ফজলুল হক হলে ঢুকে ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচন সংক্রান্ত

www.pathagar.com

সমস্ত কাগজ-পত্র ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাদের হামলায় আহত হন অনেক ছাত্রলীগ কর্মী।

মুজিববাদী গুণ্ডারা জহুর হলের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী ফজলে এলাহীকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এ হলে তারা জোরপূর্বক ভোটারদেরকে যৌথ প্যানেলের পক্ষে ভোটদান করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ছাত্রদের মারধোর করে। মহসীন হল ও সূর্যসেন হলেও তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ছাত্রলীগ কর্মীদের মারধোর করে ব্যালট পেপার ছিনতাই করে।

জগন্নাথ হলে তাদের জেতার সম্ভাবনার কথা শোনা গেলেও তাদের কুকীর্তি ঢেকে ফেলা এবং জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তারা এই হলের বাক্সও ছিনতাই করেছে।

মুজিববাদী গুণ্ডারা শামসুন্নাহার এবং রোকেয়া হলে জোর পূর্বক ঢুকে হলের ছাত্রীদের উপর নির্যাতন চালায়। গুণ্ডারা ছাত্রী বাসের আলো নিভিয়ে দিলে ছাত্রীরা আর্তচিৎকার করতে থাকে ও ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। শামসুন্নাহার হলে গুণ্ডারা ঢুকার পূর্বেই ভোট গণনা শেষ হয়ে যায়। রোকেয়া হলে ছাত্রলীগ সবকটি পদে বিজয়ী হয়েছে। তাই মুজিববাদী গুণ্ডারা ফলাফল প্রকাশে সশস্ত্র বাধার সৃষ্টি করে এবং রেজাল্ট শীট ও ব্যালট বাক্স নিয়ে যায়।

ছাত্রলীগ সভাপতি আরো জানান যে, রাত পৌণে ১১ টার সময় তারা ডাকসুর ব্যালট বাক্স কলাভবনের সামনে ভস্মীভূত করে। জনাব মাহবুব জানান যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর সরকারী গুণ্ডারা এরশাদ বিল্লাহ ছবি ও আবুবকর সিদ্দিককে অপহরণ করে। তিনি বলেন, তাদের খোঁজ এখনো পাওয়া যায় নি।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে মাহবুবুল হক অভিযোগ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম নিরীহ ছাত্রদের ওপর অত্যাচার, জালভোট প্রদান, ছাত্রীদের ওপর অত্যাচার এবং শিক্ষক প্রহারের ঘটনা ঘটলো।

তিনি বলেন, হামলাকারীরা ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে এবং রাষ্ট্রের চারনীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শত্রু এ সমস্ত অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদি কার্যকলাপ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বামপন্থী প্রগতিশীল সমাজের নিকট আহ্বান জানান তিনি।

ডাকসু নির্বাচনের ফল জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, তথাকথিত ছাত্রদের এহেন কার্যকলাপ দেশের সচেতন ছাত্র সমাজের নিকট তাদের ঘৃণ্য এবং জঘন্য মুখোশ খুলে দিয়েছে।

আ.ফ.ম মাহবুবুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং নির্বাচনী কমিশনারের নিকট তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার দাবী জানান এবং নির্বাচন চলাকালীন সময়ে কর্তব্যরত বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট এবং শিক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণারও দাবী জানান। তিনি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার জন্যও দাবী জানান।

www.pathagar.com

তারা কিছুই জানে না।

মুজিববাদী ছাত্রলীগ এবং সরকারী ছাত্র ইউনিয়নের দুর্বৃত্তরা যখন সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ত্রাসের সঞ্চার করে ফিরছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন কানে তুলো আর চোখে ঠুলো বেধে বসেছিলেন। বিভিন্ন হল থেকে যখন একের পর এক ব্যালট বাক্সগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন টেলিফোনে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। উপর্যুপুরি কয়েকবার চেষ্টা করার পর উপাচার্য জানান, আলোচনার জন্যে তিনি গণভবন যাচ্ছেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ যাবত তাকে আর পাওয়া যায়নি। মধ্যরাতে বাসায় টেলিফোন করা হলে জবাব পাওয়া যায় উপাচার্য এখন ঘুমুচ্ছেন, সকালের আগে জাগবেন না।

রোকেয়া হলের মেয়েদের ওপর মুজিববাদী গুণ্ডাদের পাশবিকতার সংবাদ পাবার পর ওই হলের প্রভোষ্টের সঙ্গে যোগাযোগের বারবার চেষ্টা করেও তাকে না পেয়ে অবশেষে রাত সাড়ে বারোটার সময় তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে রোকেয়া হলে উপস্থিত হলেও প্রভোষ্ট মিসেস নীলিমা ইব্রাহীম দেখা করতে অস্বীকার করেন। তিনি জানান, সকালের আগে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। রোকেয়া হলের মেয়েদের ওপর মুজিববাদী গুণ্ডারা পাশবিকতা চালিয়েছে, এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদগুলো সম্পর্কে আপনার কিছু না বলতে পারার পরিপ্রেক্ষিতে কি এগুলোকে সত্য বলে ধরে নিতে পারি? এ প্রশ্নের জবাবে মিসেস নীলিমা ইব্রাহিম জানান, 'আমি কিছুই জানি না। হলে কিছুই হয়নি।

সুপরিকল্পিত ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচনের ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা হয়েছে। তবে ছিনতাই কারা করেছে তা আমি জানি না। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী তার বাসভবনে ঘরোয়াভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

ব্যালট বাক্স ছিনতাইকারীদের শাস্তি দাবি : ছাত্রধর্মঘট

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা মনিরুল হক চৌধুরী বলেছেন ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনা এটাই প্রমাণ করেছে যে, অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে শান্তি রক্ষায় বিশ্বাস করে না। তিনি বলেন, ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

তিনি ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনে ব্যালট পেপার ছিনতাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত এক ছাত্র সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। বটতলার এ সভায় সভাপতির ভাষণ দানকালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাংলাদেশ ছাত্র

www.pathagar.com

ইউনিয়নের সভাপতি মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তখন এদেশেরই এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদরা তাদের বিদেশী প্রভুদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে তা নস্যাতের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

তিনি প্রসঙ্গত বলেন, চীন-মার্কিনীদের দালাল পেন্টাগণের 'বিপ্লবীদের' রাজনীতির ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সর্বত্র আজ থেকে আমরা কারফিউ ঘোষণা করলাম। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, মাহবুব জামান, ডাকসুতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্যানেলের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী নূরুল আলম লেনিন এবং ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ইসমত কাদির গামা। সভায় এক পর্যায়ে মিথ্যা খবর দেয়ার জন্য দৈনিক গণকণ্ঠের কপি পোড়ানো হয়।

পরীক্ষায় নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস

শিক্ষাঙ্গণের ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখন কী ধরনের অবস্থান বিরাজ করত সেটা বুঝার দিকে একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশে ছাত্র-তরুণরা সঠিক দিক দর্শন ও নির্দেশনার অভাবে স্বাভাবিকভাবে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। ক্ষমতাসীনদের দুর্বৃত্তপনার প্রভাব পড়েছিল ছাত্রদের একাংশের ওপরও। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ছাত্রদের থেকে দাবি উঠেছিল অটো প্রমোশনের। সে দাবি মানাও হয়েছিল তারপর পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা জানা যায় পরীক্ষায় নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায়।

স্বাধীনতার পরপরই সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশে একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করবেন। কিন্তু আজ অবধি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাতো দূরের কথা, তার একটা রূপরেখা পর্যন্ত সরকার শিক্ষার্থী ও জনগণের সামনে পেশ করতে পরেননি। ইতিমধ্যে একটা জিনিস অবশ্য গণমুখী হয়েছে। জিনিসটি হচ্ছে পরীক্ষায় নকলবাজি।

নকল প্রতিরোধের পরীক্ষায় ছাত্ররা পাস, কর্তৃপক্ষ ফেল

স্বাধীনতার পর এযাবৎ বিভিন্ন পর্যায়ের যে ক'টি ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে সব ক'টিতে অবিশ্বাস্য, প্রায় সার্বজনীন হারে নকল হয়েছে। নকল প্রবণতা বাড়তে বাড়তে এত নগ্নরূপ নিয়েছে যে, সরকার শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পরীক্ষা হল এলাকায় কার্ফু জারি করে বি.ডি.আর নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাতেও সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। পরদিন ডাকসু ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী কোর্সের যে পরীক্ষা হচ্ছে তার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের এই অভিযোগ অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ডাকসু অফিসে নকলবাজদের হামলা : ফাঁস প্রশ্নপত্রের সব পরীক্ষা বাতিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী পরীক্ষায় সব ফাঁস প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; ইতিমধ্যে ৪ এপ্রিল (বুধবার) নির্ধারিত অর্থনীতি তৃতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় সেই পরীক্ষা বাতিল করে আবার ৯ই মে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে এবং বাকী পরীক্ষাগুলোর কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও সেক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে নকলবাজ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারা মিছিল করেছে এবং নকলবিরোধী আন্দোলনের দূর্গ হিসেবে ডাকসু অফিস তছনছ করেছে। অপর পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এক যুক্ত বিবৃতিতে নকলবাজদের গুণ্ডামির নিন্দা করেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের শাস্তি দাবী করেছে।

নারায়ণগঞ্জে স্নাতক পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার অর্থনীতি তৃতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করার সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তোলারাম কলেজের স্নাতক পরীক্ষার্থীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণের পর তোলারাম কলেজ সড়কে এক প্রতিবাদ সভা করে। এই সভায় কলেজের অধ্যক্ষ শামসুল হুদা, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও তোলারাম কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম সহ তিনজন স্নাতক পরীক্ষার্থী বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এম. শরিফুল ইসলাম তার ভাষণে বলেন যে, ছাত্র সমাজ ও শিক্ষক সমাজের পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে যখন শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষাগুলো হচ্ছিল তখনই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া পরীক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার বিরুদ্ধে এক বিরাট চক্রান্ত। তিনি যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য ছাত্র সমাজ ও শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বিভক্ত ছাত্রলীগ

এ দিকে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগেই বলেছি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার পরে ছাত্রলীগের রব গ্রুপ ও নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপের মত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে আসে। রব গ্রুপ মুজিব-বাদের বিরোধীতা করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সমাজ বিপ্লবের শ্লোগান দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার উভয় গ্রুপই বঙ্গবন্ধুকে তাদের নেতা বলে মানে এবং ঘোষণা করে যে নেতা তাদের সাথে আছেন। '৭২-এর জুলাই মাসের একই দিনে ২১-২৩ জুলাই এই দুই গ্রুপ মুজিববাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে যথাক্রমে রেসকোর্স ও পল্টনে আলাদা আলাদা কেন্দ্রীয় সম্মেলন ডাকে। উভয় গ্রুপই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করেছিলেন।

আগের ইতিহাস

'৬৬ সালে যে ৬ দফা আন্দোলন শুরু হয়। আগেই বলেছি, আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে তা সমর্থন করেনি। এই জন্যে ৬ দফার পক্ষে প্রচারণা হিসাবে বঙ্গবন্ধু প্রথম যে জনসভা করেন তা ঢাকায় অনুষ্ঠিত না হয়ে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৬ দফাকে সমর্থন করে। '৬৯ এ ১১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্বশাসন তথা স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাত্রদের এই কর্তৃত্বের বিষয়টি কিন্তু একক ও অবিভাজ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা পেশ করেন তখন নানা প্রশ্ন ছিল। ৬ দফাকে সিআইএর দলিল পর্যন্ত বলেছিলেন কেউ কেউ। ন্যাপ কম্যুনিস্ট পার্টিসহ বামপন্থীরা মনে করতেন ৬ দফাতে ধনী কর্তৃক গরিবের এবং সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে কোন কথা নেই। পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধেও বক্তব্য নেই। এ জন্যই শুরু থেকে ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে আলাদা ধারা বজায় রেখে চলার একটা ঝোঁক ছিল। ২ মার্চ যখন বটতলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয় তখন ছাত্র ইউনিয়নকে সেখানে ডাকেনি ছাত্রলীগ। তাদেরকে বাইরে রাখা হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের অপর একটি জায়গায় আলাদা কর্মসূচি পালন করছিল।

সেখানে কেবল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চার নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই পতাকা তুলে ধরা নিয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তথা ছাত্রলীগের মধ্যে বিতর্ক ছিল। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, না কি সেটা ছিল তাৎক্ষণিক একটি আবেগের প্রকাশ তা নিয়ে এখনও নেতাদের অনেকেই বিতর্ক করেন।

২ মার্চ ১৯৭১ হাজার হাজার ছাত্রদের সমাবেশ ঘটেছিল বটতলায়। স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহুত ছাত্র সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নূরে-এ আলম সিদ্দিকী ও জনাব শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর ভিপি, জি, এস জনাব আ. স. ম. আব্দুর রব ও জনাব আব্দুস কুদ্দুস মাখন। সেখানে সমবেত ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ একজন শেখ জাহিদ মতান্তরে নজরুল ইসলাম, একটি পতাকা আ. স. ম. রবের হাতে তুলে দেয়। যেটাকে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা বলা হচ্ছে।

এই পতাকা উত্তোলন বা প্রদর্শন কী একটি তাৎক্ষণিক আবেগের প্রকাশ ছিল? জনাব আ. স. ম. আব্দুর রব বলেন, মোটেই না। এটা স্বাধীনতাকামী ছাত্র সমাজের পক্ষে ক্রিয়াশীল একটি গ্রুপের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফসল ছিল। জনাব আ. স. ম. রবের বক্তব্য অনুযায়ী '৬২-তে ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে একটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। '৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধের পরে

www.pathagar.com

বাংলার মানুষ বুঝতে পারে এই অঞ্চলের জনগণ কতখানি অবহেলিত। পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর পূর্বপাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে যে কোন চিন্তাই নেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ঘোষণা করেন এবং তার ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করতে শুরু করেন।

জনাব রবের মতে সেই থেকে মূলত বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে তারা সেই কাজটি শুরু করেন। তাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য নিয়ে ছবিসহ পোস্টার লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তারাই প্রথম জয় বাংলা শ্লোগান চালু করেন। শ্লোগান তোলেন 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।

চার নেতার (সেই সময়ে যাদেরকে চার খলিফা বলা হত) মধ্যে তৎকালীন ডাকসুর জি. এস. জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখন মারা গেছেন। জীবিত আছেন তিনজন। এদের মধ্যে একজন জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী এই নিউক্লিয়াসের সাথে জড়িত ছিলেন না। সে দাবি জনাব আ.স.ম. রবের এবং জনাব সিদ্দিকী তা অস্বীকার করেন না। তিনি বলেন এরকম একটা গ্রুপিং কেউ কেউ করেই থাকতে পারে, কিন্তু আন্দোলনের যিনি অবিসংবাদিত নেতা, শেখ মুজিব, তিনি এই গ্রুপিং অনুমোদন করতেন না। এই জন্যেই যারা ২ মার্চকে পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে দাবি করছে তারা ভুল করছে। কারণ বঙ্গবন্ধু ২৩ মার্চকে পতাকা দিবস হিসেবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেদিন সারাদেশে, সরকারি অফিস আদালতে এমনকি ক্যান্টনমেন্ট কোথাও কোথাও স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়েছিল।

জনাব আ. স. ম. রব বলেন, নূরে এ আলম সিদ্দিকীর এ দাবি যথাযথ নয়। '৭০-এর নির্বাচনে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বের এমন এক পর্যায় পৌঁছে ছিলেন যে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তিনি সেটা তাদের মধ্যে দিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় তিনি উপস্থিত হন এবং সেখানে স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠ করা হয়। তিনি এটাও উল্লেখ করেন, জনাব নূরে-এ আলম সিদ্দিকী ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজকে দিয়ে ইস্তেহার পড়ানো হলো কেন? জনাব রব বলেন এটা বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছানুসারে হয়েছিল।

জনাব রবের মতে নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আবদুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ ছিল যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে হাজার মাইল পেছনে পড়েছিল। এ জন্যেই ১২ আগস্ট ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উত্থাপিত স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হবার পরেও জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী সভাপতি হিসাবে রুলিং দিয়ে তা নাকচ করে দেন। কিন্তু সে কথা থাক। স্বাধীনতার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রলীগ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা তৎকালে রব গ্রুপ এবং নূরে আলম সিদ্দিকী গ্রুপ হিসাবে পরিচিত ছিল।

www.pathagar.com

মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার আহবান

১৯৭২ সালের ২১ জুলাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (সিদ্দিকী-মাখন) তিনদিনব্যাপী জাতীয় কাউন্সিল শেষ হয় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। সেখানে মুজিববাদ কায়েমের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ও সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্বোধনী মার্চ পাস্টের সালাম গ্রহণ করেন। 'বিশ্বে এলো নতুনবাদ-মুজিববাদ, মুজিববাদ;' 'এবার হলো মুজিববাদের বিপ্লব' শ্লোগানে প্যারেড মুখরিত ছিল। মঞ্চে মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছাড়াও ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও সিপিবি সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। প্রাক্তন ডাকসু সহ-সভাপতি ও ছাত্রলীগ নেতা, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ তার বক্তৃতায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক ভূমিকার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ না থাকলে স্বাধীনতা অর্জন বিলম্বিত হতো। সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং ডাকসু সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, সিপিবির আবদুস সালাম, জাতীয় শ্রমিক লীগ সম্পাদক আব্দুল মান্নান (এমসিএ) প্রমুখ।

সভাপতির ভাষণে নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া গণতন্ত্র অর্থবহ হয় না এবং রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া সমাজতন্ত্র অর্থহীন। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র শুধু ভোট দেওয়া নয়। মানবতা প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমরাও সমাজতন্ত্র চাই, তবে গণতন্ত্র বাদ দিয়ে নয়।

এই সম্মেলনে শেখ শহিদ সভাপতি এবং এম. এ. রশিদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শফিউল আলম প্রধানকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান

একই সময় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ(রব-সিরাজ) সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। একই সাথে দেশে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার আহবানও জানানো হয়। শহীদ স্বপন কুমার চৌধুরীর পিতা হরিনন্দন চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে সম্মেলন উদ্বোধন করে ছাত্রলীগ সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া। তিনিই জয় বাংলা বাহিনীর সালাম গ্রহণ করেন। সম্মেলনে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদদের স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা ডাকসুর প্রাক্তন ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব শ্রেণীসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। একই সঙ্গে তিনি দেশে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। তিনি আমেরিকান সাহায্য গ্রহণ করায় সরকারের তীব্র সামালোচনা করেন। দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্য ও আমলাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এদের সহায়তায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

www.pathagar.com

কায়েম করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগ কখনও আপস করে না। কোনো হুমকি-ধমকিতে শোষিত জনগণের অধিকার আদায়ের পথ থেকে ছাত্রলীগকে সরানোও যাবে না। তিনি চোরাকারবারী ও কালোবাজারী বন্ধে প্রশাসনের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেন। দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্যের সম্পত্তির হিসাব সম্বলিত শ্বেতপত্র দাবিও করেন তিনি ।

আ স ম রব অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ (র-সি) কর্মীদের নির্যাতন করছে মুজিববাদীরা। হত্যা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আদমজীতে দাঙ্গা বাধিয়ে শ্রমিক হত্যায় জড়িতদের বিচারের দাবি জানান তিনি। কৃষি জমির পূর্ণ সামাজিকরণ দাবি করে তিনি আরও বলেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মাফ ও ১০০ বিঘা সিলিং করে সমস্যার সমাধান হবে না। মোজাফফর ও মনি সিংদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, অন্যদেরও সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলার অধিকার রয়েছে। সমাজতন্ত্রের এজেন্সি কারও একার নয়।

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ছাত্রলীগকে একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠনে রূপান্তরের আহবান জানান। একমাত্র তাহলেই আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রমুখী যাত্রা সফল হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত আলবদর নেতাদের রক্ষার চেষ্টা করছেন। সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন, সংবর্ধনা কমিটি সভাপতি মনিরুল ইসলাম, প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক রওশন জাহান সাথী প্রমুখ ছাত্রলীগ নেতারা।

বঙ্গবন্ধু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে যাননি, তিনি গিয়েছিলেন মুজিবাদীদের সম্মেলন, রেসকোর্সের মাঠে, বর্তমানে সোরাওয়ার্দী উদ্যানে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা অতঃপর সরাসরি বঙ্গবন্ধু এবং তার সরকার ও দলকে বিরোধীতা করতে শুরু করে। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর গঠিত হয় নতুন দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ।

জাসদের উত্থান

জাসদের উত্থান আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্বাধীনতার পরপর দেশে, বলা যায়, কোন বিরোধী দল ছিল না। ন্যাপ (মোজাফ্ফর), কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টি তো সে রকম চিন্তাই করেনি।

তবে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন দল-উপদল নানাভাবে শেখ মুজিবের আওয়ামলীগ সরকারের বিরোধিতায় সক্রিয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (যারা পরবর্তীতে সাম্যবাদী দল ও ওয়ার্কাস পার্টিতে সংগঠিত হয়েছেন) ও বিরোধীরা ছাড়াও বিশেষ করে সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছে। সরকার যতই গণতন্ত্রবিরোধী হয়ে উঠেছে বামপন্থীর রাজনীতিও গোপন ও সশস্ত্র পন্থায় সরকার বিরোধী হয়েছে। শাসক দল আওয়ামী লীগ, তার অঙ্গসংগঠন ও মুজিববাহিনীর মতো নানা নামের প্রাইভেট

www.pathagar.com

বাহিনী এদেরকে মোকাবিলা করতে পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করেও সফল না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জরুরী আইন জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করাই সঠিক বলে মনে করেছিল ক্ষমতাসীনরা। ঘরে বাইরের বিরোধীতা মোকাবিলা করতে রক্ষীবাহিনী গঠন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এসবই প্রমাণ করে দেশের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। ১৯৭২ সাল থেকেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে এ পর্যায়ে এসে ঠেকে। ৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি সর্বাহারা পার্টির নেতা সিরাজ সিকদারকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে ঢাকায় আনার পর অস্ত্র উদ্ধারের নামে সাভারে এনে গুলি করে হত্যা করা হয়। সম্ভবত এটাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নিরাপত্তা হেফাজতে বিনা বিচারে হত্যার প্রথম ঘটনা। তখন জাতীয় সংসদের দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দম্ভভরে হুংকার ছেড়েছিলেন, কোথায় আজ সিরাজ সিকদার। তিনি নকশাল দেখা মাত্র গুলি করার, লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেওয়ার মতো কথা বলেও বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। এ সময় সরকারি ও সরকার সমর্থক প্রাইভেট বাহিনীও সন্ত্রাসীদের হাতে কত হাজার বিরোধী নেতা-কর্মীর জীবন গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব কখনও পাওয়া যাবে না। এছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে চোরাচালান, রিলিফ চুরি, লাইসেন্স-পারমিটবাজী, রেশন কার্ড কেলেঙ্কারির মতো দুর্নীতির ঘটনা ঘরে ঘরে মানুষের মনে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। এসব কিছুর সঙ্গেই বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীনদের জড়িয়ে পড়া ছিল দিনের আলোর মতো পরিস্কার। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার নিয়ে মারামারি, খুনাখুনি, সন্ত্রাসে দেশজুড়ে ভেঙ্গে পড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী নামিয়েও ঘর সামলাতে দ্রুতই তা প্রত্যাহার করতে হয়েছিল।

প্রকাশ্যে জনসভায় দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি; ৭ কোটি কম্বল এসেছে কোথায় আমার কম্বল। এই অরাজকতার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা মূলত মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকলেও তা জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে বলা যাবে না। এর পিছনে বামরাজনীতির অনৈক্য, অন্তর্বিরোধ ও অবাস্তবতা বড় ভূমিকা রেখেছে। চীনপন্থী উপদলগুলো প্রকাশ্যে কাজ করতে না পেরে গোপনে চীনা বিপ্লবের অনুকরণে গ্রামভিত্তিক কৃষক আন্দোলন মুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও এগুতে পারে নি। অনেক স্থানে সরকারি বাহিনীর অভিযানে, সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে তারা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এ সময় দেশের কোনো কোনো স্থানে রক্ষী বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বাহিনী রক্তপাত ঘটিয়েছে বলেও তখনকার পত্র-পত্রিকায় (গণকণ্ঠ, নয়াযুগ, হককথা, গণশক্তিসহ দৈনিক ও সাপ্তাহিক) প্রকাশিত খবরে জানা যায়। এভাবে এই বামপন্থীদের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও

তখন জাসদ ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (জাসদপন্থী) বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে থাকে। বিভিন্ন বিষয় আজ বিতর্ক যতই হোক না কেন এ কথা সত্য বলে সবাই জেনেছে যে ছয় দফার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত যে ইতিহাস গড়া হয়েছে তা

www.pathagar.com

গড়েছে এদেশের ছাত্রসমাজ এবং স্বাধীনতার পরে এই ছাত্রসমজের সিংহভাগই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ছাত্রলীগের সাথে ছিল। বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাস জানতে হলে জাসদ ছাত্রলীগের এই ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

স্বাধীনতার পর নানাভাবে নানাকারণে তৎকালীন সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিল। জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলছিল তারা। জাসদ বা জাসদপন্থী ছাত্রলীগও তখন সরকারের সরব বিরোধীতায় নেমেছে। তখন যারা সরকারের ছিলেন বা এখনও আছেন তাদের অনেকেই মনে করেন জাসদের এই বিরোধীতাই আওয়ামী লীগ সরকারের কাল হয়েছিল।

কী হতো যদি জাসদ বা ছাত্রলীগ এই বিরোধীতায় না নামতো? ডাকসু ও ছাত্র ইউনিয়ন সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ইউসিস হামলার পর। কিন্তু তাদের সে বিরোধীতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। মূল দল কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন উপলব্ধি করে সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে এত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা ঠিক হয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টি তাদেরকে বোঝায় যে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তাদের মিত্র হতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। গঠিত হয় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। তারই আদলে ডাকসুতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্য হয়।

ত্রিদলীয় ঐক্য জোট

রাজনীতিতেও এই ধারায় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও মোজফ্ফর ন্যাপ মিলে গঠিত এই জোট সরকারপন্থী ভূমিকায় সচেষ্ট থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ সরকারকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এই মিলিত ধারাই পরবর্তীতে বাকশাল নামে আবির্ভূত হয়ে তবে এ নিয়ে মতবিরোধের কথাও জানা যায়। আওয়ামলী লীগের মতো কমিউনিস্ট পার্টিতে কেউ কেউ এটা সমর্থন করতে পারেননি। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য যেমন বাকশালে যোগ দেননি তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির মনিসিংহ, খোকা রায়, সত্যেন সেনের মতো প্রবীণ ও প্রভাবশালী নেতারও এভাবে বাকশালে পার্টিকে বিলীন করে দেওয়া বলে সঠিক মনে করেন। এর প্রতিবাদে খোকা রায়-সত্যেন সেন দেশ ত্যাগ করেন। এ নিয়ে পার্টির মধ্যে পুনর্মূল্যায়নের পরও অধনবাদী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই ধারা একেবরে শেষ হয়ে গেছে তা অনেকেই মনে করেন না।

আশাহত মানুষ : বিতর্কিত সরকার

এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র দু'বছর গত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা তখন হিমালয়ের চূড়া ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মাত্র দু'বছরে বঙ্গবন্ধু এবং তার সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তরুণ সমাজ, বিশেষ ছাত্ররা যারা '৪৮ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বিশাল সব বিজয়ের সৈনিক, তারা আশাহত

www.pathagar.com

হয়েছিল। তার প্রমাণ ১৯৭৩ এ ডাকসুর এ নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাহবুব জহুর পরিষদের কাছে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল বিশাল ভোটের ব্যবধানে হেরে যায়।

বঙ্গবন্ধু সরকার বা তৎকালীন নেতৃত্ব এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে মাত্র দুবছরই বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। তারা বাস্তবতাকে বোঝার চাইতে পেশীশক্তির উপরে নির্ভর করতে শুরু করেছিল। এর প্রমাণ হিসাবে সমগ্র দেশবাসী অতীব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলো যে, ডাকসু নির্বাচনের ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক হয়ে গেল। কারা করল এটা? তৎকালীন ডাকসুর ভিপি এবং বর্তমানে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে একাধিক আলোচনায় বলেছেন, যদিও আমরা সেদিন বিবৃতিতে বলেছিলাম, জাসদ ছাত্রলীগ এটি করেছে। কিন্তু সত্যি কথা হলো এই যে, আমরাই মানে মূলতঃ ছাত্রলীগ সেদিন এই হাইজ্যাকের কাজটি করেছিল। এই ঘটনা সারা দেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলেছিল। দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আর জিততে পারেনি। জেলার তথা দেশের বড় বড় কলেজগুলোতেও তারা হেরে যাচ্ছিল এবং আরও বেশ কয়েকটি ব্যালট বাক্স হাইজ্যাকের ঘটনা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক ছিল এই কারণে যে এর ফলে বিশেষ করে তরুণ সমাজ তথা ছাত্ররা প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে সরকার রক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। তাদের তান্ডবে মানুষের মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল। অতঃপর মানুষ দেখলো সেপ্টেম্বর মাসে ডাকসুর নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই হয়ে গেল।

স্পর্ধিত জাসদ

জাসদ তখন পর্যন্ত ছাত্রদেরই দল। ডাকসুর সহসভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব, জাসদের সাধারণ সম্পাদক আর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। দুই বছর পুরা হয়নি টগবগে যুবকের দল উন্নত ট্রেনিংপ্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করেছে। তখন তারা কাউকে পরোয়া করে না। কোন বিজয়কে অসম্ভব মনে করে না। যৌবনের সেই স্পর্ধায় জাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ. স. ম. আব্দুর রব বললেন, ঐ পার্লামেন্ট হচ্ছে শুয়োরের খোঁয়াড়। রক্ষি বাহিনীসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও এর কর্মসূচী দিলেন।

'৭৪ সালে ১৭ মার্চ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ করে জাসদের এবং তার সহযোগ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। হাজার হাজার জনতা সেদিন এই ঘেরাও কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাড়ির সামনে পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। হতাহত হয় অসংখ্য। জাসদ এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে এই ভাবে, দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন

www.pathagar.com

করবার সব সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। এখন 'গণআন্দোলনে ছেদ ঘটিয়ে একে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। গঠিত হয় বিপ্লবী গণবাহিনী, জাসদের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সশস্ত্র শাখা।

ছাত্রলীগের উপর এই সিদ্ধান্তের কী প্রভাব পড়েছিল? উত্তর স্বাভাবিক, 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'। ছাত্ররা ছাত্র সংগঠনের কাজ বাদ দিয়ে গোপন ও সশস্ত্র প্রক্রিয়ার কাজের সাথে যোগ দেবার জন্যে লাইন লাগিয়ে দিয়েছিল। ফলে ছাত্রলীগ অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

ছাত্র নেতৃত্ব থেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব

বাংলাদেশের মাথার ওপর ভারতের আসাম রাজ্য। এক সময় আসাম ছিল বঙ্গদেশের অংশ। স্বাভাবিকভাবেই অনেক বাঙালী জীবন-জীবীকার প্রয়োজনে আসামে পাড়ি জমিয়েছিল। এ প্রক্রিয়া যুগের পর যুগ ধরে চলছে। যা আসামে জাতিগত বিরোধ উস্কে দিয়েছে বার বার। এ নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামও কম হয়নি। বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৮ সালে আসামের মঙ্গলদই লোকসভা উপ-নির্বাচনে কয়েক লাখ অবৈধ অভিবাসী ভোটারের বিষয়াটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে ওঠে। এই ভোটার তালিকা পরিবর্তনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন বা আসুর সভাপতি প্রফুল্ল কুমার মোহান্ত ও সাধারণ সম্পাদক ভ্রিগু কুমার ফুকানের নেতৃত্বে অবৈধ ভোটার বাতিলের আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা আসামে। ১৯৭৯ সালে এই গণ আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন যোগ দেয়। অসমিয়াদের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলে ৬ বছর ধরে। এর মধ্যেই আন্দোলনের শক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয় সারা আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদ (AAGSP)।

১৯৮৩ সালের নির্বাচন বর্জন করে এই সংগঠনের নেতৃত্বে আসামের জনগণ। কংগ্রেস সরকার গঠিত হলেও দাবি পূরণ না হওয়ায় তা স্থায়ী হয়নি। আন্দোলনের মুখে অবশেষে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আসাম ছাত্র ইউনিয়ন ও গণ সংগ্রাম পরিষদের দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তি মতে '৮৩ সালের একতরফা নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্যসভা বাতিল করা হয়। সর্বদলের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথ খুলে যায়। সেই বছরের ১৩-১৪ অক্টোবর আসামের গোয়ালঘাটে আসাম ছাত্র ইউনিয়নের (আসু) ডাকে অসমিয়া জনগণের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আসাম গণ পরিষদ (AGP) নামে একটি নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। দুটি আঞ্চলিক দলসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনও এই দলে যোগ দেয়। দলটি ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজ্যসভার ১২৬ টি আসনের মধ্যে ৬৭ আসন এবং লোকসভার (পার্লামেন্ট) ১৪ টির অর্ধেক আসনে জয়লাভ করে। সাবেক ছাত্র নেতা প্রফুল্ল কুমার মহান্ত মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আসামের মূখ্যমন্ত্রী হয়ে ভারতের কনিষ্ঠতম মূখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হন। এই সরকার পরবর্তী নির্বাচনেও জয়ী হয়ে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

www.pathagar.com

ভিন্ন ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও মুক্তিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালনকারী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তারুণ্য নির্ভর রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদের সঙ্গে আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদের অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও শেষ পরিণতি হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীনতার পরপরই প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হলেও জাসদ মাত্র ৩ বছরের মাথায় বিপর্যয়ের শিকার হয়। আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ যেখানে গণআন্দোলনকে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম হয় সেখানে জাসদ বিপুল কর্মী বাহিনী ও জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পরে। এ জন্য অবশ্য গণতন্ত্র ধ্বংসকারী আওয়ামীলীগ সরকারের চলমান দুঃশাসন ও নির্যাতনকে দায়ী মনে করা হয়। সরকারের নির্যাতনের মুখে টিকতে না পেরে শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের নামে হঠকারীতার শিকার হতে হয় জাসদকে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে এখানে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ করার কোন অবকাশ নাই। সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। শ্রেণী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই স্বপ্নও ব্যর্থ হয়েছিল। অতএব, একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বছর তিনেক পরে জাসদের সেই যুবক ছাত্র যখন আবার বিশ্ববিদ্যালয় বা তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে এসেছিল তখন তার মধ্যে আর বিপ্লবের সেই অগ্নিশিখার তেমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ছাত্র সংগঠনও সে আর আগের মতো করতে পারলো না। পরাজিত, বিধ্বস্ত যুবক ছাত্রটি ক্যাম্পাসে ফিরে আসলো বাধ্য হয়ে। কিন্তু সে আর লেখাপড়ায় তেমন নিবিষ্ট হতে পারলো না।

কী হতে পারতো? একপাক্ষিভাবে এর মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। ছাত্রলীগ যে যথাযথভাবে বিকশিত হয়ে আসামের মতো উদাহরণ তৈরি করতে পারেনি তার মূল দায়িত্ব জাসদের উপরেই বর্তাবে। কিন্তু অনেকেই এরকম মনে করেন যে, বঙ্গবন্ধু যদি '৭২-এর সম্মেলনে রেসকোর্সে না যেতেন তবে ছাত্রলীগ ভাঙ্গতো না। জাসদও হোত না। ইতিহাস অন্যভাবে নির্মিত হতে পারতো। সেদিন যারা জাসদ গড়েছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আব্দুর রব এমনকি শাজাহান সিরাজ আজো বঙ্গবন্ধুকে নেতা মানেন।

কেউ কেউ এরকম মত পোষণ করেন যে, জাসদ যে হয়ে গেছে, হোক না। যেভাবেই হোক, তাতে ক্ষতি ছিল না। তখন সংসদীয় গণতন্ত্র চালু ছিল। ক্ষমতাসীন দল যদি তা চালু রাখতো তবে শক্তিশালী বিরোধী দল তো লাগতোই। জাসদ সেই বিরোধী দল হতো পারতো। জাসদও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক শক্তি। সংসদীয় পদ্ধতিতে দুটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল সরকারি ও বিরোধী দল হিসাবে থাকলে বরং পরবর্তীতে যেভাবে জামায়াতসহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি ও চেতনা সংগঠিত হলো তা হয়তো পারতো না। ইতিহাসের পরবর্তী গতিধারা সে কথাই বলে।

www.pathagar.com

সরকারী ও জাতীয় ছাত্রলীগ

সরকারী ছাত্রলীগের অবস্থা আমাদের খানিকটা আলোচনা করে নেওয়া উচিত। ৭২-এর জুলাই এ যখন পল্টন ময়দানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রিদের সম্মেলন হয় তখন একই সময়ে রেসকোর্স এ মুজিববাদী ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়েছিল, যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আমি আগে বলেছি প্রতিপক্ষ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রিরা তখন স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে সমাজ পরিবর্তনের জন্যে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করে যার পক্ষে ব্যাপক ছাত্রমত গঠিত হতে থাকে। সে তুলনায় মুজিবাদী ছাত্রলীগের পক্ষে বক্তব্য তেমন শাণিত ছিল না। যদিও জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম একজন ভদ্র, অমায়িক, সজ্জন ছাত্রপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং তিনি শেখ মুজিবের বোনের ছেলে ছিলেন। তার পরেও ছাত্রলীগ একটি আদর্শিক নৈতিক লড়াই গড়ে তুলতে পারেনি। সেই সময়েই ছাত্র লীগের নেতা কর্মীদের নামে পেশীবাজী, চাঁদাবাজী, মাস্তানীসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে থাকে। শেখ শহিদ ছাত্রপ্রিয় নেতা হলেও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। সংগঠনের মধ্যে অন্তর্কলহ, গ্রুপিং তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

৭৩-এর সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন আসে। শেখ শহিদ বিদায় নেন। মনিবুল হক চৌধুরী সভাপতি এবং শফিউল আল প্রধান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই কমিটি দায়িত্বে থাকতে থাকতে জাতীয় ও শিক্ষা অঙ্গণে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যা জাতীয় রাজনীতির চালচিত্র পাল্টে দেয়। ৭৩-এর প্রথম দিকে তৎকালীন রেসকোর্সে একটি জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্রলীগের কর্মীরা সেই মেলায় নিয়মিত চড়াও হতো। হুমকি, চাঁদাবাসীর ঘটনা গটে। নারী নির্যাতনের অভিযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই সব ঘটনায় ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ছাত্রলীগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর বিরোধীতা করে।

মহসীন হলে সাত খুন

৭৪-এর এপ্রিল মাসে মহসিন হলে ৭ খুনের ঘটনা ঘটে। একেবারে প্রত্যুষে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় কোহিনুরসহ সাত ছাত্রলীগ নেতা কর্মীকে। সকাল বেলা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেই লাশ মহসিন হলের পাশে পড়ে থাকে। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে। ৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীর হামলার কথা বাদ দিলে এত বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হয়নি।

www.pathagar.com

'৭৪ সালের ৪ এপ্রিল দিবাগত রাত সোয়া দুইটার দিকে মহসীন হলের টিভি রুমের সামনের করিডোরে একই সঙ্গে ৭ ছাত্রের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে উত্তপ্ত বুলেটের আঘাতে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সূর্যসেন হলের ৬৩৫ নম্বর রুমে নাজমুল হক (কোহিনূর) সহ ৪ জন ছাত্রলীগ কর্মী ঘুমিয়ে ছিল। রাত দেড়টার দিকে সূর্যসেন হলে প্রথম দু' তিনটা গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। এ সময় ১০-১৫ জনের একটি সশস্ত্র দল হলে ঢুকে সরাসরি পাঁচ তলায় গিয়ে প্রথমে ৬৩৪ নম্বর রুমের দরজায় ধাক্কা দেয় ও কোহিনূরের নাম ধরে ডাকে। সেখান থেকে ৬৩৫ নম্বরের কথা বলা হলে সে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোহিনূরকে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা মাত্র চারজনকেই 'হ্যান্ডস আপ' করে বের করে আনা হয়। একই সময় সশস্ত্র দলটির কয়েকজন ৬৪৮ নম্বর রুম থেকে আরও তিনজনকে 'হ্যান্ডস আপ' করা অবস্থায় নিয়ে আসে। তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আনার সময় কোহিনূর বার বার প্রাণে না মারার জন্য আকুতি মিনতি করতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দোতলায় ২১৫ নম্বর রুমের একজনকে চিৎকার করে ডাকা হলে ছেলেটি অবস্থা বেগতিক দেখে জানালা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে। সে রুমের দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা জানালা দিয়ে ওই ছাত্রকে গুলি করে। সৌভাগ্যবশত আহত অবস্থায় সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

আটক সাতজনকে পাশের মহসীন হলের টিভি রুমের সামনের করিডোরে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য, ঘটনাস্থলের অতি নিকটে একটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং কিছু দূরেই পুলিশ কন্ট্রোল রুম থাকলেও গোলাগুলির শব্দে কেউই এগিয়ে আসেনি। রাত একটা পঁচিশ থেকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে অপারেশন চালিয়ে হত্যাকারীরা বীরদর্পে স্থান ত্যাগ করে। আরও প্রায় আড়াই ঘন্টা পর পুলিশের দেখা মেলে।

নিহতদের পরিচয় :

১। নাজমুল হক কোহিনূর, ২য় পর্ব এম এ, সোশিওলজী, পিতা- নুরুদ্দিন আহমদ, গ্রাম- বেলাব, থানা- রূপগঞ্জ, ঢাকা।

২। মোহাম্মদ ইদরিস, এম. কম প্রথম পর্ব, পিতা-মরহুম মো. সিদ্দিক, ১১৫/১১৬, চক মোগলটুলী, ঢাকা।

৩। রেজওয়ানুর রব, প্রথম বর্ষ সম্মান, সোশিওলজী, পিতা-ফজলে রব, ৩৯/২, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, ঢাকা।

৪। সৈয়দ মাসুদ মাহমুদ, প্রথম বর্ষ সম্মান, সোশিওলজী, পিতা-সৈয়দ নাসিরুদ্দিন আহমদ, ৩৪ ঠাকুর দাস লেন, বানিয়া নগর, ঢাকা।

৫। বশিরুদ্দিন আহমদ (জিন্নাহ), প্রথম পর্ব এম কম, পিতা- মহরহুম মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ২৯ ডিস্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

৬। আবুল হোসেন, প্রথম বর্ষ সম্মান, সোশিওলজী, পিতা- আব্দুস সামাদ অ্যাডভোকেট, পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা।

৭। এবাদ খান, প্রথম বর্ষ সম্মান, সোশিওলজী, পিতা ইব্রাহীম খান, পাইকপাড়া, ধামরাই, ঢাকা।

www.pathagar.com

গ্রেনেড বিস্ফোরণে ছাত্রী আহত

মহসীন হলের সেই ভয়াবহ হত্যাকান্ডের মাত্র দুই দিন পর ৭ এপ্রিল দুই-দুইটি গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন পুনরায় কলংকিত করা হয়েছে। একজন ছাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়।

শফিউল আলম প্রধান সহ ৩ জন গ্রেফতার

মহসীন হল হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ বাংলাদশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। ৭ এপ্রিল রাতে ও ৮ এপ্রিল দুপুরে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের নাম (১) শফিউল আলম প্রধান, পিতা- গমিরুদ্দিন প্রধান, পঞ্চগড়, দিনাজপুর। (২) কামরুজ্জামান ওরফে কামরুল, ৩২/১০ শেরশাহসুরী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং (৩) মাহমুদুর রহমান ওরফে বার্চু, পিতা-মুজিবর রহমান, ২০/৬ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

এদিকে ছাত্রলীগের শোকসভায় সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানের গ্রেফতার প্রসঙ্গে উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, ছাত্রলীগ যখন দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেছে তখনই ছাত্রলীগ সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আওয়ামীলীগ কার্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ দলের সভাপতি জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নিকট ছাত্রলীগ সম্পাদকের মুক্তির দাবী জানান।

বাকশাল গঠন ও বঙ্গবন্ধু হত্যা

এই একটি ঘটনায় শাসক দল ও তার অঙ্গসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে থাকে। পরবর্তীতে মামলায় জনাব শফিউল আলম প্রধান এবং ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মীদের (যারা এই মামলার আসামী হিসাবে গ্রেফতার হয়েছিলেন) বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়।

১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে বাকশাল বিলের মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশে কায়েম হয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশে মাত্র একটি দল থাকবে যার নাম হবে বাকশাল এবং যার অঙ্গ হিসাবে থাকবে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মহিলাদের সংগঠন। সেই অনুসারে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, বিপ্লবী ছাত্র শক্তি এই চারটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় ছাত্রলীগ। জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। সংবিধান অনুসারে সব অঙ্গসংগঠনের প্রধান হিসাবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ছাত্রলীগেরও প্রধান থাকেন। অপরাপর সমস্ত সংগঠন বাতিল করে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে একটি ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়। তারপরও কিন্তু এতে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। মূল দল বাকশাল এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিভাত হয়। তার ছত্রছায়ায় জাতীয় ছাত্র লীগেরও কোন বিকাশ হয়

www.pathagar.com

না। ষড়যন্ত্র তার নখ-দাঁত বের করবার সুযোগ পায়। ১৫ আগস্ট রাতের বেলা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু যে রাতে নিহত হন সেই সকালে তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এই উপলক্ষে ছাত্রলীগ ব্যাপক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ তখন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় ছিল। তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে বলেছেন গভীর রাত পর্যন্ত তারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে কাজ করেছিলেন। শেখ কামালও সংগে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেই কালো রাতে যে কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা তাদের ছিল না। পর দিন সকালে রেডিওতে খবর শুনে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে যার মত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

এখন অনেকে অনেকভাবেই নিজেদের কীর্তি ও কৃতিত্ব জাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সত্যি এই যে, নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করতে তাদের অনেক সময় লেগে যায়। তবে তারা ধীরে ধীরে সংগঠিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিলও বের করেন। অনেকে গ্রেফতার হন। অনেকে কাদের সিদ্দিকির সাথে যোগ দেওয়ার জন্য দেশত্যাগ করেন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের এমন কোন তৎপরতার কথা তখন জানা যায় না।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতা দখল করেন। আওয়ামী লীগেরই বেশ কয়েকজন নেতা মোশতাকের মন্ত্রী সভায় সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। বিরাট বিভ্রান্তি নেমে আসে আওয়ামী লীগ মহলে। ক্ষমতা দখল করবার পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে মোশতাক জয়বাংলা শ্লোগান বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি দেন। বাংলাদেশ বেতার রাতারাতি রেডিও বাংলাদেশ হয়ে যায়। টিভিতে ও পত্র-পত্রিকার ছবিতে আচকান, পায়জামা, জিন্না টুপি পরিহিত মোশতাককে আপাদমস্তক একজন মুসলিম লীগের নেতা বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে ধর্ম নিরপেক্ষতাসহ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় মূল নীতি থেকে দেশকে ভিন্নপথে পরিচালিত করবার চেষ্টা চলছে।

আওয়ামী লীগ তখন বিপদগ্রস্ত, বিধ্বস্ত। ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নেতারা জান বাঁচাতে কিংবা মোশতাকের থাবা থেকে বাঁচতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেবল বেশ কিছু সময় নিয়ে ছাত্রলীগ নিজেদেরকে সংগঠিত করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোথাও কোথাও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করে।

সামরিক অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় জিয়ার আগমন

৩ নভেম্বর ১৯৭৫ অপর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা পরাজিত হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আওয়ামী লীগ বা তার সমর্থনকারী কোন গোষ্ঠী এই অভ্যুত্থান করেছিল। অভ্যুত্থানকারীরা জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু তিন দিন ধরে তারা কোন সরকার গঠন করতে পারেনি। ৭

www.pathagar.com

নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অভ্যুত্থানকারীরা জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আনে। সেই থেকে সরাসরি জেনারেল জিয়ার অভ্যুত্থান শুরু। তিনি প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন। অতঃপর হ্যাঁ-না ভোটে নিজেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন।

জিয়াউর রহমান পর্যায়ক্রমে নিজের জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নিজেকে এবং নিজের সরকারকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তিনি ঘরোয়া রাজনীতি চালু করবার ঘোষণা দেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পিপিআর এর অধীনে নিবন্ধন নেবার নির্দেশ দেন।

আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা ও নতুন ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তখনো বিপর্যস্ত। দলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে নিবন্ধিত করবার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এটি নিশ্চয়ই একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এ নিয়েও দলের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কারণ বিশেষ করে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তাকে কেন্দ্র করে আবেগ জমাট বেধে ওঠে, যাকে পিপিআর এর যুপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরেও বেশ কিছু দিন জাতীয় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরস্থ ছাত্র সংগঠনসমূহ বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন একসাথে কাজকর্ম করে। কিন্তু রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেলে তারা আলাদা হয়ে যায়। তখন ছাত্রলীগের কতিপয় নেতা কর্মী সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন করতে উদ্যোগী হয়। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বক্তব্য বলতে থাকে কেউ কেউ। শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমানদের এখানে ওখানে ছুটা ছুটি করতে দেখা যায়। একটি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার কথা উল্লেখ করেন অনেকে।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ লালবাগের শায়েস্তা খান হলে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগের এই সম্মেলন। এখানে আওয়াল-জালাল ও সারওয়ার-ফজল কে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের দুটি আলাদা প্যানেল গঠিত হয় এবং এক পক্ষ আর এক পক্ষকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে। ১৯৭৮-এর জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রাজ্জাক কারাগার থেকে মুক্তি পান। তার মুক্তির পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের ঐক্যবদ্ধ সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জনাব আওয়ালকে এক মাসের জন্য সংগঠনের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয় এবং জনাব বাহালুল মজনুন চুন্নকে সম্মেলন প্রস্তুতি পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে তীব্র গ্রুপিং দেখা দেয়। পাঁচ দিন ব্যাপি কোন প্যানেল তৈরি করতে ব্যর্থ হয় সাবজেক্ট কমিটি। অবশেষে জনাব আব্দুর রাজ্জাকের সরাসরি হস্তক্ষেপে জনাব ওবায়দুল কাদেরকে সভাপতি এবং জনাব বাহালুল মজনুন চুন্নকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এতেই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসন হয় না। গ্রুপিং তীব্র হয়ে দেখা দেয় আওয়ামী লীগের মধ্যে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ছাত্রলীগের মধ্যে। ছাত্রলীগের একটি অংশের মতে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব শেষ হয়ে যায়নি। এখন এই চলমান জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হবে। এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, এস এম ইউসুফ, সৈয়দ আহমেদ, শফিকুল আজিজ মুকুল প্রমুখেরা। অপর দিকে ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব আমির হোসেন আমু প্রমুখ।

১৯৮০ তে আবার ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রমনা পার্কে। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রুপিং এর কারণে সেই সম্মেলন নতুন কমিটি নির্বাচনে ব্যর্থ হয়। অতএব সাবেক কমিটি কাদের-চুন্নু বহাল থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৮১-এর ১৭ মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। ৩১ আগস্ট '৮১ আবার ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মস্ত এক নাটক জমে উঠে। প্যানেল প্রস্তাব করবার জন্যে ১ সেপ্টেম্বর সাবজেক্ট কমিটি কয়েক দফা বৈঠকে বসে। কিন্তু তারা কোন প্যানেল প্রস্তাব করতে ব্যর্থ হয়। প্রচণ্ড গোলমাল ও মারামারি হয়। হামলার কারণে সাবজেক্ট কমিটি আর বসতে পারেনি। ২ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা উভয় গ্রুপ থেকে পাঁচ করে নিয়ে মোট দশ জনের ওপরে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব দেন। নাটক আরো জমে ওঠে। এক গ্রুপের নেতা ফজলুর রহমান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেখ ফজলুল করিম সেলিম, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাসহ আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা বিশেষভাবে সক্রিয় হন। তাদের চেষ্টার ফলে ঐ দশজন সদস্যের একজন গোপনে পক্ষ পরিবর্তন করেন। ফলে ৬-৪ ভোটে জালাল-জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিপক্ষরা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন, তারা একে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন এবং জনাব ফজলুর রহমানকে সভাপতি এবং বাহালুল মজনুন চুন্নুকে সাধারণ সম্পাদক করে পাল্টা ছাত্রলীগের প্যানেল ঘোষণা করেন। জনাব জাহাঙ্গীর কবির নাককে এই প্যানেলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জনাব সুলতান মোঃ মনসুরকে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮৩ তে আবার সম্মেলন হয় এই ছাত্রলীগের। এই সম্মেলনে জনাব ফজলুর রহমান আবারো সভাপতি এবং মিঃ মুকুল বোস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এত দিন পর্যন্ত ছাত্রলীগের উভয় শাখা আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছিলো। কিন্তু '৮০-এর ১ আগস্ট আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের কোন্দল নিয়ে বিস্তীর্ণ আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি এ জন্যে ছাত্রলীগ ফজলু-মুকুলকে দায়ী মনে করে তাদেরকে আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে অস্বীকার করে।

এ কথা সবাই জানেন এযাবত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনাব আবদুর রাজ্জাকের সাথে ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা আসবার পর

www.pathagar.com

থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। খোদ আবদুল মালেক উকিল এবং আবদুস সামাদ আজাদ পক্ষ পরিবর্তন করে ফেলেন। ১ আগস্টের আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অধিকাংশের ভোটে ছাত্রলীগের কোন্দলের জন্যে জনাব আবদুর রাজ্জাক, মহিউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ, এস এম, ইউসুফ সহ ৭/৮ জনকে দায়ী সাব্যস্ত করে তাদের সাসপেণ্ড করে এবং কেন তাদের চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করে।

৮১ তে গোটা সংগঠনের আশা ও ঐক্যের প্রতীক হিসাবে শেখ হাসিনা ফিরে এলে তিনিও বিতর্কিত হয়ে পড়েন। ছাত্রলীগের নেতারা বক্তব্য দিতে থাকেন, 'রক্তের উত্তরাধিকার নয়, আদর্শের অঙ্গীকার চাই।'

নতুন বাকশাল গঠন, জাতীয় ছাত্রলীগের যাত্রা শুরু

১৫ আগস্টকে সামনে রেখে জনাব আবদুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবারো বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ-বাকশাল গঠন করেন। নবনির্বাচিত ফজলু-মুকুল ছাত্রলীগ বাকশালের প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ফজলু-মুকুল ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব নূরুল ইসলাম সুজন সভাপতি ও জনাব নূরুল ফজল বুলবুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় সংগঠনের নাম পরিবর্তনের। জন্ম নেয় জাতীয় ছাত্রলীগ।

জাতীয় ছাত্রলীগের পরবর্তী ইতিহাস খুব লম্বা নয়। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র ছাত্রসমাজের যে আন্দোলন তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তারা। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাউফুন রাসুনিয়া আন্দোলনের মাঝে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন।

ডাকসু নির্বাচন ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন

স্বাধীনতার চার দশক পরে এসে দুই দশক পেছনের ছাত্র আন্দোলনের দিকে নজর দিলে একটি বিষয় সবার নজরে আসে। দুই যুগ আগে এরশাদের পতন হয়েছিল। অতঃপর দুই বছর বাদ দিয়ে এই দুই দশকে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থেকেছে। কিন্তু ডাকসুসহ কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন হয়নি। অথচ ক্ষমতার প্রায় একদশকে এরশাদের আমলে দুইটি ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালের ২৩ জানুয়ারি যাতে সুলতান-মোশতাক পরিষদ জয়যুক্ত হয়।

বিভিন্ন কারণেই ডাকসুর এ দুটি নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম নির্বাচনে ১৫ দলপন্থী ছাত্রসংগঠনসমূহ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। কারণ ইতিমধ্যেই একদশক আগে গঠিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ব্যাপক ছাত্রসমর্থন লাভ করেছিল। যার মোকাবিলা করা কোন ছাত্রসংগঠনের পক্ষে এককভাবে সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যেও তখন শক্তিসাম্যে পরিবর্তন এসেছে। শুরুতে জাতীয় ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের চাইতে শক্তিশালী থাকলেও পরবর্তীতে তারা শক্তি হারাতে থাকে। নেতা-কর্মীরা ফিরে যেতে থাকে আওয়ামী ছাত্রলীগে। শুরুতে যে জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং সুলতান মোঃ মনসুর জাতীয় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন তারা ততদিনে ছাত্রলীগে ফিরে যান। এই সুলতান মনসুরই ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে ডাকসু ভিপির মনোনয়ন পান। জাতীয় ছাত্রলীগ বুলবুল-স্বপনকে নিয়ে দর কষাকষি করবার চেষ্টা করলে তাতে কেউ কোন আমল দেয় নি।

প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন তো জাতীয় আন্দোলনের প্রতিচ্ছায়া ছিল। জাতীয় ক্ষেত্রে প্রধান নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। শুরুতে যত শক্তি নিয়েই বাকশাল শুরু করুক না কেন, আবদুর রাজ্জাক তার সমান ছিলেন না। দিন দিন ছোট হচ্ছিলেন তিনি। ৯০-এ এরশাদ সরকারের পতনের সময় মনে হচ্ছিল শেখ হাসিনা জয়ী হয়েছেন। আবদুর রাজ্জাকে অন্যান্য নেতাদের থেকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছিলো না।

আওয়ামী লীগে বিলীন বাকশাল

এরশাদের পতনের পর যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হলো তাতে আওয়ামী লীগ জিতলো ৯৬টি আসনে আর বাকশাল পেল মাত্র ৫টি। বাকশালের নেতা-কর্মীরা বুঝলো যে ছোট হয়ে এসেছে তাদের পৃথিবী। নেতারা আওয়ামী লীগে ফিরে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। ১৯৯১-এর ১৪ আগস্ট বাকশালের বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলো যাতে প্রধান অতিথি হয়ে আসলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগে বিলিন হয়ে গেল বাকশাল।

এরই সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল জাতীয় ছাত্রলীগের এক দশকের ইতিহাস।

www.pathagar.com

জেনারেল জিয়ার উত্থান এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর একটি পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। ১৫ আগস্ট যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সামারিক বাহিনীর অফিসাররা সহ্য করতে পারছিল না। কারণ ১৫ আগস্টের পর তারা কোনও আর্মির চেইন অব কমান্ড মানছিলো না। ৩ নভেম্বর সকালে খালেদ মোশাররফ ও তার বড় ভাই রাশেদ মোশাররফের মায়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। জনাব রাশেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন এবং পরবর্তীতে ভূমি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান জেনারেল জিয়াকে বন্দী করে এবং খালেদ মোশাররফ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে সবার কাছে এরকম প্রতীয়মান হয়েছিল যে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের পক্ষে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবত ব্যাপার তা ছিল না। কার্যত ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত অভ্যুত্থানকারীরা কোন সরকার গঠন করতে পারেনি। দেশে এক ভয়াবহ শূন্যতা চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বর সিপাহীদের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। সিপাহীরা জেনারেল জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনে। সেই থেকে শুরু হয় জেনারেল জিয়ার বিস্ময়কর উত্থান।

এই পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে, তবে, জিয়ার উত্থানকে কোন বাঁকা চোখে দেখার সুযোগ নেই। ২৭ মার্চ ১৯৭১ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণা পাঠ করবার পরেও সেই সময় পর্যন্তও তাকে অন্য কোনভাবে দেখার অবকাশ আমাদের হয়নি। নিজেকে কখনও স্বাধীনতার ঘোষণাকারী বলে দাবি করতেও দেখা যায়নি তাকে। যে ৩ নভেম্বরের কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি সেই সময়ও বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দীত্ব বরণ করা ছাড়া তার আর কোনও গন্তব্যও ছিল না। এমন কি যে ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন সেখানেও তার কোন ভূমিকা ছিল বলে দেখা যায় না। অথচ সেই জিয়াই ৭ নভেম্বরের পর থেকে অসাধারণ যোগ্যতায় দেশের সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেন।

ব্যক্তি জিয়াউর রহমানকে আমরা তেমন একটা জানি না। কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি একজন অসাধারণ সংগঠক ছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে জনদল, জাগদল, ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট গঠন করেন। অথচ এর কোনটারই সাংগঠনিক কাঠামোতে তিনি ছিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি রেফারেন্ডামও করিয়ে নেন। ক্যান্টনমেন্টে থেকে উর্দি পরে তিনি এসব করেন এবং সবশেষে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেন।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান যে রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন সেটা তার সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে যাত্রার শুরুতে বোঝা যায়। '৭৬-এর শেষের দিকে সম্ভবত সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন শিক্ষক-অভিভাবকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে। ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। জিয়াউর রহমান নির্দিষ্ট সময়ই টি, এস, সিতে এসে পৌছান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে জনাব ফজলুল হালিম চৌধুরী তাকে রিসিভও করেন এবং তাকে সভাকক্ষে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু জেনারেল জিয়া হঠাৎ করে উল্টো ঘুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের দিকে হাঁটা দেন।

ছাত্র প্রতিরোধের মুখে জিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন জাসদপন্থী ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সক্রিয় ছিলো। তারা আগে থাকতেই জেনারেল জিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আসার খবর জানতো। তাদের মধ্যে এই রকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইতে পারেন। কারো কারো ভিন্নমত ছিলো। তারা মনে করতেন নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁর রক্ষিরা এরকম করতে দেবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগঠনের নেতারা বসেছিলেন এবং তারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে যদি জেনারেল জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করেন তবে তারা বাধা দেবেন। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। অতএব যখন জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় ঢোকার উদ্যোগ নিলেন তখন তিনি ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে পড়লেন। হাজার হাজার ছাত্র মাটিতে শুয়ে পড়ে যেন কোন সেনানায়ক উর্দি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

জাসদ ছাত্রলীগের ঢাবি শাখার তৎকালীন সভাপতি

মিয়া মো. ফেরদৌস প্রসঙ্গটি নিয়ে বলেন, জেনারেল জিয়ার ঢাবি ক্যাম্পাসে আগমণের খবর ২৫ অক্টোবর রাতে প্রথম জানালেন এস এম হল জাসদ ছাত্রলীগ নেতা হান্নান ফিরোজ (বর্তমানে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি)। জানা গেল, জিয়া আসছেন টিএসসিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে। এর কিছু সময় আগে বিতর্কিত সামরিক বিচারে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। সেসময় স্বভাবতই জিয়ার প্রতি ছাত্র সমাজের একটি বিরোধী মনোভাব কাজ করছিল। ছাত্র নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফজলুল হালিম চৌধুরীর কাছে গেলেন জানতে, কেন এই আগমন? ফজলুল হালিম চৌধুরী বললেন প্রস্তাবটি Army'র কাছ থেকে এসেছে, এ বিষয়টার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনরকমভাবে সম্পৃক্ত নন।

যা হোক পরদিন ঠিক পৌনে নয়টায় শৃঙ্খলাবদ্ধ তিন হাজার ছাত্র ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, এ্যান্টি মিলিটারি পোস্টার ও স্লোগান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে অবস্থান নিল। সব হলের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারীরা আসলেন। মহসীন হলের কাসেম (বর্তমানে নিউইয়র্কে), বাবু, নূর মোহাম্মদ (প্রাক্তন আইজি),

www.pathagar.com

শফিকুর রহমান পাটোয়ারী(বর্তমানে সচিব হিসেবে কর্মরত), আতাউল গণি ফারুক, কামরুল, জিয়াউদ্দিন বাবলু (পরবর্তীকালে মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টি নেতা) সহ আরো অনেকে উপস্থিত হলেন।

টিএসসির গেটে ঠিক নয়টায় অফ হোয়াইট বা ক্রিম কালারের একটি সাফারী ও চোখে চিরাচরিত কালো সান গ্লাস পরিহিত জিয়া নামলেন। তাকে রিসিভ করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধিদের চমকে দিয়ে তিনি আকস্মিক তার আগমনের বিরোধীতাকারী ও প্রতিবাদরত বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দিকে এগোতে শুরু করলেন। বিক্ষোভকারীরা বৃষ্টির মতো ইটের খোয়া নিক্ষেপ করছিল। তবু জিয়া থামলেন না। এতে তিন হাজার ছাত্রের বেশীর ভাগ অংশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে মধুর ক্যান্টিন ও বটতলা এলাকায় অবস্থান নিল।

ছাত্ররা এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে 'কানার বাচ্চা, Killer of Coronel Taher' বলেই ঝাঁপদিয়ে জিয়ার কালো চশমা কেড়ে নেয়। সে সময় জিয়ার নিরাপত্তারক্ষীরা বার বার এগিয়ে এলেও জিয়া তাদের এ বিষয়ের বাইরে থাকতে নির্দেশ দেন।

সে সময় ইউরোপ-আমেরিকার স্টুডেন্ট মুভমেন্ট-এ একটি চল ছিল, ছাত্ররা প্রতিরোধের এক পর্যায়ে রাস্তায় শুয়ে পড়তো। একই আদলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরাও সকলে শুয়ে জিয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিল। তবু জিয়া ক্যাঙ্গারুর মতো একপা একপা দিয়ে লাফিয়ে ছাত্রদের এড়িয়ে, ডিঙ্গিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে থামাতে সকলে বালু ছোঁড়া শুরু করলো। এক খাবলা বালু জিয়ার মুখে পড়লে জিয়া হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। একই সঙ্গে তার নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে পাঁজাকোলা করে টিএসসিতে নিয়ে যান। সেখানে অনুষ্ঠান যথারীতি পালিত হয়। তবে বিক্ষোভকারীদের পরবর্তীতে এর জন্য কোনরূপ সাজা পেতে হয় নি।

জেনারেল জিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারেননি। প্রশ্ন হলো তিনি এরকম করে ঢুকতে চাইলেন কেন? তাঁর জন্যে এটা কি এমন প্রয়োজন ছিলো? এটা কী এক সামরিক অফিসারের অজ্ঞতাজনিত আচরণ? নেহায়েতই একটা খেয়াল? এরকম ধরে নেওয়া যেতো। কিন্তু পরবর্তীতে যেভাবে তিনি তাঁর ছাত্রদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তা থেকে এতো সোজাভাবে তাকে নেওয়ার অবকাশ থাকে না। বোঝা যায় শুরু থেকেই তিনি রাজনীতির ব্যাপারে ভাবছিলেন। রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে ভাবছিলেন। গভীরভাবে ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলোর চিন্তা তাঁর মাথায় ছিলো।

রাজনৈতিক দলের পুনর্জন্ম

১৯৭৫-র ১৫ আগস্টের পর বাকশাল নামে যে দলটি তৈরি হয়েছিল, তা আর পুনর্জ্জীবিত করা হল না। আবার আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপ (মো.) দলগুলি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করল। জিয়াউর রহমানও সেনা পোশাক পরে রাজনৈতিক দল করলেন 'জাগদল'। সম্পূর্ণ অপরিচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হল এই দল। তারা সকলেই ব্যবসায়ী বা সাবেক আমলা। আওয়ামী লীগ ছত্রভঙ্গ। প্রথমে আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নিলেন প্রয়াত তাজউদ্দিন আহমদের বিধবা পত্নী জোহরা

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন। পরে সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করল- সভাপতি প্রয়াত মালেক উকিল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। ঘটনা প্রবাহ থেকে মনে হয়, এই সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে অবস্থান করলেও, জিয়ার সামরিক সরকারের সঙ্গে কিছুটা সমঝোতা রক্ষা করে চলছিল। জিয়ার হ্যাঁ-না ভোট কোনো কোনো দল 'না' তে ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সিপিবি ও ন্যাপ (মো)-এর ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তারা জিয়ার সরকারকে এক ধরনের সমর্থন দিয়েছিল। জিয়া যে ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ন্যাপ (মো.) তাকে সমর্থন জানায়। জিয়ার বহুল প্রচারিত খালকাটা কর্মসূচিতে সিপিবি ও ন্যাপ (মো.) অংশগ্রহণ করে। সিপিবির এমন রাজনৈতিক আচরণ প্রসঙ্গে সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড অনিল মুখার্জীকে জিজ্ঞাসা করা হলে। তিনি বলেছিলেন, 'জিয়া হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের লাস্ট লিংক'। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য জিয়াকে ধরে রাখতে হবে। কিন্তু এত করেও সিপিবি রক্ষা পায়নি। এক পর্যায়ে সিপিবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল এবং সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ গ্রেফতার হয়েছিলেন। সিপিবি এমন কোনো বিপদজনক হয়ে ওঠেনি যে, জিয়াকে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে কেন তিনি তা করলেন জিয়া? মনে হয় তখনকার শীতল যুদ্ধের যুগে মার্কিনীদের তুষ্ট করার জন্য মস্কোপন্থী দলের বিরুদ্ধে কিছু একটা পদক্ষেপ দরকার মনে করেছিলেন জিয়া।

জিয়ার দল গঠন

৭৭-এ যখন জাগদল গঠিত হয় তার আগে-পরে জেনারেল জিয়া সারাদেশ চষে বেড়ান। গ্রামের রাস্তা ধরে অজস্র মাইল হাঁটেন তিনি। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে খালও বানান দীর্ঘদিন। আর অনেকেই খেয়াল করেননি। ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদের সাথে কথা বলেন তিনি। যেই জেলাতে গেছেন সেখানকার বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কলেজের প্রিন্সিপাল বা কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ছাত্রদের ডেকে পাঠাতেন তিনি। দেশের পরিস্থিতি যে বদলে গেছে সে কথা বলতেন তাদের। বলতেন, উৎপাদনমুখি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা।

এরকম একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন এমন এক ছাত্রনেতা আমাকে বলেছেন, জিয়াউর রহমান শুধু যে বলতেন তা নয় তিনি শুনতেনও ছাত্রদের কথা। বেশির ভাগ বামপন্থী দলের পরাজিত খণ্ড হয়ে যাওয়া ছাত্রসংগঠনের নেতারা যেতেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তারা সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কথা বলতেন। জিয়া তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন এসব শব্দের মানে কী। ছাত্র নেতারা ব্যাখ্যা করতেন। দেশব্যাপী এসব বৈঠকে যোগ দিয়েছিল জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং জাসদপন্থী ছাত্রলীগের কর্মীরাও। তারা বলত তাদের রাজনীতির কথা, বাকশাল বিরোধীতার কথা। জিয়া বলতেন, কিন্তু তোমরা এতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, আলাদা আলাদা দলে থেকে এগুলো করতে পারবে? এজন্যে সব জাতীয়তবাদী শক্তিকে এক হতে হবে। এক বৈঠকে জিয়ার সাথে বসা কর্নেল মুস্তাফিজ এক ছাত্রনেতাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এ কিন্তু নক্‌শাল। জিয়াউর রহমান জবাব দিয়েছিলেন, বাকশাল ঠেকাতে আমার তো নকশালই লাগবে। এক বছরের বেশি সময় ধরে এই চেষ্টার পর ১৯৭৯ সালের ১

www.pathagar.com

জানুয়ারি জেনারেল জিয়া সমর্থিত নতুন ছাত্র সংগঠন জাতীয়তবাদী ছাত্র দলের কমিটি ঘোষণা করা হয়। কাজী আসাদ এর প্রথম আহ্বায়ক নিযুক্ত হন।

কিভাবে গঠিত হলো ছাত্রদলের কমিটি? এটা কি জিয়াউর রহমান নিজেই ঠিক করেছিলেন? এই প্রশ্নের জবাব, গোয়েন্দা সংস্থা এন. এস. আই জিয়াউর রহমানের এই প্রয়াসের সাথে সবসময় ছিলো। এন. এস. আই-এর ডি জি জনাব সাফদার ছাত্রদলের এই প্রথম কমিটিটি তৈরি করে জেনারেল জিয়াকে দেন। জাতীয় ও ছাত্রদের রাজনীতিতে সেই প্রথম গোয়েন্দা সংস্থা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

এই কমিটি এক বছরের মতো কাজ করেছে। অতঃপর ৭৯-র শেষে অথবা ৮০-র প্রথমেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বর্তমানে টাঙ্গাইল মাওলানা ভাসানী কলেজের প্রিন্সিপাল খন্দকার এনামুল করিম শহীদ প্রেসিডেন্ট, একেএম গোলাম হোসেন, বর্তমানে অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু সম্মেলনের পরপরই সংগঠনের মধ্যে প্রচণ্ড গ্রুপিং দেখা দেয়। তৎকালে এক ছাত্রদল নেতার কাছ থেকেই আমি শুনেছি এক সভার মধ্যে কেউ একজন প্রতিপক্ষকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখায়। এই খবর জেনারেল জিয়ার কাছে পৌছায় এবং জেনারেল জিয়া প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই কমিটি বাতিল করে দেন। ঐ ছাত্র নেতার বক্তব্য অনুযায়ী জিয়া ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আরও কোন সন্ত্রাসী আছে কিনা তা খুঁজে দেখার জন্যে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। অনেক নেতাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। অনেককে দেশ থেকেও বের করে দেওয়া হয়।

গোলাম সরওয়ার মিলনকে আহ্বায়ক করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পরবর্তী কমিটি ঘোষণা করা হয়। ততদিনে বিএনপি গঠিত হয়েছে। ডঃ বি. চৌধুরী জাতীয়তাবাদী দলের প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে গোলাম সরওয়ার মিলনকে আহ্বায়ক বানানোর ক্ষেত্রে জনাব বি. চৌধুরী বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ৩১ মে ১৯৮১ ছাত্রদলের পরবর্তী কাউন্সিলের তারিখ নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জিয়া সামরিক বাহিনীর একটি গ্রুপের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে ছাত্রদলের সম্মেলন পিছিয়ে যায়।

বিভিন্ন সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দায়িত্ব পালন করেছেন যারা

পদবী	নাম	সময়কাল
আহবায়ক	কাজী আসাদুজ্জামান	০১-০১-৭৯
যুগ্ম আহ্বায়ক	খন্দকার এনামুল করিম শহীদ	১৫-১১-৭৯
সভাপতি	খন্দকার এনামুল করিম শহীদ	১৫-১১-৭৯
সাধারণ সম্পাদক	আ. ক. ম. গোলাম হোসেন	
আহ্বায়ক	গোলাম সারোয়ার মিলন	
সভাপতি	গোলাম সারোয়ার মিলন	০৬-১২-৮১

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদক	আবুল কাশেম চৌধুরী	২৪-০৩-৮৩
আহ্বায়ক	আবুল কাশেম চৌধুরী	২৪-০৩-৮৩ ২৭-১২-৮৩
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	আবুল কাশেম চৌধুরী জালাল আহমেদ	২৭-১২-৮৩ ১৫-১২-৮৬
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	শামসুজ্জামান দুদু জালাল আহমেদ	২৭-১২-৮৩ ১৫-১২-৮৬
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	জালাল আহমেদ মাহবুবুল হক বাবলু	১৫-১২-৮৬ ২১-০২-৮৭
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	আসাদুজ্জামান রিপন মাহবুবুল হক বাবলু	২১-০২-৮৭ ০৯-০৩-৮৭
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	আসাদুজ্জামান রিপন আমান উল্লাহ আমান	১৪-০৩-৮৭ ০১-০৪-৯০
আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক	আমান উল্লাহ আমান সানাউল হক নীরু	০১-০৪-৯০ ১৬-০৬-৯২
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	রুহুল কবির রিজভী আহমেদ এ. ইলিয়াস আলী	১৬-০৬-৯২ ০৪-১০-৯২
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	ফজলুল হক মিলন নাজিম উদ্দিন আলম	০২-০৫-৯৩ ১৯-০৮-৯৬
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি হাবিব-উন-নবী সোহেল	১৯-০৮-৯৬ ০৩-১২-৯৮
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	হাবিব-উন-নবী সোহেল নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু	০৩-১২-৯৮ ২১-১২-২০০০
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু মোঃ সাহাবুদ্দিন লাল্টু	২১-১২-২০০০ ০৯-০৯-২০০২
আহ্বায়ক যুগ্ম আহ্বায়ক	মোঃ সাহাবুদ্দিন লাল্টু এ. বি. এম. মোশারফ হোসেন	০৯-০৯-২০০২ ৩১-১২-২০০২
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	মোঃ সাহাবুদ্দিন লাল্টু আজিজুল বারী হেলাল	০১-০১-২০০৩ ৩১-১২-২০০৪
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	আজিজুল বারী হেলাল শফিউল বারী বাবু	০১-০১-২০০৫ ৩১-০৬-২০০৯
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	সুলতান সালাউদ্দীন টুকু আমিরুল ইসলাম খান আলীম	০১-০৭-২০০৯ ০৩-০৯-২০১২
সভাপতি সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল হাবিবুর রশিদ (হাবিব)	০৪-০৯-২০১২

** ছাত্রদলের মূল ওয়েব পেইজ হতে প্রাপ্ত।*

www.pathagar.com

এরশাদের আগমন এবং ছাত্রদের আন্দোলন

১৯৮১ সালের ৩১ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জেনারেল জিয়া যখন নিহত হন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তখন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং বিচারপতি সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন। ৩ মাসের নির্দিষ্ট সময়ের পর দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ কামাল হোসেন এবং জেনারেল এম. এ. জি ওসমানিকে পরাজিত করে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

একজন বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে জনাব সাত্তার হয়তো খারাপ ছিলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে জিয়ার মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। বিচারপতি সাত্তার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। দলের মধ্যে সাত্তার বিরোধী একটি গ্রুপ ভেতরে ভেতরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় সামরিক বাহিনীর মধ্যে নড়া-চড়া পরিলক্ষিত হয়। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল হোসেইন মোঃ এরশাদ নিউজ উইক পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ ভূমিকা থাকা উচিত বলে দাবী করেন। বলা বাহুল্য দেশের প্রচলিত সংবিধানের পরিপন্থি ছিল তার এই দাবী। এটা সামরিক বাহনীকে ক্ষমতা দখলের জন্য একটি প্রত্যক্ষ উস্কানি ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার পত্রিকায় বিবৃতি দেবার পর থেকে জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলের নেতারা যেভাবে তর্ক সভা করেন সেভাবে ক্যান্টনমেন্টে সিপাহী জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তার বিবৃতির পক্ষে বক্তৃতা করে বেড়ান। তখনও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তেমন কোন প্রতিবাদ করা হয়নি, যার কারণে নির্বিঘ্নে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রায় নয় বছরের রাষ্ট্রক্ষমতায় তার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে এরশাদ এটা পারেন না। সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতো। কিন্তু নিজেদেরও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে তারা সেটা করতে পারেনি। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ব্যাপারটা বুঝেও না বোঝার ভান করেছে। তারা এ ব্যাপারেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি।

৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে জেনারেল হোসেইন মোঃ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। সংবিধান স্থগিত ঘোষণা ও সংসদ বাতিল করে দেওয়া হয়। মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি বহাল নেই বলে ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতা গ্রহণ করে আর দশটা সামরিক শাসকের মতোই এরশাদ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি জনগণকে জানিয়ে দেন যে, ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা নেই তা। যতি শিগগির সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন দিয়ে দেবেন তিনি।

www.pathagar.com

দুর্নীতির অভিযোগে ৫ মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন, আবুল হাসনাত, কে. এম ওবায়দুর রহমান, জেনারেল মাজেদুল হককে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় অভ্যুত্থানের খবর দিয়ে লেখা হয়, 'একটি গুলিও ফোটেনি, কোন রক্ত ঝরে নি... ইত্যাদি। স্বভাবতই রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ গড়ে ওঠেনি।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ

প্রথম প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে। সামরিক আইন এই মর্মে এক আদেশ জারি করে যে, কেউ প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে, আকারে-ইঙ্গিতে, ইশরায়-টিশারায় সামরিক শাসনের বিরোধিতা করলে তাকে ন্যূনপক্ষে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড-ভোগ করতে হবে। ডাকসুর ভিপি আকতারুজ্জামান, ছাত্রলীগের মুনীর, হাসিব, ছাত্র ইউনিয়নের আনোয়ারউল হক, মান্নান, ছাত্রলীগের জালাল, জাহাঙ্গীর, মুকুল বোস ছাত্র ঐক্য ফোরামের নূরুল কবির, অপর ছাত্র সংগঠনের মানু, বাদশা, ঢালী, ইশরারুল, গিরানী প্রমুখ নিজেদের মধ্যে বসাবসি করতে থাকেন। তারা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এ প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি দাবি করেন। এখনো সময় হয়নি বলে রাজনৈতিক নেতারা বিবৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ছাত্রনেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে শিক্ষা দিবস উপলক্ষে তারা বিবৃতি দেবেন, লিফলেট ছাড়বেন। ক্যাম্পাসে মিছিল করবেন না, কিন্তু একসাথে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করবেন। তারা ক্যাম্পাসে পোস্টার প্রদর্শনীরও সিদ্ধান্ত নেন।

এই ঘটনায় সামরিক প্রশাসন সতর্ক হয়। ১৬ তারিখ রাতেই ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিন্তু ছাত্ররা তাতে ভয় পায় না। ১৭ তারিখে তারা যথারীতি তাদের কর্মসূচি পালন করে। ছেলে মেয়েরা দল বেধে সামারিক শাসনের নিপীড়ন নির্যাতনের পোস্টার প্রদর্শনী দেখতে থাকে। পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রদের উপর। নেমে আসে নির্যাতন। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশে এটাই প্রথম প্রতিবাদ।

এরশাদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের পরবর্তী আন্দোলনের ঘটনা ঘটে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ৮ অক্টোবর জাসদপন্থি ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল করে। সেই মিছিলে হামলা হয়। এই হামলায় ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা দলে দলে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই এ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের সাথে যোগ দেয়। পাঁচ ঘণ্টা লাগাতার ছাত্র পুলিশে লড়াই চলে। পুলিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুল আমীন বেপারীর রুমে হামলা চালায়। তিনি এবং সেলিম, দেলোয়ার (পরবর্তী এই দুই জনকে এরশাদ সরকার ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যা করে) আহত হন। বিকেলে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। সেখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে শ্লোগান দেওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছাত্রদের এই আন্দোলন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়।

www.pathagar.com

কেউ কেউ এই ঘটনাকে হটকারী বলে আখ্যা দেন। এতসত্ত্বেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কার্যকর হয়ে ওঠে।

বছরের শেষের দিকে শোনা যায় যে, সরকার একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এ নিয়ে শিক্ষাঙ্গণগুলোতে উত্তাপ জমতে থাকে। ১৩ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল করে।

ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন

শিক্ষানীতি বাতিলসহ বিভিন্ন দাবীতে ডাকসুসহ ১৪ টি ছাত্র সংগঠনের ১১ জানুয়ারি ১৯৮৩-র কর্মসূচী রদবদল করাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে গোলযোগ ও হাঙ্গামা চলে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ডাকসু অফিস তছনছ করে। এক শ্রেণীর ছাত্রের হামলায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও কর্তব্যরত সাংবাদিকরা আহত হন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ কলাভবনের বটতলায় আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ হইতে আসা কয়েক হাজার ছাত্রের সমাবেশে ছাত্রলীগের মুনিরউদ্দিন আহমদ মিছিল নিয়ে সচিবালয় নয়, শহীদ মিনারের সামনে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এবং ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দাবী পূরণ না হলে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক শ্রোতা গাছের ডালপালা ভেঙ্গে হামলা শুরু করে। মারমুখী ছাত্ররা মাইক ভেঙ্গে ফেলে। নেতারা ছুটে এসে অপরাজেয় বাংলার পাশে দাঁড়ান। বটতলায় সভার সমাপ্তি পর্বে ছাত্রদের একাংশের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়। সেই সময় বটতলার পিছনের দিকের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফার রশিদ তালুকদার, সংবাদের ফটোগ্রাফার মো. আলম, নিউ নেশনের ফটোগ্রাফার পাভেল রহমান ছবি তোলার সময় কয়েকজন ছাত্র রশিদ তালুকদারের ওপর আক্রমণ করে ও তাকে মারধর শুরু করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তাদের কাছাকাছি স্থানে অবস্থানরত সংবাদের রিপোর্টার কাজী জাওয়াদ, কিষাণের ভার্সিটি রিপোর্টার গোলাম হায়দার রশিদ তালুকদারকে রক্ষার জন্য ছুটে যান। এ সময় আরো কিছু ছাত্র মোহাম্মদ আলম ও পাভেল রহমানের ওপর চড়াও হয়। সাংবাদিকরা দৌড়ে বাহির হয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের পিছন দিক হতে ধাওয়া করে। উপাচার্যের বাসার সামনের রাস্তা হতে দৈনিক সংগ্রামের ফটোগ্রাফার জেবুল আমিন দুলাল, দৈনিক বাংলার বাবু আনসারী এবং মো. আলম ছাত্রদের এ হামলার ছবি তুলছিলেন। ছাত্রের ধাক্কায় জেবুল আমিন দুলাল রাস্তার উপর পড়ে যান। পাশের রিপোর্টাররা তাকে তুলতে চেষ্টা করেন। বাবু আনসারী দৌড়ে তাকে ধরে ফেলেন। হাতাহাতি ধাক্কা-ধাক্কির ফলে দৈনিক বাংলার রিপোর্টার হাসান হাফিজ ও বাবু রাস্তার অপর পাশে চলে আসেন। এ সময় কয়েকজন ছাত্র তার হাত হতে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে রাস্তার অপর দিকে ছুঁড়ে মারে।

কলাভবন প্রাঙ্গণে সমাবেশ শেষে ১১ টা ১০ মিনিট হতে ১১ টা ৫৩ মিনিট পর্যন্ত মিছিল নিয়ে বের হওয়ার জন্য বারংবার অগ্রসর হওয়া, ঘুরে নেতাদের কাছে আসা মিছিল দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে যাওয়ার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে। পরে ডাকসু ও পরিষদের নেতৃবৃন্দকে সামনে নিয়ে মিছিল শুরু হয়।

www.pathagar.com

মিছিলটি কলাভবনের গেট দিয়ে রাস্তায় বের হয়ে সামনে পৌছলে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ শতাধিক সহকর্মী ও সমর্থকসহ স্যাভেজ রোড ধরে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হন। এক পর্যায়ে নেতৃত্ববিহীন বিরাট মিছিলের কয়েকজন কর্মী ছুটে গিয়ে নেতাদের ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হন। মিছিলের নেতৃত্ববিহীন অংশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কার্জন হলের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলটি হাইকোর্টের দক্ষিণের রাস্তায় প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয়ের সামনে পৌছলে মিছিলের মধ্য হতে পুলিশের দিকে ঢিল ছোঁড়া হয়। কিন্তু সামনে পুলিশ ব্যারিকেড পেয়ে মিছিলটি শিক্ষা ভবনের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা সেখানে ঘন্টা খানেক অবস্থান করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি

চৌদ্দ দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ জানুয়ারি, ১৯৮৩ এক বিবৃতিতে জানায়, সব মহলের আকাঙ্ক্ষা ও আহবান অনুযায়ী তারা শিক্ষা ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করে। মহল বিশেষের উস্কানির ফলে ঘোষিত কর্মসূচীতে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয় যে, আমাদের সচেতন প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং মহল বিশেষ বটতলায় সভা শুরু হতেই উস্কানির সৃষ্টি করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল সাংবাদিক ও আলোকচিত্রশিল্পীদের লাঞ্ছিত করে এবং ডাকসু কার্যালয় ও ক্যাফেটেরিয়া সহ ভবনের ক্ষতিসাধন করে।

শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন

১৫ জানুয়ারি এরশাদ সরকারের মন্ত্রী মজিদ খান শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। সম্ভবত পরিস্থিতির উত্তাপ টের পেয়েই জেনারেল এরশাদ ছাত্রদের সেই উত্তাপ প্রশমনের জন্যে ২৪ জানুয়ারি এক বক্তৃতায় বলেন, আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা কি চায় তিনি শুধু তা নাই জানতে চান। সেই অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থান নেবেন।

এরশাদের এই ভাষণের একদিন পরে খোন্দকার ফারুকসহ ৩ জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এরশাদ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্ররা। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে।

সেই সময় বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছিল, জেনারেল এরশাদের ছাত্রদের সঙ্গে বসবার জন্যে ভেতরে ভেতরে লবিং করছিলেন। ৩০ জানুয়ারি বেতার ও টিভিতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, তার সামরিক শাসন অপরাপর সামরিক শাসনের মতো নয়। তিনি দাবী করেন, আমরাই ছাত্র সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিতে পারি। ছাত্ররা তার প্রস্তাবকে আমলে নিতেই অস্বীকার করে। তারা তখন থেকেই বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মপরিকল্পনা করতে থাকে। সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষাভবন ঘেরাও এর কর্মসূচী গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

যদ্দুর মনে পড়ে এ ধরনের একটি কর্মসূচী ছাত্ররা গ্রহণ করেছিল ১১ জানুয়ারি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের প্রস্তুতির অভাবের কথা বলে কর্মসূচী পেছাতে বলে। ছাত্রদের একাংশের বিরোধিতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কর্মসূচী পিছিয়ে দেয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি বটতলা থেকে ছাত্রদের বিশাল মিছিল শিক্ষাভবনের দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রচণ্ড উত্তেজনা ছিল মিছিলে। মজিদ খানের শিক্ষানীতি তথা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে টগবগ করছিল ছাত্র তরুণরা। মিছিলকে ঠেকানো অসম্ভব বুঝে পুলিশ নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে মিছিলকারীদের উপর। জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল, কাঞ্চন মৃত্যুবরণ করেন। আহত হয় অসংখ্য। যদিও সরকার মাত্র একজনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে।

একজন ছাত্রের (সম্ভবত জয়নাল) লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় নিয়ে আসে ছাত্ররা। সেই লাশের খোঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালায় পুলিশ। ছাত্ররা পণ করে তারা পুলিশকে লাশ দেবে না কিছুতেই। লাশ লুকিয়ে ফেলে তারা। আর পুলিশ মরিয়া হয়ে তাড়া করে ছাত্রদের। কলাভবনের রুমে রুমে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও হামলা চালায় তারা। আটকে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের আর্ত চিৎকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তারা ছাত্রদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। সার্বিক পরিস্থিতির উপর আলোচনার জন্যে নেতারা ডঃ কামালের বাসায় পরের দিন (১৫ ফেব্রুয়ারি) বৈঠকে বসলে পুলিশ হামলা চালিয়ে ডঃ কামাল, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, কমরেড ফরহাদ, রাশেদ খান মেনন, সুধাংশু শেখর হালদার, শামসুদ্দোহা, দিলীপ বড়ুয়াসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের এই হামলা যখন চলছিল ঠিক সেই সময় শেখ হাসিনা উক্ত সভায় যোগ দিতে ডঃ কামালের বাসায় গিয়ে হাজির হন। তাঁকে একটি পুলিশ ভ্যানে ওঠানো হয় এবং ৩২ নং এ নিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দেশব্যাপী আন্দোলন

দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি হয়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। চট্টগ্রামে গুলি চলে। সরকার ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। ইতঃপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এক বছরের এরশাদ শাসনামলে '৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারি একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই ঘটনা ঢাকাসহ সারাদেশের ছাত্রদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে টানাপোড়েন ছিল তাও বহুলাংশে দূর হয়। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়াতে শুরু করে। বলা যায় এরশাদ-এর সামরিক শাসনবিরোধী যে আন্দোলন তার সূত্রপাত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। ক্ষমতাসীনরাও ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

এরশাদে ভাষণ : সমঝোতার প্রস্তাব

১৮ ফেব্রুয়ারি জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং তাতে তিনি সংহতি, সংলাপ ও সম্প্রীতির পথ অনুসরণের আহ্বান জানান। বললেন, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি সংলাপ করবেন। এর আগে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের চিনতেন না বলে জানিয়েছিলেন। এখন তিনি সেই নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার প্রস্তাব করলেন। সংলাপের তারিখটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ২৪ মার্চ, অর্থাৎ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের বর্ষপূর্তি দিবসে। ১২ মার্চ ভারত যাবার সময় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আগামী বছরের প্রথম দিকে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তার করা হবে এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।

এরশাদের ছাত্র সংগঠন

জেনারেল এরশাদ অতঃপর ২৬ মার্চে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ারও ঘোষণা দেন। কিন্তু তারপরও তিনি রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের কোন আস্থাই অর্জন করতে পারেননি। কারণ ঐ বক্তৃতার পরদিনই অর্থাৎ ২৭ মার্চ তিনি তাঁর ছাত্র সংগঠন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ গঠন করেন। সেই দিন থেকে জেনারেল এরশাদ যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ তার লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে কাজ করে। পাকিস্তান আমলে এন. এস. এফ যেমন আইয়ুব শাহীর গুণ্ডাবাহিনী হিসাবে কাজ করে জাতীয় ছাত্রসমাজও তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়।

জেনারেল এরশাদের উদ্দেশ্য বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। একদিকে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতি মুক্ত করার ঘোষণা দেন, আর একদিকে নতুন বাংলা ছাত্রসমাজকে সব রকম মদদ দিতে থাকেন। সম্ভবতঃ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর প্রথম হামলা চালায়।

কৌশলী পদক্ষেপ

এরশাদ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হননি। তার একটাই লক্ষ্য ছিল, নিজের জন্য রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা এবং ক্ষমতাকে নিশ্চিত করা। কৌশলের দিক দিয়ে তিনি যথেষ্ট নমনীয় ছিলেন। ৮৩ সালের প্রথমার্ধেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ১৯৮৫ এর মার্চে জাতীয় নির্বাচন হবে। তবে তার আগে স্থানীয় নির্বাচন হবে। পরবর্তীতে তিনি উপজেলা নির্বাচনের কথা ঘোষণা দেন। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো। এরশাদ সাহেব DFI-কে লেলিয়ে দিয়ে দল গড়ার চেষ্টা করেন। প্রথমে গঠিত হল নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ। তাদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করা হল DFI-এর মাধ্যমে। ১৯৮৩ সালেই তারা কয়েক দফা সশস্ত্র আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু সাহসী ছাত্ররা তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

ঘরোয়া রাজনীতি

ইতিমধ্যে ঘোষণা দেয়া হয় যে, ৮৩ এর পহেলা এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতি করা যাবে। আমাদের দেশের ইতিহাসে ঘরোয়া রাজনীতি হচ্ছে আরেকটি অভিনব বিষয়, যা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে। তারপর থেকে যে রুটিন সামরিক শাসকরা অনুসরণ করে আসছেন তা হল, প্রথমে কড়া মর্শাল ল, তারপর একটু ঢিলা মার্শাল ল, তখনই ঘরোয়া রাজনীতি, তারপর প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ আরও পরে বেসামরিক লেবাসে সেনাশাসন। এই শেষ পর্যায়ে অথবা ঘরোয়া রাজনীতির পর্যায়ে সামরিক শাসকরা রাজনৈতিক দল করার প্রস্তুতি নেন।

ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হবার আগেই অনেকটা বেআইনিভাবে ঘরোয়া বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮৩ এর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সাভারের স্মৃতিসৌধে পনেরো দলের নেতারা একত্রে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং প্রকাশ্য বক্তব্যও রাখেন। সামরিক শাসন ভাঙ্গার কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। নয় দফা সম্বলিত ১৫ দলের একটি দাবিনামা পাঠ করেন শেখ হাসিনা। এই নয় দফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি। সেদিন সাভারে সামরিক শাসন বিরোধী স্লোগানও উচ্চারিত হয়েছিল।

এদিকে ১৫ দল সারা দেশে সভা সমাবেশের কর্মসূচি নেয়। তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসভা নিষিদ্ধ ছিল, তবে ঘরোয়া সভা চলবে। সে অনুযায়ি ঘরের মধ্যে মঞ্চ হতো, বক্তারা সেখানেই থাকতেন, রাস্তার দিকে মাইক লাগানো থাকতো, রাস্তায় জমা হতো শত শত এমনকি হাজার হাজার মানুষ। আইনকে ফাঁকি দেবার নতুন কায়দা।

রাজনৈতিক কৌশল

এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনকে আরও ব্যাপক বিস্তৃত করার চিন্তারই অংশ হিসাবে ১৫ দলের একটি প্রতিনিধি দল হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। বুড়িগঙ্গা দিয়ে নৌকা করে ১৫ দলের প্রতিনিধি দল কামরাঙ্গির চরে পৌছালো। দলে ছিলেন আওয়ামী লীগের আবদুল মান্নান, কমিউনিস্ট পার্টির মোহম্মদ ফরহাদ, আওয়ামী লীগের মোস্তফা মহসীন মন্টু ও আরও কয়েকজন। কামরাঙ্গির চরে নদীর ঘাটেই সাদর সংবর্ধনা দেয়া হল। হাতের তালুতে ও আঙ্গুলে আতর লাগিয়ে দেয়া হল। তখন রোজার দিন ছিল। তৎক্ষণাৎ হাফেজ্জী হুজুরের সাক্ষাৎ হয়নি। ইফতারির পর হাফেজ্জী হুজুরের সঙ্গে আলোচনায় তাকে ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়ে হতাহতের ঘটনার কথা বলা হলো। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, যে সরকার গুলি চালায় সে জালেম আর জালেম যত শক্তিশালী হোক পতন তার হবেই। পরদিন এটিই পত্রিকায় ফলাও প্রচার পেল। সেসময় ইসলামী ফ্রন্টের এক অংশকে বিশেষ করে হাফেজ্জী হুজুরের মতো সৎ আলেমদের আন্দোলনের পক্ষে রাখা দরকার মনে করেছিলেন ১৫ দলের নেতারা। তারা জামায়াতকে কাছে টানতে চাননি। এরশাদ আমলে কোনো রাজনৈতিক জোটেই জামায়াত স্থান পায়নি। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী ১৫ দল, সাত দল পরবর্তীতে ৮,

www.pathagar.com

৭, ৫ দলের সঙ্গে যুগপৎ কর্মসূচি দিয়ে চলতো। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে গা লাগিয়ে রেখে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের অবস্থান ভালো করার কৌশল নিয়েছিল জামায়াত। এর পর ধর্মীয় রাজনীতি শক্তিশালী হওয়ার পিছনে এই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

শক্তি বৃদ্ধির তাগিদ

তার আগেই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করার তাগিদে বিএনপির সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার উদ্যোগ নেন ১৫ দল নেতৃবৃন্দ। এক্ষেত্রেও বামপন্থীরাই বেশি আগ্রহী ছিল। তারাই ক্যান্টনমেন্টে খালেদা জিয়ার বাসায় গিয়ে তাকে রাজনীতিতে আসতে, বিএনপির হাল ধরতে উদ্বুদ্ধ করেন। সল্পভাষী খালেদা জিয়া তাদের কথায় মনোযোগী হয়েছিলেন এবং গুরুত্বসহকারে বিষয়টি নিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী এর প্রমাণ।

এরপর বিএনপির সঙ্গে ১৫ দলের আলোচনা শুরু হয়। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল বিএনপি ১৫ দলে যুক্ত হবে। কিন্তু সেটি হয়নি। বিএনপি স্বতন্ত্রভাবে একই বিবৃতি ও একই কর্মসূচি একই সময়ে প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে শুরু হয় যুগপৎ আন্দোলনের ধারা। এদেশের রাজনীতিতে একটা নতুন বিষয় সংযোজিত হলো যুগপৎ আন্দোলন।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সাল। ৫ দফা সম্বলিত যুগপৎ বিবৃতি তৈরি হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিএনপি নেতাদের অপেক্ষা শেষ হলো ব্যতিক্রমি ঘটনায়। বিএনপির সঙ্গে আরো কয়েকটি দলের নেতারা এলেন। জন্ম হলো দ্বিতীয় জোটের, ৭ দল। শুরু হলো ১৫ ও ৭ দলের যুগপৎ আন্দোলন।

১৫ দল ও ৭ দলের আন্দোলন এরশাদ বিরোধী সংগ্রামকে তীব্র করে তুলল। কিন্তু এর মধ্যেই নতুন চিন্তা দেখা দিল বামপন্থীদের মধ্যে, বিশেষ করে সিপিবি বামদের একটি প্রগতিশীল কর্মসূচির কথা তুলে। যদিও শুরুতে এ ধরনের উদ্যোগ বেশিদূর এগোয়নি সিপিবি-ন্যাপ পরিবারের সামরিক শাসন বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনে অনাগ্রহের কারণে। অবশ্য পরে ১৫ ও ৭ দলের মধ্যকার বাম দলগুলোর আলাদাভাবে একত্রে বসে আন্দোলনের মুখ্য ও কৌশল ঠিক করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এভাবে ৯ বাম দলের একটি অঘোষিত কমিটিও গড়ে ওঠে।

১৯৮৩-র ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ ও ৭ দলের যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয় ৫ দফার ভিত্তিতে। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার। ৩০ সেপ্টেম্বর যুগপৎভাবে প্রকাশ্যে জনসভা হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের সেই সভায় হাজার তিনেক লোক হয়েছিল। ৭ দলের সভাও প্রায় একই রকম হয়েছিল। এর পর আসে হরতাল কর্মসূচি। পহেলা নভেম্বর ১৫ ও ৭ দলের ডাকে হয় দেশব্যাপী হরতাল। সামরিক শাসন উপেক্ষা করে জনগণ সর্বাত্মক হরতল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল করে।

সচিবালয় ঘেরাও

এরপর ১৬ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আবারও জনসভা হয়। আসে সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, ১৫ ও ৭ দল সচিবালয় ঘেরাও করে।

www.pathagar.com

জিপিওর সামনে রাস্তায় বসে যায় ১৫ দলের নেতৃবৃন্দ সঙ্গে হাজার পনের মানুষ, যারা প্রধানত বিভিন্ন দলের কর্মী, সমর্থক ও কিছু উৎসাহী জনতা। ওদিকে তোপখানার দিকে অবস্থান নিয়েছিল ৭ দল। সেখানে লোকের সংখ্যা কিছুটা কম ছিল। এদিন শেখ হাসিনার ও খালেদা জিয়াও রাস্তায় বসেছিলেন।

শান্ত অবস্থায় স্লোগান ও হ্যান্ড মাইকে বক্তৃতা চলছিল। হঠাৎ করে দুই একজন ছাত্র পুলিশের দিকে স্যান্ডেল ছুঁড়ে মারে। পুলিশ বেধরক লাঠিচার্জ শুরু করলে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনা দলীয় কার্যালয়ে আশ্রয় নেন। নেতারাও ছুটেন নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষ পিছু হঠেনি। উত্তেজিত লোকজন বেশি সংখ্যায় জড়ো হতে থাকে। সব মিলিয়ে ৫০ হাজারের মতো মানুষ যেন সক্রিয় যোদ্ধায় পরিণত হয়। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ। একসময় একদল তরুণ সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙ্গতে শুরু করে। একটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেলে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ে সচিবালয়ের ভেতর। বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়িতে আগুন দেয়। এর মধ্যেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে মিলেটারি চারদিক থেকেই গুলির আওয়াজ। রাস্তার জনতার ছত্রভঙ্গ না হয়ে উপায় থাকে না। এর প্রতিক্রিয়ায় পরদিন ঢাকায় ও ৩০ নভেম্বর সারা দেশে হরতাল ডাকা হয়। সরকার জারি করে কারফিউ। পরে অবশ্য ২০ ডিসেম্বর হরতাল ডাকা হয়।

দ্বিধাগ্রস্থ নেতৃত্ব

এর মধ্যে ২৮ নভেম্বরের পর নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে জারি করা হুলিয়া প্রত্যাহার করে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয় এরশাদের পক্ষ থেকে। ১৫ দলের সভায় হরতাল প্রত্যাহারের প্রস্তাব আসে। এক্ষেত্রে মূলত আওয়ামী লীগ ও সিপিবি চাপ দিতে থাকে। সিপিবি সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙার সমালোচনা শুরু করে। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৫ দল হরতাল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিক্রিয়া যে ভালো হয়নি। সেটা বোঝা যায় ৪ জানুয়ারির ডাকা হরতালের ব্যর্থতায়। রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে চরমভাবে হতাশ করেছিল। অন্যদিকে ১৫ দলের ভেতর বিতর্ক শুরু হলো নির্বাচন নিয়ে। সামরিক শাসনের অধিনে নির্বাচন করা না-করার বিতর্কে আওয়ামী লীগ ও সিপিবি ছিল কাছাকাছি। তারা ছিল নির্বাচনের পক্ষে।

এরশাদের কৌশল

তবে সে নির্বাচনের আগে এরশাদ নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি শক্ত করার জন্য উপজেলা নির্বাচন ঘোষণা দেন। সামরিক শাসনের অধীনে এই নির্বাচন বর্জনের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে। ১৫ ও ৭ দল যৌথভাবে এরপক্ষে দাঁড়ায়। উপজেলা নির্বাচন বয়কটের আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে। ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উপজেলার নির্বাচনের মনোনয়নের শেষ তারিখে দেখা গেল অনেক আসনে একটিও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। অনেক উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রচারণা করা দূরের কথা এলাকায় থাকতে পারে না। ঢাকায় পালিয়ে আসতে হয়েছে। কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে পুলিশের আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

ছাত্র মিছিলে ট্রাক

'৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ৪ জন ছাত্র জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল, কাঞ্চন জীবন দেওয়ার একবছর পুরা হওয়ার সাথে সাথে ২৮ ফেব্রুয়ারি এক হৃদয়হীন ঘটনা ঘটে। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের এক মিছিল বের হয়। মিছিল যখন ফুলবাড়িয়া পুরান রেলস্টেশন অতিক্রম করছিল তখন তার ওপর সরাসরি ট্রাক চালিয়ে দেওয়া হয়। পাঠকবৃন্দ মনে থাকতে পারে আগের বছর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ বাহিনী যে নারকীয় তাণ্ডব চালায় তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরল আমীন বেপারী এবং দুইজন ছাত্র সেলিম, দেলওয়ার আহত হন। বোধহয় আর এক বছরই মাত্র আয়ু ছিল সেই দুই ছাত্র নেতার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ট্রাকের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যান এই দুজন। ২০/২৫ জন মারাত্মক আহত হয়। জাসদ ছাত্রলীগের নেতা আবদুস সাত্তারও ট্রাক চাপা পড়েছিলেন সে দিন। তিন বলেন, মৃত মনে করে তাকে পুলিশ চ্যাংদোলা করে ট্রাকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ট্রাকের মধ্যে সাত্তারের এক দেশী পুলিশের সিপাহী তাকে জীবিত বলে বুঝতে পারে। পরবর্তীতে তার সাহায্য-শুশ্রূষায় জীবন ফিরে পান সাত্তার।

এই ঘটনা আবারো একবার দেশের বিবেককে ধাক্কা দেয়। এই হৃদয়হীন বর্বরতার অর্থ কী? দুঃখে-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় মানুষ। ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ দল, ৭ দল ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে মৌন মিছিল, গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ও ৭ দলের পক্ষ থেকে ১ মার্চ ৬-২ টাকা হরতাল আহ্বান করা হয়। ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন ও গোলাগুলি চলে। আদমজীতে শ্রমিক ও সিপিবি নেতা তাজুল শহীদ হন।

আন্দোলনের মাঠে প্রতিটি জীবনদানই আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে যদি আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে আন্দোলনকারীদের অটুট অঙ্গীকার থাকে। সেই সময়ের কথা বলা যায়, এক সময়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা কমরেড তাজুল ইসলামের তখনকার আত্মদান আন্দোলনে, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত নতুন মাত্রা যোগ করে যা শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের গঠনে এবং সাফল্যে বিশেষ অবদান রাখে।

পহেলা মার্চ সারা দেশব্যাপী হরতাল হয়েছিল। হরতালে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাড়ছিল সাধারণ মানুষের। গ্রামের মানুষের সক্রিয়তার কারণে উপজেলা নির্বাচন এতটাই সফল হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত এরশাদ সরকার নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য হয়। এটা ছিল স্বৈরাচারী সরকারের একটা পরাজয়।

ফেব্রুয়ারি মাস আন্দোলন এবং আত্মদানের মাস হিসাবে প্রতিভাত হয় এরশাদ শাসনের শুরু থেকেই। ৮৩, ৮৪-এর ফেব্রুয়ারির পর ৮৫-তে এসে জীবন দেন তখনকার আন্দোলনের সাহসী সংগঠক রাউফুন বাসুনিয়া। তখন আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের জাল বিছিয়েছে সরকার। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিল ছাত্ররা। ১৯৮৩-র ১৮ ফেব্রুয়ারির স্মরণে সূর্যসেন হল থেকে রাতে সেই রকম এক মিছিল বের করেছিল ছাত্ররা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। সেই মিছিলে গুলিতে নিহত হন রাউফুন। বিক্ষোভে উত্তাল হয় ছাত্রদের মিছিল।

www.pathagar.com

এর পরের বেশ কিছুটা সময় গণ-আন্দোলনের জন্যে খুব উদ্দীপক নয়। পরপর তিনটি ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের মাঠে যে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তা কোন গণ-বিস্ফোরণ তৈরি করেনি।

শ্রমিক ঐক্য

৯ বছর একটানা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৮৩ সালের দিকেই এই আন্দোলনে অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রমিকদেরও যুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। মধ্য ফেব্রুয়ারির ছাত্র আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিল। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কারণে বিভক্ত শ্রমিক নেতাদের বাধা অতিক্রম করে বিভিন্ন ফেডারেশনের ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এর মধ্যেই পেশাগত দাবিতে রিকশা চালক-মালিকদের আন্দোলন ধর্মঘট হয়েছে। ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ১১টি জাতীয় ভিত্তিক শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি ৫ দফা দাবিনামা পেশ করা হয়। এর মধ্যে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবিও ছিল। আর ছিল শ্রমিকদের অর্থনীতির দাবি, বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ ও জাতীয়করণ রক্ষার করার মতো আর্থ-সামাজিক দাবি। পহেলা মে উপলক্ষে ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে শ্রমিক সমাবেশ হয়। তার পরেই ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা একটা রূপ লাভ করে। গড়ে ওঠে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। ১৯৮৫ সালের ২৮ এপিল স্কপের ডাকে প্রথম সারাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। শহর ও রিকশা পর্যন্ত চলেনি। নদী পারাপারের নৌকার মাঝিরা পর্যন্ত কাজ করেনি। ২২ ও ২৩ মে আবারও শ্রমিকরা ডাক দেয় ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতালের। এতে করে শুধু সরকার নয়, কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতার মধ্যে দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয়। অবশেষে ২১ মে সরকার স্কপের সঙ্গে চুক্তি করে। এতে শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবি আদায় হলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মূল দাবি উপেক্ষিত হয়। তবে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নেতাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে এরশাদের মন্ত্রী সভাতেও স্থান করে নেবার সুযোগ পান। এ থেকেই শ্রমিক নেতৃত্বের দুর্বলতা বুঝা যায়। তবে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন আপসের কাছে মাথানত করেনি। জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের আপসের পথ ভন্ডুল করে দিতে পেরেছে সংগ্রামী শ্রমিকরা।

আন্দোলনে জঙ্গী রূপ

১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ১৫ ও ৭ দলের পক্ষ থেকে যুগপৎভাবে যে দু'টি বিশাল জনসভা হয়েছিল, (যাতে সর্বমোট আনুমানিক পাঁচ লাখ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল) সেখানে সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের প্রতি বিদ্রোহ করার প্রকাশ্য আহ্বান রাখা হয়েছিল। একই ভাষায় রচিত একই ঘোষণা দুটো মঞ্চ থেকে পাঠ করা হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের দেশের মতো দুর্বল, চরমভাবে সুবিধাবাদী নেতাদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের প্রতি সেনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান।

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয়, প্রকাশ্য বিদ্রোহের আহ্বানের পর সামরিক সরকার কোনো এ্যাকশনে গেল না। এটাও ভাববার বিষয়। এর আগে ও পরে সরকার কত নেতাকে জেলে পুরেছে, বাড়ি রেইড করেছে। কিন্তু এমন ঘোষণার বিষয়টি কিভাবে বেমালুম হজম করে নিল? এটা দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এক, সরকার এতই দুর্বল যে, ঐ রকম ঘোষণার পর তাদের জন্য যে ধরনের এ্যাকশনে যাওয়া দরকার, তা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। সে ক্ষেত্রে উপেক্ষা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যেন দেখেও দেখলাম না। দুই, সরকার ভালভাবেই জানতো যে, বামশক্তি যতই অভ্যুত্থানের জন্য তৎপর হোক না কেন, প্রধান নেতৃত্ব যে নেতাদের হাতে আছে, তাদের শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ করা যায়, কেনাবেচা করা যায়। তাই সেনা বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষণাকেও সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই।

না হয় তারা সেনা বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তো তা হচ্ছে না। বরং একটু নরম ও একটু গরম পাশাপাশি দুই রকম কৌশল চালিয়ে গেলে নেতাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। এই কৌশলের কারণেই এরশাদ ও সেনাবাহিনী নয় বছর রাজত্ব চালাতে পেরেছিল। তবে সবকিছুরই একটা সীমা আছে। নয় বছর পর আর পারেনি। গণঅভ্যুত্থানের মুখেই সেনা আমলাতন্ত্রকে পিছু হটে আসতে হয়েছে, এরশাদকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে জেলখানায় যেতে হয়েছে।

নির্বাচনের টোপ

১৯৮৬-এর মার্চ মাসে এরশাদ পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেন। যথারীতি ১৫ ও ৭ দল, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবী সমিতি সমন্বয় পরিষদ-সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯ মার্চ শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদিঘির জনসভায় ঘোষণা দিলেন, নির্বাচনে যে যাবে সে জাতীয় বেঈমান। নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে দুই জোটের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হল। ২২ মার্চ হরতাল হবে।

ঠিক তার আগের দিন, ২১ মার্চ। বিশ্বাসঘাতকতার এক কলঙ্কময় দিন। এ দিন নির্বাচন বর্জনের দাবিকে সামনে রেখে এবং পরদিনের ঘোষিত হরতাল উপলক্ষে ১৫ ও ৭ দল অর্থাৎ ২২ দলের যৌথ মশাল মিছিল হবার কথা। সে মিছিল হয়েওছিল। হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত ঘোষণা, এরশাদকে নির্বাচন করতে দেয়া হবে না। দুই জোট একত্র হওয়ায় উৎসাহটা যেন আরও একটু বেশি ছিল। মশাল হাতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল যখন এগোচ্ছিল, এ যেন সামরিক সরকারের চিতা জ্বলছে। এই মিছিলে ২২ দলের সকল নেতা-নেত্রীর যোগদানের কথা থাকলেও শেখ হাসিনা এবং কমিউনিস্ট পার্টির মোহম্মদ ফরহাদ আসেননি। এমনকি অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তাদের পাওয়া যায়নি।

অবিশ্বাস্য না ন্যাক্কারজনক

এদিকে জানা গেল অবিশ্বাস্য খবর। গত রাতে নাকি এরশাদের সঙ্গে ১৫ দলের সমঝোতা হয়ে গেছে। আসলে গোপন সমঝোতা হয়েছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে

www.pathagar.com

এরশাদের। এরশাদ একটি ভাষণ দেবেন আর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যেতে সম্মত হবে। এ ধরণের কথা বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। শেখ হাসিনা দু'দিন আগেও বলেছে, নির্বাচনে যে যাবে সে হবে জাতীয় বেঈমান। নির্বাচন বর্জনের স্লোগান নিয়ে ২২ দলের যৌথ মশাল মিছিল, হরতাল সামনে রেখে কীভাবে এমনটা হতে পারে? আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, শেখ হাসিনাও বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করলেন। তবে জানা গেল, একুশে মার্চ রাতেই এরশাদ টিভি-রেডিওতে ভাষণ দেবেন। সন্ধ্যার পর শেখ হাসিনার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসায় ১৫ দলের বৈঠক ডাকা হয়।

সন্ধ্যায় ঠিকই এরশাদ অনির্ধারিত ভাষণ দিলেন টিভিতে। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, হরতাল প্রত্যাহার না করা হলে, নির্বাচনে যেতে রাজি না হলে কঠোর হাতে দমন করা হবে। এর পর সমাবেশের সম্ভাবনা হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। রাতে শেখ হাসিনার বাসায় ১৫ দলের সভা বসলেও আশ্চর্য্যজনকভাবে সভায় তিনি উপস্থিত থাকলেন না। পাশের ঘরে সাংবাদিক ও অন্যান্যদের সঙ্গে গল্প গুজব করে সময় কাটালেন। এদিকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার অনুপস্থিতিতে যারা সভায় উপস্থিত হলেন তারা আন্দোলনের কথা না বলে নির্বাচনের পক্ষেই মত দিলেন। ন্যাপ নেতা মোজাফ্ফর আহমেদ পন্ডিতের মতো বললেন, সাড়ে তিন বছরের আন্দোলনে চিনে বাদামওয়ালার লাভ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। এখন একমাত্র কাজ এরশাদের কথা মেনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া। বাকশালের মহিউদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্কাস পার্টির নজরুল ইসলামও একই কথা বললেন। বিপক্ষে দাঁড়ালো জাসদ, দুই বাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল। সামরিক সরকারের ধমকের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের বিরোধীতা করলেন এই বাম নেতারা। তবে সিপিবি, ন্যাপ, সাম্যবাদী দল নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত করার পক্ষে দাঁড়ালো। সিপিবি এক পা এগিয়ে হরতাল প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে। আর আওয়ামী লীগের একই কথা, নির্বাচনে যেতে হবে। এ নিয়ে বিতর্কের মাঝেই জাসদের হাসানুল হক ইনু ও ওয়ার্কার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রনো চলে যান গুলশানে। বিএনপি নেতাদের কাছে। তারা ১৫ দলের সভার অবস্থা জানিয়ে বলেন আমরা কয়টি দল এর বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে বেড়িয়ে আসবো। বেঈমানি করতে পারবো না। ৭ দলের প্রতি তারা অনুরোধ জানালেন যেন নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নেন। খালেদা জিয়া পরিস্কারভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কথা জানান। বলেন, ১৫ দল ও আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের পর আমরা সভার ডেকে সিদ্ধান্ত নিব।

এদিকে ১৫ দলের সভায় নাটকীয়তা চরমে উঠে। শেখ হাসিনা লিখিতভাবে ধমক দিয়ে নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না জানানোর পরও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহনের নিঃশর্ত প্রস্তাব পাস হয়। বড় অদ্ভুত কথা! পরে জানা গেছে সরকার পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যদি নির্বাচনী সিদ্ধান্তে না আসে তা হলে শেখ হাসিনার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

পরদিন ২২ মার্চ নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী ১৫ দলের ৫টি বাম দল পৃথক জোট গঠন করে সংবাদ পত্রে জানিয়ে দিল ১৫ দলের নামে নির্বাচনে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের যে সিদ্ধান্ত গেছে তার সাথে আমরা একমত নই। যদিও বিবৃতিতে নাম গেল ওয়ার্কার্স পার্টি দুই বাসদ, শ্রমিক-কৃষক-সমাজবাদী দল, এই চার দলের নাম। জাসদ নেতা শাহজাহান সিরাজ নির্বাচনের পক্ষে থাকায় বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন হাসানুল হক ইনু। যদিও ক'দিন পর জাসদের এই অংশ সরাসরি নির্বাচন বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। গঠিত হয় ৫ দল।

শেষ পর্যন্ত বিএনপি ও ৭ দল এবং ৫ দল নির্বাচন বর্জনের প্রশ্নে অটল থাকে। আওয়ামী লীগ, সিপিবিসহ ৮ দল ৭ মে-র (১৯৮৬) নির্বাচনে অংশ নেয়। এরশাদ সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু হয়।

আগের দুই জোটের জায়গায় এখন তিন জোট-৮, ৭ ও ৫ দল। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও ৫ দলে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হলো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, যেখানে সিপিবি অমল সেন-নজরুল ইসলামের ওয়ার্কার্স পার্টির একাংশও ছিল। ২০ মার্চ রাতে ক্যান্টনমেন্টে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতার বিবরণ প্রকাশ পাওয়ার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের নব্য রাজাকার বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সামরিক শাসনের অধীনে '৮৬-র ৭ মে সংসদ নির্বাচন ও পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো। দু'টিতেই এরশাদের বিজয় ঘোষিত হয়। পাতানো খেলায় এরশাদ ও শেখ হাসিনার মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে সরকারি দল আর প্রধান বিরোধী দল হলো আওয়ামী লীগ। এই পাতনো খেলায় আওয়ামী লীগ সহ ৮ দল অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তাকে বৈধতার সিল দেয়। ৭ মে'র ভোটার শূন্য ফলাফলে আওয়ামী লীগের ও জোটের যারা জয়ী তালিকায় স্থান পেলেননা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেরী হলো না। তাদের আক্ষেপ শেখ হাসিনাই তাদেরকে হারিয়ে দিলেন।

রাজনৈতিক শিবিরে অবিশ্বাস

১৯৮৬-র নির্বাচন রাজনৈতিক শিবিরে প্রচণ্ড অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। এক দল আরেক দলকে জাতীয় বেঈমান আখ্যা দেয়। ১৫ দল ভেঙ্গে ৫ দল নামে আরেকটি জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরস্পরকে দোষারোপ চলতে থাকে এবং এরই মধ্যে আন্দোলনের কর্মসূচীও চলতে থাকে। ধীরে ধীরে তিন জোটের যুগপৎ আন্দোলনে একটি ধারা তৈরি হয়। আন্দোলন মাঠে আসতে থাকে। মূল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম কোন ঐক্য পরিলক্ষিত না হওয়ায় ছাত্রদের মধ্যেও অনৈক্যের সুর বাজতে থাকে।

তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। দলগুলির কর্মী, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। তারা দুই নেত্রীকে এক মঞ্চে দেখার দাবী জানাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ অপরাপর দল এবং শ্রেণী-পেশার নেতাদের প্রচেষ্টায় আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনজোটের অভিন্ন রূপরেখা প্রণীত হয়। এই ঘটনা ছাত্রদের মধ্যেও একটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

www.pathagar.com

যাই হোক, ১৯৮৬-র নির্বাচন আন্দোলনে একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও এবং বেশ কিছুদিন নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়ি হলেও ছাত্ররা তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে।

ছাত্রদলে কোন্দল : নীরু-বাবলু-অভি

বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণ করত তিনজন। মাহবুবুল হক বাবলু, সানাউল হক নীরু এবং গোলাম ফারুক অভি। এর মধ্যে নীরু, বাবলু ছিল আপন দুই ভাই এবং ছাত্রদলের দুই মাথা। অভি ঠিক তাদের পিছনে।

'৮৭-এর ব্যর্থ এরশাদবিরোধী আন্দোলনের কিছু আগে বা পড়ে বাবলু মহসিন হলে বানানো বোমাবিস্ফোরনে মারা যান। সেই সময় শোনা গল্পটা ছিল এই রকম, রুমের দরজার পিছনে বোমা রাখা ছিল, বাবলু এসে জোরে দরজা খুললে দরজা বোমায় লেগে বোমা ফেটে উনি মারা যান।

বাবলু মারা যাওয়ার পরে নীরু ছাত্রদলের একমাত্র শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা হন। অভি ছিল মূলত ক্যাডার নেতা। '৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কয়েক মাস আগে দুইজনই গ্রেফতার হন এবং নভেম্বর মাসে প্রায় একই সময় দুইজন মুক্তিও পান। ছাত্রদলের বাকি নেতাকর্মীরা তাদের মিষ্টি-মালা দিয়ে বরণ করেন, পত্রিকায় বিশাল ছবি ছাপা হয়। ছাত্রদলে তাদের অবস্থান আগের মত থাকলেও জেলে থাকার কারণে আন্দোলনের জন্য গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যে তাদের পজিশন খুব ভাল ছিল না। ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রদলের বেশ পিছন দিকের নেতা আমান, খোকনদের কাছে যেহেতু তারা তখন ডাকসুর ভিপি-জিএস ছিলেন।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এরশাদবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ২৩ অথবা ২৪ তারিখ টিএসসি এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এরশাদের ছাত্র ক্যাডারদের গুলিতে ডাক্তার মিলন নিহত হন। দেশের পরিস্থিতি এতই খারাপ হয় যে এরশাদ ২৮শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং কারফিউ জারী করেন। এই অবস্থা চলে ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যরাতে এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া পর্যন্ত।

টিএসসির ওই ঘটনার সময় যেটা সবাই খুব অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে নীরু এবং অভি দুইজনই ওপরে ওপরে ছাত্রদলের সাথে থাকলেও আসলে জেলে থাকা অবস্থায় এরশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং ছাত্র আন্দোলন ভন্ডুল করার জন্যই তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলেও কথা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নীরু এই স্ক্যান্ডাল থেকে বের হয়ে আসতে পারলেও অভি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। পল্টি খাওয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে খুব সাধারণ ঘটনা হলেও এক দলের সাথে থেকে আরেক দলের হয়ে কাজ করার উদাহরণ সম্ভবত এটাই একমাত্র। জনরোষ এবং গ্রেফতার এড়ানোর জন্য একসময় দু'জনই পালিয়ে যান।

নব্বই দশকের মাঝামাঝি যখন মানুষের মধ্যে এরশাদবিরোধী এরশাদ বিরোধী ক্ষোভ ও আন্দোলনের বেগে কিছুটা ভাটা পড়ে অভি আবার আলোচনায় ফিরে আসে এবং মজার ব্যাপার ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর অভি সজলদের সঙ্গে শেখ হাসিনার

www.pathagar.com

হাতে ফুলের মালা দিয়ে ছাত্রলীগে যোগদান করে। মূলত তারা এস.এম হল ও জহুরুল হক হল নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এখানেও অভি বেশিদিন টিকতে পারেনি। একসময় সে দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর পর অফিসিয়ালি জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে '৯৬ এর নির্বাচনে বরিশাল থেকে মনোনয়ন পায় এবং জয়ী হয়। এর পর নানা স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে বিদেশে পালিয়ে যায়। আর নীরু বেশ কিছুদিন পর্দার আড়ালে থেকে ২০০৬ সালে বিকল্প ধারায় যোগ দেয় কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে এখন রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়।

আন্দোলনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ

১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে ব্যাংক ও অন্যান্য অফিস কর্মচারীরা আন্দোলনে নামেন। রাজনৈতিক জোটগুলোও আন্দোলনে নামে। সমাবেশ ও হরতাল ছির খুবই জঙ্গী। পরিস্থিতি দ্রুত অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায়। তবে জুলাই মাসে অভ্যুত্থান হয়নি। একটু থেমে আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো নভেম্বরে। ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছিল তিন জোটের পক্ষ থেকে। সেদিন সকালে এক শ্রমজীবী তরুণ নূর হোসেন 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' বুকে পিঠে এই স্লোগান নিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গুলিবিদ্ধ ও শহীদ হন।

'৮৭-এর নভেম্বরের আন্দোলন ক্রমাগত তুঙ্গে উঠল। অবৈধ পার্লামেন্ট বাতিলের দাবিও উঠল। বামপন্থী পাঁচ দল ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন সাত দল তো '৮৬-এর নির্বাচন মানেনি। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, তাদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি বললেও পার্লামেন্ট বাতিলের দাবি করেনি। কিন্তু আওয়ামী লীগের একটি অংশ পার্লামেন্ট বাতিলের দাবি তোলে। তার মধ্যে ড. কামাল হোসেন অন্যতম।

পার্লামেন্ট বিলুপ্ত : নতুন নির্বাচন

আন্দোলনের চাপে এরশাদ পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। তারপর আবার পার্লামেন্ট নির্বাচন দিলেন। এটা হল '৮৮-এর নির্বাচন। এবার আওয়ামী লীগও বর্জন করলো। ৮ দলীয় অন্যান্য দলও বর্জন করলো। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্দোলনের গতি কমে এসেছে। '৮৮-এর নির্বাচনে আ.স.ম. রবের নেতৃত্বাধীন জাসদ অংশগ্রহণ করে। এবার শেখ হাসিনার স্থান নিলেন আ.স.ম রব, অর্থাৎ বিরোধী দলীয় নেতা।

১৯৮৯ সালের দিকে আন্দোলন আবার কিছুটা গতিবেগ লাভ করে। এ সময় পাঁচদল সবচে' বেশি তৎপর ছিল। ১৯৮৯-এর মাঝামাঝির দিকে ৫ দলের একক ডাকে সফল হরতাল পালিত হয়েছিল।

আন্দোলনে অটল ছাত্র সমাজ

সাধারণভাবে বলা যায় এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিল ছাত্ররাই। জাফর, জয়নালরা রক্ত দিয়ে শুরু করেছিল। ৯ বছর ধরে চলেছে সে

www.pathagar.com

আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে ৪০ বছরের বাংলাদেশে এর চেয়ে দীর্ঘ কোন গণআন্দোলন হয়নি। এত রক্ত ঝরেনি কোন আন্দোলনে এবং এই আন্দোলনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় জাফর, জয়নাল থেকে শুরু করে রাউফুন, শাজাহান সিরাজ এবং সবশেষে জেহাদ রক্ত দিয়ে লিখে গেছে তাদের নাম।

আগে বলেছি, মধ্য ফেব্রুয়ারিকে বলা যায় এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের সময়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনীহা বা উদাসীনতা সত্ত্বেও এককভাবে ছাত্ররাই সে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৮২ তে যে আন্দোলন যাত্রা শুরু করে সাথে সাথেই তা বেড়ে ওঠে নি, আন্দোলনের উঠতি পড়তি হয়েছে। কিন্তু মূল ধারাটি সবসময় আন্দোলনের পক্ষে থেকেছে এবং ছাত্ররাই সে ধারা অব্যাহত রেখেছে। দীর্ঘ নয় বছর ধরে এ আন্দোলন হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে দুইবার ডাকসুর নির্বাচন হয়েছে। একবার ছাত্রলীগ-জাসদপন্থী ছাত্রলীগ জিতেছে, আর একবার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জিতেছে। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বাস রাখার বা বিশ্বাস ভাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে। জোট ভেঙ্গেছে, দল ভেঙ্গেছে। এগুলোর প্রভাব নিশ্চয়ই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু তারপরেও ছাত্র-আন্দোলন মোটামুটি একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এগিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন বলেই অথবা ছাত্ররা চরিত্রগত ভাবেই নিরাপস বলে হয়তো শহীদের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে। জাফর, জয়নাল দিয়ে যে কাফেলার শুরু জেহাদ-মনিরের রক্ত দিয়ে তা থেমেছে। প্রকৃতপক্ষে ১০ অক্টোবর ১৯৯০ তে সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচীতে জেহাদের লাশ হয়ে যাওয়া ছাত্রনেতাদের আবার ঐক্যবদ্ধ করেছে। জেহাদ এবং মনীরের লাশ ছুঁয়ে শপথ নিয়ে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য।

১০ অক্টোবর ১৯৯০ উভয় জোটের পক্ষ থেকে সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচীতে জিহাদ মারা গেলে তার লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে ছাত্ররা। সেই লাশ দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে প্রথম আসেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ তখন সেখানে ছিলেন। তারা পরবর্তী কর্মসূচীর ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইলে খালেদা জিয়াসহ নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে চলে যান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট : ছাত্রসহ ২ জন নিহত

১৯৯০ সালের ১০ ও ১১ অক্টোবরের ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ তারিখে আহুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তেঁজগাও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্র-পুলিশ হামলায় মনিরুজ্জামান মনির নামে একজন ছাত্র এবং হাবিব নামে অপর একজন নিহত হয়। এই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা বহু গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর করে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ গুলিবর্ষণ ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে। আগের দিনও সারাদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। সন্ধ্যার পরও অনেক এলাকায় অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ বিভিন্ন স্থান হতে মোট ১৭ জনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রহত্যা ও পুলিশী হামালার

www.pathagar.com

প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১৪ অক্টোবর সারাদেশে ছাত্র বিক্ষোভ এবং পর পর দু'দিন অর্ধদিবস হরতাল পালনের আহবান জানায়। ভাংচুরের আতংকে সন্ধ্যার পর শহরের অনেক সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে ছাত্ররা মনিরের লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একদল ছাত্র লাশ নিয়ে শেখ মুজিব হলে চলে যায়। ডাকসু ভবনের সামনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক সভায় সব হলের ছাত্রদের মিছিল করে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আসার আহবান জানানো হয়। বেলা ২টা ৫ মিনিটে মুজিব হল হতে ছাত্রদের একটি মিছিল মনিরুজ্জামান মনিরের লাশ নিয়ে আসার পর অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, মাজেদুল হক, রাশেদ খান মেনন, শামসুল হক চৌধুরী, হাসানুল হক ইনু, নির্মল সেন, আব্দুল মতিন চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, টিপু বিশ্বাস, আফসার সিদ্দিকী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। সভার শুরুতেই ছাত্রদল নেতা ফজলুল হক মিলন, জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা কামাল হোসেন, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নাসির উদ দুজা সরকার পতনের লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। ছাত্র নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতাকালে বলেন, সরকার মনিরের মতো আর একটি তাজা প্রাণকে কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী মনোভাব প্রকাশ করেছে। ছাত্ররা যখনই আন্দোলন করতে চায় তখনই দমন-পীড়ন হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। তিনি আরও বলেন, যে কোন মূল্যে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। সভায় উপস্থিত কয়েক হাজার ছাত্র জনতার দাবীর মুখে শেখ হাসিনা ১৪ অক্টোবর রবিবার সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট, সোমবার সারাদেশে সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল এবং ১৬ অক্টোবর পূর্ব ঘোষিত হরতাল কর্মসূচী সফল করার আহবান জানান। বক্তৃতা শেষে শেখ হাসিনা আন্দোলনের শপথবাণী পাঠ করে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'ঐক্য চাই ঐক্য চাই' বলে অনেকে স্লোগান দিতে শুরু করে। প্রায় ৪/৫ মিনিট বিশৃঙ্খল অবস্থায় কাটিয়ে শেখ হাসিনা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে কতিপয় তরুণ তার পাজারো জীপে ঢিল ছোড়ে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দন্ডায়মান ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দেয়। বেলা ২ টা ৩৫ মিনিটে শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর সভাস্থলে কিছুটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। নির্মল সেন, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছাত্র জনতাকে শান্ত করতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে আব্দুর রাজ্জাকের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর সভায় কিছুটা পরিবেশ ফিরে আসে। ২ টা ৪৫ মিনিটে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ হতে প্রেসক্লাব অভিমুখে যাত্রা শুরু করে প্রায় ৩ টার দিকে শিক্ষাভবনের সম্মুখে পৌঁছলে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সময় ২০/২৫ জনের একদল ছাত্র মনিরের

www.pathagar.com

লাশ নিয়া জগন্নাথ হলের দিকে ছুটে যায়, একদল শিক্ষা ভবনের সম্মুখে অবস্থান নেয়। অপর একটি বড় অংশ ক্যাম্পাসে ফিরে যাওয়ার সময় বাংলা একাডেমী সংলগ্ন আণবিক শক্তি কমিশন কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারা ক্যাম্পাসে পার্ক করা ৪টি স্টাফ বাস, ৩টি মাইক্রোবাস, ৬টি প্রাইভেট-কার এবং ১টি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্ররা শাহবাগস্থ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে আক্রমণেরও চেষ্টা করে। বিকেল ৪টায় এই এলাকায় ছাত্রদের সংখ্যা বেড়ে গেলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। একই সময় একদল ছাত্র পলাশী মোড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করে। তারা ব্যক্তিদ্বয়কে নগ্ন করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় নাজেহাল করে। পরে রক্তাক্ত ও 'দিগম্বর' অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

ইতঃপূর্বে জিহাদের লাশ নিয়ে মিছিল করার বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে মিছিল হবে। শেখ হাসিনা চলে গেলে সেখানেই ছাত্র ঐক্যের নামে শপথ নেয় সমবেত ছাত্ররা, 'এরশাদ সরকারের পতনের আগে তারা আর ঘরে ফিরে যাবে না।'

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্ররা

১২ অক্টোবর সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সেদিন পলিটেকনিকের ছাত্র মনীর মারা যায়। তার নামেও প্রতিশোধের শপথ নেয় ছাত্ররা। জমে ওঠে আন্দোলন। ২৬ নভেম্বর সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সন্ত্রাসী গ্রুপ হামলা চালায়। হামলাকালে তারা আনুমানিক পাঁচ শতাধিক গুলি ছুড়ে। এতে নিমাই নামে একজন পান দোকানদার নিহত এবং ৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ব্যাপী বৃষ্টির মত গুলি বিনিময়ের পর সর্বদলীয় কর্মী ও সমর্থকদের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসী চক্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বিকাল ৩ টার দিকে একটি মাইক্রোবাস (নং-ঢাকা-চ-১৯৯২) ও কয়েকটি হোন্ডাযোগে সদ্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিস্কৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও তাদের সহযোগী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় অবস্থান নেয় এবং এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এক পর্যায়ে তারা দোয়েল চত্বর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকায় যেতে চাইলে টিএসসির মুখে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা তাদেকে বাধা দেয়। এদিকে জিরো পয়েন্টে সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা দোয়েল চত্বর হয়ে না এসে শাহবাগ হয়ে জিরো পয়েন্টে এসে সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল দোয়েল চত্বর হয়ে কলাভবনের দিকে যেতে চাইলে অভি ও নীরু গ্রুপের সশস্ত্র তরুণরা গুলি ছুঁড়তে থাকে।

গুলিতে ডা. মিলন নিহত

১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পায়। তখন আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশাজীবীরা সম্পৃক্ত হয়। বিভিন্ন পেশার সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ। মিলন এই কমিটিতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করে। এরশাদ সরকার এ সময় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে। ফলে চিকিৎসকদের আন্দোলন একটা নতুন মাত্রা লাভ করে। মিলন স্বাস্থ্যনীতিকে কেন্দ্র করে যে কমিটি গঠিত হয় তার ছিল যুগ্ম সম্পাদক। আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় হওয়ার কারণে সে সর্বদাই সরকারের নজরে থাকত। বদলি ও হয়রানি সরকার তার ওপর চাপিয়ে দিত। চিকিৎসকদের আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। এতে ১০ অক্টোবর জেহাদ শহীদ হয়। মিলন সে সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চাকরি করতেন। জেহাদের লাশ মর্গে এনে রাখা হয়েছিল। মিলন অসীম সাহসের সঙ্গে মর্গ থেকে জেহাদের লাশ এনে আন্দোলনরত ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়। ছাত্ররা লাশ নিয়ে অপরাজেয় বাংলার সামনে চলে যায়। এখানেই তখন স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটানোর শপথে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। পুলিশ সে সময় কোথাও একটু মিছিল বা বিক্ষোভ হলেই গুলি চালাত।

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর মিলনের একটা মিটিং ছিল। সেদিন ওদের কর্মবিরতি চলছিল। মিলন সকাল ১০টায় বাসা থেকে বের হয়ে পল্টনে মিটিংয়ে যাচ্ছিল। পথেই এরশাদের সে সময়ের গুণ্ডা বাহিনী নীরু-অভি সব সময় তার দিকে লক্ষ্য রাখছিল, কিভাবে কোন অবস্থায় তাকে শেষ করে দেওয়া যায়। সেদিন মিলনের রিকশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পেছন দিয়ে যাওয়ার সময় (এখন যেটা মিলন চত্বর) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে গুলি করে। একটা গুলি মিলনের বুকে এসে লাগে। স্বৈরাচারী সরকার ভেবেছিল নেতাকে মেরে আন্দোলন দমন করবে; কিন্তু ফল হলো উল্টো। মিলনের শহীদ হওয়ার খবর পৌঁছলে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। সারা দেশ তখন স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে যুক্ত হয়। আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

প্রতিবছরই ২৭ নভেম্বর ঘটা করে মিলন হত্যা দিবস পালন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কিন্তু মিলন হত্যার বিচার আজও হয়নি। মিলনের আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়নের চেষ্টা দেখা যায়নি। সম্প্রতি মিলন হত্যা দিবসের আলোচনা সভায় তার মায়ের মুখে সে হতাশায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আজ যখন এত বছর পরে এসে দেখি মিলনের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া গণতন্ত্র আবারও মাথা ঠুকরে মরছে, আবারও রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবারই ক্ষমতার পালাবদলের সময় নিজেরা এই মীমাংসায় আসতে পারে না যে কিভাবে নির্বাচন করবে; তখন নিজের মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে। স্বৈরাচারী সরকারের হাতে শহীদ হওয়া মিলনসহ আরো শত শত সন্তানের মারা যাওয়ার অর্থ খুঁজে পাই না। জাতি হিসেবে নিজেদের তখন খুব ভ্রষ্ট মনে হয়। বিশ্বের সব দেশে এমন শহীদদের হত্যার বিচার হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কোনো সরকারই এর বিচার করতে পারেনি। খুনিরা বিদেশে পালিয়ে থাকে, আমি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে এই হত্যার বিচার চাই। শহীদের মা হিসেবে আমার সরকারের কাছে প্রত্যাশা, তারা যেন শত শহীদের রক্তে পাওয়া এই গণতন্ত্রের অমর্যাদা না করে। তারা যেন নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে করে, নির্বাচনের আগে একটা রূপরেখা তৈরি

www.pathagar.com

করে। তাহলেই ডা. মিলনসহ সব শহীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা যাবে। গণতন্ত্রের জয় হবে"।

পেশাজীবীদের ভূমিকা

আইনজীবী, ব্যাংক অফিসার-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের পেশাজীবীরা চলে আসেন রাজপথে। সশস্ত্র বাহিনীও এরশাদের ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে এরশাদের আর কোন গতি রইলো না পদত্যাগ করা ছাড়া। ৩ ডিসেম্বর রাতে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন দেয়ার এবং নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নের ১৫দিন আগে পদত্যাগ করার যে ঘোষণা এরশাদ দিয়েছিল মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে ৪ ডিসেম্বর রাতে সে অবস্থান থেকে সরে এসে অবিলম্বে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন এরশাদ।

ক্ষমতা হস্তান্তর : তিন জোটের রূপরেখা

১৯৯০ সালের শেষ দিকে আবার গণআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। পাঁচ দল চেষ্টা চালিয়ে গেছে, যাতে তিন জোটকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনকে অভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ তৎপর ছিল এবং কিছুটা দূতালীর কাজও করেছে তারা। এর মধ্যেই ১৯৯০'র ১৯ নভেম্বর তিন জোটের রূপরেখা তৈরি হল।

তিন জোটের রূপরেখা কোনোও বৈপ্লবিক দলিল নয়। বরং এটা ছিল সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মূলা। সেই ফর্মূলাটা ছিল এ রকম। এরশাদ পদত্যাগ করবেন। তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট (তখন ছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ) সংবিধান মতেই প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। এরপর দ্বিতীয় ধাপে ওই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সংবিধান মতে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবেন। সেই ব্যক্তিটি হবেন তিন জোটের পছন্দমতো কোনও ব্যক্তি। পরবর্তী ধাপে, অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে ওই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টও পদত্যাগ করবেন। তখন সংবিধান মতে তিন জোটের পছন্দের ব্যক্তি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হবেন। তিনিই হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, যার অধীনে সংসদ নির্বাচন হবে। এই তিনধাপে সম্পন্ন হবে গোটা প্রক্রিয়া। এভাবে সংবিধানকে রক্ষা করে এরশাদ সরকারের বদলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

তিন জোটের রূপরেখার সবচে' বড় দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এই রূপরেখায় বর্ণিত ফর্মূলায় এরশাদ সরকারকে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত সরকার বলে স্বীকার করা হয়েছে। মেনে নেওয়া হয়েছে '৮৭'র ও '৯৯'র সংসদ নির্বাচন এবং '৮৭'র রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। মেনে নেওয়া হয়েছে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী, যার দ্বারা এরশাদ সরকারকে এবং সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে পরবর্তীতে এরশাদকে অবৈধ ক্ষমতা দখলের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়নি।

www.pathagar.com

তিন জোটের রূপরেখার এভাবে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার কথা বলা হলেও, একমাত্র অসংবিধানিক পথেই তা কার্যকরী করা সম্ভব ছিল। বস্তুত '৯০'র নভেম্বর-ডিসেম্বরের নাগরিক অভ্যুত্থান এবং সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তনই এরশাদকে বাধ্য করেছিল পদত্যাগ করতে। তিন জোটের রূপরেখা মেনে নিয়ে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করনে।

এরশাদের পদত্যাগ

জেনারেল এরশাদ টানা নয় বছর দেশ শাসন করে শেষ পর্যন্ত গণ-আন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার নানা উপায় খুঁজেছিলেন। তখন নতুন করে সাধারণ নির্বাচনও দিতে চেয়েছিরেন। সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিল আন্দোলনকারী সব রাজনৈতিক দল এবং জোট। জেনারেল এরশাদের সরকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ। তিনি এখন বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা। ব্যারিষ্টার আহমেদের কথায় জানা যায় ৯০'র ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে পাঠানো হয়েছিল নির্বাচনের প্রস্তাবের পক্ষে ব্যাখ্যা তুলে ধরতে। কয়েক ঘন্টা পরই অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর মধ্য রাতেই আবার ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সাংবাদিক এবং সংবাদ মাধ্যমেও ধর্মঘটের কারণে সব পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ ছিল। সেনাবাহিনী থেকেও জেনারেল এরশাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের সব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেদিন ঢাকায় বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিন আহমেদ চৌধুরী, যিনি পরে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসরে গেছেন। জেনারেল চৌধুরী বলছিলেন, ২৭ নভেম্বর থেকে সেনাবাহিনীও জনগণের ক্ষোভের বিষয় বিবেচনায় নিতে শুরু করেছিল। তিনি বলেন, ২৭ নভেম্বর ডা. মিলন নিহত হন এবং সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার জন্য জেনারেল এরশাদ যথেষ্ট প্রেসার ক্রিয়েট করেন সেনাবাহিনীর ওপর। সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ সৈনিকদেরকে পাঠিয়ে বলতে গেলে রমনা পার্কেই সীমাবদ্ধ করে রাখে। তখন থেকেই প্রথম শুরু হলো যে, কমান্ডিং অফিসার যারা ছিলেন, উনারা কেউই সরকারের অপকর্মের ফলে সৃষ্ট যে ক্ষোভ জনগণের মধ্যে রয়েছে সেটা তারা তাদের কাঁধে নিতে রাজী হলেন না। এবং সেটা ২৭ তারিখের পরের থেকেই বোঝা গেল যখন তাদের ডিউটির জন্য পাঠানো হলো, তখন তারা সেরকম ভাবে ডিউটি করতে সরাসরি না না বললেও পার্কে গিয়ে সৈন্যদেরকে ক্যাম্প করে রেখে দিল। তারা সেভাবে পেট্রোলিং করলো না।

আমিন আহমদ চৌধুরী আরও বলেন, গণ আন্দোলনের কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে পদত্যাগ করার কথা বলা হয়েছিল। পাল্টা জেনারেল এরশাদ সেনা সদরকে প্রস্তাব দিলেন যে, উনি মার্শাল'ল দিবেন। এরপর পরই জেনারেল নূরুদ্দিন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে বলেন, সেনাবাহিনী এই সব দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। নূরুদ্দিন এরশাদকে বলেন, আপনার উচিত হবে

www.pathagar.com

এটা পলিটিক্যালী সল্‌ভ করা। যত তাড়াতাড়ি, অথবা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নিন। মার্শালল দিতে তারা রাজী নন একথাটিও এরশাদকে বলা হয়েছিল সেসময়। এর পরই ৪ ডিসেম্বর জেনারেল সালাম যিনি চীফ অব আর্মি ষ্টাফ ছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, ইউ শুড রিজাইন ইমিডিয়েটলী। একথাটা উনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট এরশাদকে বলেন। এবং আর্মি কিন্তু অবৈধ হয়ে যাচ্ছে। তখন রাত দশটায় এরশাদ বললেন যে আমি Address করবো। জরুরী অবস্থা এবং কারফিউ যখন কঠিন সব আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হচ্ছিল এরসাথে সেনাবাহিনীর মনোভাব বুঝতে পেরে ৯০ এর ৪ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন। জেনারেল এরশাদের পতনের পর আন্দোলনকারী দলগুলোর ফর্মূলা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাস মেয়াদের অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী সরকারের বিষয় ছিল। কিন্তু কে হবেন সরকার প্রধান তা তখন নির্ধারিত ছিল না। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং এখন গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি। তিনি বলেছিলেন জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই আন্দোলনকারী দলগুলো অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ এর ব্যাপারে একমত হয়েছিল।

কী পেলাম ?

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনা শাসনের উচ্ছেদের পর অনেক বড় আশা তৈরি হয়েছিল। আন্দোলনকারী তিন জোটের রূপরেখায় উল্লেখিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতির নতুন যাত্রা শুরু হয়। এতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী শক্তি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ঘোষণা কিছুটা ছাপ ছিল। সেখানে অন্যান্য দাবীর মধ্যে ছিল, সকল দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি, দালাল রাজনীতিবিদ, লুটেরা ব্যবসায়ী ও আমলাদের অবৈধ পন্থায় অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে হবে। পরবর্তীতে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপের দেখা মেলেনি। ঘোষণায় সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিল দালালীর চির অবসানের লক্ষ্যে স্বৈরাচারী খুনি এরশাদ সরকারের সহযোগীদের কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া যাবে না। দেশের বুকে গণতান্ত্রিক সরকার ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠেছে তাকে সমুন্নত রেখে গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকে একযোগে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এসবেরও গ্রাহ্য করেনি কোনো রাজনৈতিক দল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গঠিত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অধীনে প্রথমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচন উপলক্ষ্যেই জাতি বড় ধাক্কার মুখে পড়ে। ১৯৯১ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ-দুই দলের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদ্বয় আবদুর রহমান বিশ্বাস ও বদরুল হায়দার চৌধুরী দু'জনেই ছুটে গেলেন জামায়াত প্রধান গোলাম আজমের কাছে সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বের দাবিদার আওয়ামী লীগ এবং

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষণাকারী বলে দাবিদার জিয়ার দল বিএনপি-দুই দলই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করলো জামায়াতের কাছে। এটা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সেটা পরবর্তীতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথমে আওয়ামী লীগ জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট তৈরি করলো। আন্দোলন করে সরকারকে বাধ্য করলো সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বধায়ক সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। নির্বাচনও করলো এবং বিজয়ী হলো। আওয়ামী লীগের হাসিনা ও জামায়াতের নিজামীর পাশাপাশি ছবিও দেখলো সবাই। ২০০১ সালে বিএনপি আরো এক ধাপ এগিয়ে জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও সরকার গঠন করলো। যে নেতৃত্ব গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা বা স্বাধীনতার কথা বলে অন্তত: তাদের কাছ থেকে এমন ভূমিকা আশা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে এদেশের বড় দু'টি দলই মানুষকে হতাশ করেছে।

এরশাদ সামরিক শাসনের অবসানের পর সাংবিধানিক সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হলো। কিন্তু সে ব্যবস্থা যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি সেটা এখন সবার জানা। সংসদের ভেতরে বা বাইরে কোথায়ও গণতন্ত্রসম্মত ভূমিকা দেখা যায়নি। সংসদে সরকার পক্ষ একক ক্ষমতার জোরে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী অবস্থান গ্রহণ করে। বিপরীতে বিরোধী দল সংসদ বর্জনের পথ ধরে রাজপথে উত্তাপ ছড়ায়, দেশ অচল করে। নব্বই পরবর্তী এই দুই দলের প্রতিটি সরকারের আমলেই এমন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে দেশবাসীকে। এ সময় সরকার ভোটে নির্বাচিত হলেও নির্বাচন ব্যবস্থা দিন দিন ভঙ্গুর হতে থাকে। ফলে একসময় নির্বাচন নিয়েই সৃষ্টি হয় অচলাবস্থার। পরাজিত পক্ষের নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে সরকারের পদত্যাগ দাবি সহিংস আন্দোলনের জন্ম দেয় এবং নির্বাচনের আগে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা ও কমিশনকে শক্তিশালী করার যথাযথ পদক্ষেপও নেয়া হয়নি। আর নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে পড়ে। ২০০৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরী অবস্থা জারী করে দুই বছর ক্ষমতা দখলে রাখে। এরপর তারা যে নির্বাচন দেয় তাতে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধান সংশোধের মাধ্যমে কীভাবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে দেয় সেটা সবার জানা। ফলে ২০১৪ সালের নির্বাচন শুধু একতরফাই হয়নি, প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় ১৫৩ টি আসনে ভোট গ্রহণই সম্ভব হয়নি। অন্য আসনগুলিতেও ভোটার উপস্থিতি ছিল নাম মাত্র। এমন প্রহসনের ফলে দেশ এক সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক সংকটের শিকারে পরিণত হয়।

সংকট এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বার বার সংবিধান সংশোধনে সংসদীয় ব্যবস্থা এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, সাংবিধানিকভাবেই দেশে ব্যক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার প্রধান, সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যার ক্ষমতা রাশিয়ার জার বা মোঘল সম্রাটের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ফলে দেশে এখন সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর ফলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধ দুর্নীতি ও দলীয়করণে ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। যা

www.pathagar.com

সরকারকে ফ্যাসিবাদী করে তুলেছে। এক্ষেত্রে বড় দল দু'টির ভূমিকায় মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। প্রচলিত রাজনীতি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, সাধারণ জনগণ কোনোভাবেই গণতন্ত্রের সুবিধা পাচ্ছে না। টাকাওয়ালা দুর্নীতিবাজ, দুর্বৃত্তরাই দলীয় পদ ও নির্বাচনে প্রাধান্য লাভ করছে। এটা বিএনপি বা আওয়ামী লীগ দুই দলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

পরিস্থিতির অধঃপতন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার একটা উদাহারণ শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি। দুর্নীতি, দলীয়করণ, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, ভর্তি-সিট বাণিজ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা ও ফলাফলে জালিয়াতি, কী হচ্ছে না সেখানে তাছাড়া জাতীয় নির্বাচন হলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। সামরিক স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ডাকসু সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিলেও গত দু'দশকে কোনো দলীয় সরকারই সে পথে পা বাড়ায়নি। এটা যে দেশের মতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক নেতৃত্বের পথ পরিষ্কার রাখা এবং ছাত্র রাজনীতির কার্যকর ভূমিকা পালনের পথ রুদ্ধ করে রাখার অপচেষ্টা সেটা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই পতিত স্বৈরাচারী এরশাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনে বড় দল দু'টির ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে। বিএনপি যেমন স্বাধীনতা বিরোধীতাকারীদের সঙ্গে জোট বেধে নির্বাচন ও সরকার গঠন করেছে তেমনি আওয়ামী লীগও স্বৈরাচারী এরশাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচন ও সরকার গঠন করেছে। ফলে নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের চেতনা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতোই। এ ক্ষেত্রেও বড় দল দু'টির ভূমিকার তারতম্য করা বেশ কঠিন বৈকি।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ঘোষণা

এ অবস্থায় ৫ ডিসেম্বর '৯০ পল্টন প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিশাল গণসমাবেশে ছাত্র নেতা ও ডাকসুর সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন সফল গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটানোর জন্য দেশবাসীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে ১৩ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এই যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়:

গত ৯ বছর এক দীর্ঘ রক্তঝরা সংগ্রামের পরিণতিতে আজ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের শাসন আমলের অবসান হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ বুকের রক্ত ঢেলে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সূচনা ঘটিয়েছিল, তাতে অগণিত শহীদদের বীরোচিত আত্মদানে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত রকম হত্যা, গ্রেফতার, নির্যাতন, জুলুম, মোকাবেলা করে সংগ্রাম করেছে। এ সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল সামরিক অভ্যুত্থানসহ অন্যান্য অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা পত্তনের ধারার অবসান ঘটিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যে সমাজে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়সংগত দাবি বাস্তবায়িত হবে।

www.pathagar.com

১০ অক্টোবর থেকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে সূচিত এ সংগ্রামের নবতর পর্যায়ে ছাত্র-জনতা জরুরি আইন, কার্ফ্যুসহ এরশাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে আরোপিত সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা উপেক্ষা করে রাজপথের দখল কায়েম করে এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়েছে। দেশের বুকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হওয়া অবধি ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারস্পারিক সহনশীলতা লালন করে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমরা জাতির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজসহ দেশবাসীর প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সঙ্গে বিজয়ের এই আনন্দঘন মুহূর্তে গত ৯ বছরে সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে বীর শহীদদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি এবং এদের শোকার্ত পরিবারবর্গের প্রতি অবনত চিত্তে আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।

আমরা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য-এর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছি।

১। অবিলম্বে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও দুর্নীতির অভিযোগে এরশাদকে গ্রেফতার ও তার বিচার করতে হবে।

২। গত ৯ বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যে সমস্ত বীর শহীদরা আত্মদান করেছেন তাদের সকলকে অবিলম্বে জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শহীদ পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা দিতে হবে।

৩। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রনেতা বজলুর রশীদ ফিরোজসহ সকল ছাত্র যুব রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করতে হবে। গত ৯ বছর সামরিক শাসন-স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে যে সমস্ত ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে সামরিক আদালতসহ অন্য কোন আইনে দন্ড প্রদান করা হয়েছে তাদের দন্ডাদেশ বাতিল করতে হবে।

৪। সকল দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি, দালাল রাজনীতিবিদ, লুটেরা ব্যবসায়ী ও আমলাদের অবৈধপন্থায় অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে হবে।

৫। গত ৯ বছর যারা অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে এবং আন্দোলনরত জনতার ওপর গুলি, নির্যাতন চালিয়েছে তাদের তালিকা প্রণয়ন করে অবিলম্বে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। মওদূদ আহমেদ, কাজী জাফর আহমেদ, শাহ মোয়াজ্জেম, মাওলানা এম এ মান্নান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নাজিউর রহমান মঞ্জু, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাফর ইমাম, জিয়াউদ্দিন বাবলু, আবুল হাসনাত, শেখ শহীদ, সিরাজুল হোসেন খান, আ. স. ম. আব্দুর রব, সরদার আমজাদ, রুহুল আমিন হাওলাদার,

www.pathagar.com

মোস্তফা জামাল হায়দার, এবিএম গোলাম মোস্তফা, খালেদুর রহমান টিটো, মাহমুদুল হাসান, মামদুদুর রহমান, তাজুল ইসলাম, ডা. আজিজুর রহমান, এম এইচ এ গাফফার, নূরুন্নবী চাঁদ, ডা. মতিন, কাজী ফিরোজ রশিদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। মঞ্জুর কাদের- এদের গণদুষমন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং বাংলাদেশের মাটিতে এদের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৭। খুনী স্বৈরাচারী এরশাদের নামে নামাঙ্কিত সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এর পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের নামে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পুনর্নির্ধারন করতে হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এরশাদ হলের নাম এখন থেকে শহীদ ডা. মিলন হল হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এরশাদ আর্মি ষ্টেডিয়ামের নাম মুক্তিযোদ্ধা ষ্টেডিয়াম হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। মহাখালী বাজারের এরশাদ গেটের নাম এখন থেকে শহীদ মনিরুজ্জামান মনির এবং যাত্রাবাড়ী এরশাদ গেট শহীদ জেহাদ গেট ষোষণা করা হচ্ছে।

৮। এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তির প্রতি আহবান-দালালীর রাজনীতি চির অবসানের লক্ষ্যে আজ থেকে স্বৈরাচারী খুনী এরশাদ সরকারের সহযোগীদের কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৯। ছাত্র-যুবক, মহিলা, কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক-ক্ষেতমজুর, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রকৌশলী-কৃষিবিদ, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষকসহ বিভিন্নস্তরের পেশার মানুষের আন্দোলনের মধ্যদিয়ে উত্থাপিত ন্যায়সংগত দাবীসমূহ গণতান্ত্রিক জোট ও দলসমূহকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

১০। অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট, জরুরী আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [আইন শৃংখলা] অধ্যাদেশ '৯০ সহ সকল কালাকানুন বাতিলের ঘোষণা দিতে হবে।

১১। দেশের বুকে গণতান্ত্রিক সরকার ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে উঠেছে তাকে সমুন্নত রেখে গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকে একযোগে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২। মতিঝিলের আল্লাওয়ালা ভবনকে এখন থেকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা করছি।

১৩। আগামীকাল থেকেই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে হবে।

www.pathagar.com

এরশাদ সরকারের পতনের পর

এরশাদ সরকারের পতনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এটা অনেকের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো। শেখ হাসিনা নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তোলেন। গণতন্ত্রের যাত্রারম্ভে তিন জোটের মধ্যে, বিশেষত দুই বড় দলের নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্বাসের সংকট দেখা দেয়। তারপরেও তিন জেটের রূপরেখা অনুযায়ী সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একত্রিত হয়ে সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে আসে। জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করে।

ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সংসদ অকার্যকর

শেষ বিচারে রাজনীতির মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন, অল্পদিনের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে নয় বছর ধরে সংগ্রাম করল সবাই মিলে, দেখা দিতে লাগল যে, সেই সংসদই অকার্যকর হয়ে পড়ছে। উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে সংসদ বর্জনের ঘটনা ঘটতে ঘটতে একেবারে লাগাতার বর্জনের রূপ নিল তা। বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করলেন সংসদ থেকে।

দেশ জুড়ে একটা হতাশার ভাব ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেল। গণতন্ত্রের জন্যে দীর্ঘ ৯ বছর তিন জোট এক সাথে আন্দোলন করেছিল। কীভাবে স্বৈরাচারের পতনের পর গণতন্ত্র নির্মিত হবে তার একটা রূপরেখাও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল তিন জোট এ অঙ্গিকারে ঐক্যবদ্ধ থাকার বদলে ক্ষমতার লড়াই বড় হয়ে গেছে।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনা শাসন উচ্ছেদের পর অনেক বড় আশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা ধূলিসাৎ করে ক্ষমতার উদগ্র লড়াই সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৯১ সালে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ– দুই বড় দলের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদ্বয় আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও বদরুল হায়দার চৌধুরী উভয়ই ছুটে যান জামায়াতে ইসলামীর প্রধান গোলাম আযমের সমর্থন সংগ্রহের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বের দাবিদার

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাকারী দাবিদার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি-দুই দলই নির্লজ্জভাবে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠন করে। শেখ হাসিনা ও নিজামীর পাশাপাশি ছবি ছাপা হয়। আর ২০০১ সালে বিএনপি আরও একধাপ এগিয়ে জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও সরকার গঠন করে।

এছাড়াও এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের অবসানে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয় ঠিকই কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। রাজনীতিতে অর্থ, সন্ত্রাস আর দুর্নীতি জেঁকে বসে। ফলে দুর্নীতিবাজ টাকাওয়ালারাই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে, জয় লাভ করেছে-সে আওয়ামী লীগই হোক আর বিএনপি হোক।

ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। অবশ্য এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না যে ছাত্রদের মধ্যে এ প্রভাব এই প্রথম দেখা গেল। বরঞ্চ নয় বছরের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সময় এ অনৈক্যের সুর মাঝে মাঝেই বেজে উঠছিল। বৃহত্তর ছাত্র ঐক্য তো সেই অর্থে গড়েই ওঠেনি। আন্দোলনের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। ডাকসু নির্বাচনে আমান-খোকন জিতে যাওয়ার পরে সম্ভবত ছাত্রদলকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব ছিলো না, যদিও ছাত্রদলকে নিয়ে বাকী সংগঠনগুলোর অনেক প্রশ্ন ছিল।

ছাত্র রাজনীতির অবক্ষয়

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যদি ছাত্র রাজনীতির ধারবাহিক বিকাশকে পর্যালোচনা করি তবে ৯০-এর আন্দোলনের পর থেকে এই সময় পর্যন্ত তিন দশককে ছাত্ররাজনীতির একটা অবক্ষয়ের অধ্যায় বললেও সম্ভবত ভুল করা হবে না। এই সময়ের মধ্যে এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত যে খুন, গুম, হয়েছে তার বিশদ বিবরণ হাজির করলে সবাইকে শিউরে উঠতে হয়।

এই অবক্ষয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের আর একটু পেছনে থেকে শুরু করতে হবে। এরশাদ সরকারের পতনের অব্যবহিত পূর্ব থেকে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-প্রচার সম্পাদক বজলুর রহমান খান শহীদ নিহত হন ১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের তিন তলায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহ হাসপাতলে নিয়ে যাবার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মাথার পিছনে গুলির আঘাত ছিল। শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ছাত্রদের একজন। তার বাড়ী পটুয়াখালীর বাউফলে। বিবাহিত শহীদ আগের মাসে এক পুত্র সন্তানের জনক হয়েছিলেন। ৬ ডিসেম্বর ছাত্রদলের সূর্যসেন হল শাখার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের দু'গ্রুপের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে তাতে শহীদ আহত হয়েছিলেন। সে সময় তার পিঠে গুলি লেগেছিল। এই ঘটনার পর থেকে তিনি সূর্যসেন হল ছেড়ে মুহসীন হলে থাকতেন বলে জানা গেছে। রাত সাড়ে আটটার দিকে তার রক্তাক্ত দেহ মুহসীন হলের ৩৫৭ নং রুমের কক্ষের সামনে পড়ে থাকতে দেখা

www.pathagar.com

যায়। ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই একটি গুলির শব্দ শোনা যায় এবং সবার ধারণা ও কক্ষের ভেতরে খুব কাছে থেকে শহিদকে গুলি করা হয়। সূর্যসেন হলের ঘটনার জের হিসেবেই এ ঘটনা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাতে জিয়া হলে ছাত্রদের সম্মেলন চলাকালে শহীদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরটি প্রথমে সেখানে পৌঁছে। বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম জিয়া তখন সেখানে প্রধান অতিথি বক্তৃতা করছিলেন। খবরটি জানাজানি হবার পরপরই তিনি বক্তব্য শেষ করেন এবং দলের মহাসচিবসহ অন্যান্য নেতার সাথে তাকে ক্যাম্পাসের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। শহীদের লাশ সূর্যসেন হলে নেয়ার পর ছাত্রদলের একদল কর্মী শহীদকে হত্যার জন্য সরকারী এজেন্টদের অভিযুক্ত করেন। শহীদ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রদল ১৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৪ ডিসেম্বর সারা দেশে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে।

ছাত্রদল অভিযোগ করে যে, একট বিশেষ মহল পরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় শহীদকে হত্যা করেছে। সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তকদির হোসেন জসিম, সদস্য শহীদুল ইসলাম মন্টো এবং কর্মী কামরুজ্জামান বাবুকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সন্ত্রাসের বিস্তার

১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর ফজলুল হক হলের গেটে এক সন্ত্রাসী তৎপরতায় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্র সংসদের ভিপি মমতাজুল হক রফিকসহ ৩ জন ছাত্র গুলিবিদ্ধ এবং একজন ছুরিকাঘাতে আহত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলে ছাত্রদলের অভি গ্রুপের সমর্থক একদল বহিরাগত যুবক একই সংগঠনের ইলিয়াস গ্রুপের সমর্থক রফিক, হায়দারুজ্জামান, আওলাদ হোসেন মিজানকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। বহিরাগতরা আওলাদকে ছুরিকাঘাত করে। রফিক গুলিতে আহত হয়েও দৌড়ে ফজলুল হক হলের দারোয়ানের কক্ষে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে। বহিরাগতরা ঐ কক্ষের দরজায় চাপাতি দিয়ে আঘাত করে এবং বেশকটি কক্ষ ভাংচুর করে।

১৪ নভেম্বর ১৯৮৯ এ কার্জন হল ক্যাম্পাসে একদল ছাত্র ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও ৩টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ছাত্র শিক্ষকসহ সকলের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করে। তারা এ সময় ফার্মেসী বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সদস্য তপন কৃষ্ণ সাহাকে ছুরিকাঘাত করে। বহিরাগতরা এক পর্যায়ে ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলেও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি, জিএস এই ঘটনায় অভি গ্রুপের সমর্থকদের দায়ী করেন।

ছাত্রদলের অভি-ইলিয়াস দ্বন্দ্ব

১৯ নভেম্বর ১৯৮৯- এ ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধুর ক্যান্টিনের সামনে ব্যাপক গুলি বিনিময়ের ঘটনায় কামাল ও ইকবাল নামে ২ জন ছাত্র আহত হয়। গুলিবিদ্ধ কামাল উদ্দিনকে গুরুতর অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐদিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপ সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত ছিল বলে খবর মেলে।

www.pathagar.com

সেদিন রেডিও-টিভিতে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ খবর প্রচারের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের বিক্ষোভ মিছিলে সকালেই কলা ভবন ও মধুর ক্যান্টিন এলাকা মুখরিত ছিল। পৌনে ১২ টা নাগাদ ৯ ছাত্র সংগঠনের মিছিল এবং ১২ টার দিকে সংগ্রামী ছাত্র জোটের মিছিল শাহবাগস্থ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কার্যালয় অভিমুখে ক্যাম্পাস ত্যাগ করার পরই লাইব্রেরী সংলগ্ন রাস্তা হতে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। একটি সাদা গাড়িতে ৭/৮ জন সশস্ত্র তরুণ ডাকসু ভবনের কাছ থেকে গুলিবর্ষণ শুরুর পরই মধুর ক্যান্টিনের পেছনে আইবিএ ভবন থেকে অপর এক দল পাল্টা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ফলে মুহূর্তে মধুর ক্যান্টিন এলাকা ফাঁকা হয়ে যায় এবং কলাভবন, লাইব্রেরী এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটোছুটি শুরু হয়। একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে ভূগোল বিভাগের ছাত্র কামাল উদ্দিন (শহিদুল্লাহ হল, অভিগ্রুপ) এবং মার্কেটিং তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইকবাল হোসেন (মোহসীন হল, ইলিয়াস গ্রুপ) গুলিবিদ্ধ হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ডাকসুর সভায় ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রদলের কোন্দলকে দায়ী করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান। তৎকালীন ছাত্রদল সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান এক বিবৃতিতে বলেন, সংগ্রামী ছাত্রজোট ও ৯ ছাত্র সংগঠনের মিছিল জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের কার্যালয় অভিমুখে যাওয়ার পর মধুর ক্যান্টিন সংলগ্ন এলাকায় গুলিবর্ষণে ছাত্রদলের ইকবাল ও কামাল গুলিবিদ্ধ হয়। বিবৃতিতে আরো বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র রয়েছে, বহিরাগতরা অবৈধভাবে হলে বসবাস করছে। ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএস এক বিবৃতিতে বিতর্কিত অভি গ্রুপকে দায়ী করে বলেছেন, এদের সন্ত্রাস অব্যাহত থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এরা ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করছে বলেও সবার মনে ধারণা জন্মে।

নিরু-অভি বহিষ্কার

এই ঘটনার পর আর কোনো উপায়ন্তর না থাকায় নিরু-অভিসহ ৬ ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এতে করে তারা আরো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। নিরু-অভি গ্রুপের ভার্সিটি দখলের চেষ্টার বিরুদ্ধে ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ায়। ছাত্রদল থেকে বহিস্কৃত এই সশস্ত্র গ্রুপটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

গ্রুপটি সশস্ত্র দুপুরে দু'টি হল দখল করে নেয়ার পর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের সাথে প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা স্থায়ী সংঘর্ষের পর পালিয়ে যায়। তার আগে তাদের গুলিতে একজন নিহত এবং ৪ জন আহত হয়। এছাড়া বোমার আঘাতে আহত হয়েছে আরো দু'জন। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত তরুণের নাম নিমাই।

www.pathagar.com

আগের দিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে ক্যাম্পাস থেকে পলায়ন এবং রাতে কয়েকটি হল লক্ষ্য করে গোলাগুলির পর ওই সশস্ত্র গ্রুপটি পরদিন ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক সানাউল হক নিরু ও আন্তর্জাতিক বিয়য়ক সম্পাদক গোলাম ফারুক অভির নেতৃত্বে বেলা আড়াইটার দিকে গুলি ও বোমা ফাটিয়ে শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হল দখল করে নেয়। এ সময় এই দুই হলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মী-সমর্থকদের কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করা হয়।

অস্ত্রের ঝনঝনানি

২৬ নভেম্বর ১৯৯০ এম্বুলেন্সে করে সশস্ত্র ব্যক্তিদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলি, বোমা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়।

এ সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি বিক্ষোভ মিছিলে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। গুলি আর বোমার শব্দে সমগ্র এলাকা কেঁপে ওঠে।

প্রায় দেড় ঘন্টা স্থায়ী এ সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫শ রাউন্ড গুলি চলে। এছাড়া ব্যাপক বোমাবাজি হয়। কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে ফয়জুর রহমান মামুন ছাত্রলীগ (না-শ) ও আলী মর্তুজা তুহিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালে কলাভবন এ লাকায় এক সন্ত্রাসী ও ভয়ার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গুলি শব্দে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। ছুটোছুটির ফলে কলাভবন ও প্রশাসনিক ভবনের মাঝামাঝি এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে এবং পড়ে গিয়ে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। অনেকে দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং হামাগুড়ি দিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে পড়ে। দেড় ঘন্টা স্থায়ী এ সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কলাভবন এলাকায় প্রবেশ করেনি।

সম্মিলিত প্রতিরোধ

ছাত্রদলের ৬ জন নেতাকে বহিস্কারের ঘটনায় গভীর রাতে ক্যাম্পাসে প্রচন্ড গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ঐক্য প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী নেওয়া হয়।

দুপুর সাড়ে ১১ টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রতিবাদ সমাবেশ চলাকালে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির এ্যাম্বুলেন্সে (ঢাকা মেট্রো-জ-৪৮১১) কলাভবনে প্রবেশ করে। এ এ্যাম্বুলেন্সে অভিসহ বহিস্কৃত ছাত্রদল নেতাদের কয়েকজনকে দেখা যায়। এ্যাম্বুলেন্সটি কয়েকবার সমাবেশের চারপাশে ধীর গতিতে চক্কর দিতে থাকলে সমাবেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ দ্রুত সমাবেশ শেষ করে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল কলাভবন ও ডাকসু ভবন প্রদক্ষিণ করে লেকচার থিয়েটারের পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে এগুতে থাকলে একদল সশস্ত্র যুবক হঠাৎ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে।

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গুলিবর্ষণের আগে কলাভবন এলাকায় টহলরত এ্যাম্বুলেন্সটি সূর্যসেন হলের সামনে যায় এবং এতে অবস্থানরত সশস্ত্র ব্যক্তিরা ছাত্রদল নেতা গোলাম ফারুক অভির নেতৃত্বে সূর্যসেন হলে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ১২ টার সময় হল এলাকা থেকে ছাত্র ঐক্যের মিছিল লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। ইতিপূর্বে ছাত্রদলের অভি গ্রুপের সমর্থকরা সূর্যসেন ও মহসীন হলে অবস্থান নিয়েছিল।

গুলিবর্ষণের সাথে সাথে ছাত্র ঐক্যের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং কলাভবন ও লেকচার থিয়েটারের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় হামলাকারীদের সূর্যসেন হলে অবস্থান নিতে দেখে মিছিলকারীরা দ্রুত সংগঠিত হয়ে ইটপাটকেল, লাঠিসোটা ও লোহার রড নিয়ে সূর্যসেন হলের দিকে স্লোগান দিতে দিতে এগুতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে হামলাকারীরা সূর্যসেন হল ও মুহসীন হল থেকে মিছিল লক্ষ্য করে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করে।

গুলিবর্ষণের ফলে মিছিলকারীরা আবার দ্রুত পিছিয়ে এসে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। তারা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে স্লোগান দিতে থাকে।

দুপুর ১ টা পর্যন্ত অবিরাম গুলিবর্ষণের পর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রায় হাজার তিনেক বিক্ষোভকারী লোহার রড, লাঠিসোটা ও ইট পাটকেল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গেরিলা কায়দায় এগুতে থাকলে সূর্যসেন হল থেকেও গুলিবর্ষণ করা হয়।

ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে দুপুর সোয়া ১ টার দিকে হামলাকারীরা সূর্যসেন হলের পিছন দিয়ে পালিয়ে যায়। ছাত্ররা তালা ভেঙ্গে সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে। সূর্যসেন হল মুক্ত হওয়ার পর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলটি আরো জঙ্গী রূপ নেয়। এবং মহসীন হলের দিকে যায়। দুপুর দেড়টার দিকে হামলাকারীরা মুহসীন হল থেকেও পিছনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়। হামলাকারীরা শহীদুল্লা হলে আশ্রয় নিয়েছে এই খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে দুপুর ২ টার দিকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি বিশাল মিছিল শহীদুল্লাহ হলের দিকে যেতে থাকে। মিছিল দোয়েল চত্বর এলাকায় পৌছলে কার্জন হল এলাকা থেকে তিন রাউন্ড গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। মিছিলকারীরা শহীদুল্লাহ হলে পৌছার আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

সংঘর্ষের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সূর্যসেন, মহসীন, জগন্নাথ, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের বেশ কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর করে। এসব কক্ষে ছাত্রদলের অভি গ্রুপের কর্মীরা অবস্থান করতো।

হামলাকারীদের বিতাড়িত করার পরদিন বিকেল থেকে ক্যাম্পাস মিছিলে মুখর হয়ে ওঠে। হলে হলে গভীর রাত পর্যন্ত সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান সহকারে এসব মিছিল অব্যাহত ছিল। মিছিলে গোলাম ফারুক অভিসহ ছাত্রদল থেকে বহিস্কৃতদের সরকারী এজেন্ট হিসেবে উল্লেখ করে ক্যাম্পাসে তাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে ডাকসুর জিএস খায়রুল কবির খোকন, ছাত্রলীগের (হা-অ) হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্র ইউনিয়নের মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, ছাত্রলীগের (না-শ) শফি আহমেদ ও ছাত্র মৈত্রীর নূর মোহাম্মদ বকুল বক্তৃতা করেন।

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসকারী সরকারী এজেন্টদের প্রতিহত করার দাবি করে বলেন, এবার হলে হলে ছাত্র ব্রিগেড সঠন করার মাধ্যমে ক্যাম্পাসের শান্তি রক্ষা করতে হবে। এ সময় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের বিজয় মিছিলে ফুল, ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে বিজয়ী ছাত্রনেতা কর্মীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিন্দা জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী খালেদা জিয়া বলেন, শুধুমাত্র দমন নীতিই নয়, চলমান আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এবং আন্দোলনের অন্যতম শক্তি সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্যে নতুন চক্রান্ত শুরু করেছে স্বৈরাচারী সরকার নিজস্ব অনুচরদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা চলছে।

সন্ত্রাসীদের উৎখাত করায় স্বৈরাচার বিরোধী আট, সাত ও পাঁচ দলের সমন্বিত তিন জোটের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়, ক্রমবর্ধমান গণ আন্দোলনের মুখে দিশেহারা হয়ে আর একবার বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কলংজনক অধ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মসূচী পালনকালে ভাড়াটিয়া অস্ত্রধারীরা ছাত্র সমাজের ওপর ঘৃণ্য সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

তথাকথিত ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের উৎসাহ এবং জেল থেকে মুক্তি দিয়ে সন্ত্রাসী শক্তিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগেই সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, অস্ত্রধারীদের এহেন হামলা আন্দোলনকারী ছাত্র ঐক্যের হাজার হাজার ছাত্র বীরোচিতভাবে প্রতিহত করেছে। সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উৎখাত করে ছাত্রগণ আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

২৬ নভেম্বর, ১৯৯০ সোমবার কিছুক্ষণের জন্য বিএনপি অফিস দখলের ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যা থেকে রাত প্রায় সাড়ে ১০টা পর্যন্ত শতাধিক সশস্ত্র যুবক ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোডে অবস্থিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দখল করে রাখে। এই সময় অফিসে বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোর কতিপয় নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সশস্ত্র যুবকরা তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে সংবাদ পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কোন ভূমিকাই পালন করেনি। ঘোরাফেরা করে পুলিশ চলে যায়। এ ব্যাপারে বিএনপি সূত্রে বলা হয়েছে যে, নীরুসহ যে ৬ জনকে ছাত্রদল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে তারা সরকারী মদতপুষ্ট গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে বিএনপি অফিসে গিয়েছিল। সূত্র বলে, যতই দালাল ও গুন্ডা বাহিনী দিয়ে এ ধরনের কর্মকান্ড ঘটানো হোক না কেন সরকারের পদত্যাগের আন্দোলন থামানো যাবে না।

ডাকসু নির্বাচন প্রত্যাখান

এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা উল্লেখযোগ্য। '৯১ সালের ডাকসু নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি অংশ বিভিন্ন অজুহাত তুলে সে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে। নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনো-খুনি শুরু হয়।

www.pathagar.com

'৯১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সে সময়ে চলতে থাকা শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়া। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন পত্র পত্রিকার শিরোনামে ঘন ঘন বৈঠকগুলোর খবর উঠে আসে। বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেননসহ শীর্ষস্থানীয় সকল দলের নেতৃবৃন্দ ঐ সভাগুলোতে নিজেদের সংহতি প্রকাশ করে করণীয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রীও তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দেবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তবে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রধান দুটো দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যখন ক্রমশই দুই মেরুর দিকে অবস্থান নেয়া শুরু করে ততই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস নির্মূলের বিষয়টা তাদের কাছে আনুষ্ঠানিক লোক-দেখানো কাজ হিসাবে কর্মসূচীতে স্থান পায়। একদল আরেক দলকে দোষারোপ করে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বেলায় প্রতিটি দলই পেশীশক্তি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসকে ইন্ধন দেয়। ফলে ভেস্তে যায় শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস নির্মূলের সর্বদলীয় উদ্যোগ।

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কর্মসূচী গ্রহণ

১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক জরুরী সভায় ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৩ জন ছাত্র নেতা যথাক্রমে ইলিয়াস আলী, কামরুজ্জামান রতন ও আব্দুল মালেকের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। ধানমন্ডিস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সভায় সংগঠনের আহবায়ক নব-নির্বাচিত এম. পি আমান উল্লাহ আমান সভাপতিত্ব করেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ হতে ৯ মে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে জেলা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন শেষ করতে হবে। সভায় আমান উল্লাহ আমানকে কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সমন্বয়কারী এবং ফজলুল হক মিলন, নাজিমউদ্দিন আলম, খায়রুল কবীর খোকন, রিজভী আহমেদ, মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর, মনিরুজ্জামান মনির, আবুল খায়ের ভূইঞা ও ফরিদ আহমেদকে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়।

তিন ছাত্রনেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন

ডাকসু, চাকসু, রাকসু, জাকসু এবং ইকসুর ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৭ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মানবিক কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বহিষ্কৃত ছাত্র নেতার বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানান। এই তিনজন হলেন আব্দুল মালেক, ইলিয়াস আলী ও কামরুজ্জামান রতন। তারা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ তিনজনসহ মোট ১২ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করে। ঐ তিনজন ছাড়া অবশিষ্ট ৯ জন বহিস্কারাদেশের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করলে কোর্ট তাদের বহিস্কারাদেশ

www.pathagar.com

অবৈধ ঘোষণা করে। তারা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ঐ তিনজন মামলা করে নাই। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন যে, বিষয়টি সুবিবেচনার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন আমানউল্লাহ আমান এমপি।

শেখ হাসিনার আহবান

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ২২ মে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ডাকসু ও ছাত্রদলের বিভিন্ন স্তরের শতাধিক নেতাকর্মীর ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদান উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় শেখ হাসিনা এই আহবান জানান। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুর রউফ এম. পি, ওবায়দুল কাদের, হাবিবুর রহমান হাবিব, বর্তমান সভাপতি শাহে আলম, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল ছাত্রদল হতে ছাত্রলীগে যোগদানকারীদের পক্ষে মোহসীন হল ছাত্র সংসদের এজিএস কামরুল ইসলাম সজল অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের চলার পথ অনেক বন্ধুর কারণ স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হলেও স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অবসান হয় নাই। শেখ হাসিনা বলেন, যে লক্ষ্যে জেহাদ, মুনির রক্ত দিয়াছে সেই লক্ষ্য আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ১০ দফার সাথে বেঈমানী করে পূর্বতন কায়দায় দেশ পরিচালনা করা হচ্ছে।

ছাত্রদল হইতে ছাত্রলীগে যোগদানকারীদের নামের তালিকায় আছে মহীদুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি খোকন, জিএস মনির, ডাকসু সদস্য মামুন ও নির্মল, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক মাসুদুর রহমান, সূর্যসেন হল শাখার সাবেক সাধারণ সম্পদক খান এ মির্জা মাসুদ, জুয়েল, ঢাকা মহানগর ছাত্রদল শাখার সহ-সভাপতি রঞ্জু, ছাত্রদল নেতা এ এখলাসউদ্দিন, জাহিদুল ইসলাম মামুন, আবু আসাদ, গুড্ডু, মনির সহ প্রমুখ। উল্লেখ্য যোগদানকারীদের ১০/১২ জনকে ছাত্রদল ইতিমধ্যে হত্যাও সন্ত্রাসের কারণে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে।

ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা

সন্ত্রাসের অভিযোগে ছাত্রদল যাদের বহিষ্কারে বাধ্য হয় তাদের অনেকের ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদানের ঘটনা ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তবে কোথাও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। ক্যাম্পাসে বিডিআর ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয়। একটি সূত্র জানায় ২২ মে, ৯১ দুপুরে কতিপয় সশস্ত্র তরুন কার্জন হল, এস এম হল সহ কয়েকটি হলে নিঃশব্দ মহড়া দিয়ে চলে যাওয়ার পর হতে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। কলাভবন সংলগ্ন একটি হলের জনৈক ছাত্র জানান, সেদিন হলের গেস্টরুমে যেসব তরুণ আড্ডা দিয়েছে তাদের ইতিপূর্বে হলে দেখা যায় নাই। নিরাপত্তার আশঙ্কায় অনেক ছাত্র রাতে হলে না থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.pathagar.com

ছাত্রদলের কতিপয় বহিস্কৃত নেতা-কর্মীসহ শতাধিক নেতা-কর্মীকে ছাত্রলীগ (আ-অ) সংগঠনে গ্রহণ করার প্রতিবাদে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ (না-শ) কলাভবনে বিক্ষোভ মিছিল শেষে পৃথক ছাত্র সভার আয়োজন করে। দু'টি সভাতেই বলা হয়, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রস্তাব অনুযায়ী ছাত্রদল যাদেরকে বহিষ্কার করেছিল ছাত্রলীগ (আ-অ) তাদের পুনর্বাসিত করায় সন্ত্রাসকারীরা উৎসাহ পেয়েছে। ছাত্রলীগে যোগদানকরীদের মধ্যে শহীদ ডা. মিলনের হত্যাকারীরাও আছে। অবিলম্বে ডা. মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার আহবান জানানো হয়। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি জহির উদ্দিন স্বপন, সাধারণ সম্পাদক নূর আহমেদ বকুল, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আখতার সোবহান মাসরুর, সাধারণ সম্পাদক সুজাউদ্দিন জাফর, ছাত্রলীগ (সা-স) সভাপতি আব্দুস সাত্তার খান, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদ পৃথক বিবৃতিতে বলেন ডা. মিলনের হত্যাকারীদেরকে ছাত্রলীগ (আ-অ) পুনর্বাসিত করে গণ আন্দোলনের চেতনার মূলে আঘাত করেছে।

ডা. মিলন হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি

ডা. মিলন হত্যাকাণ্ডের আসামী হিসেবে অভিযুক্ত ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদানকারী ৫ বহিস্কৃত ছাত্রদল কর্মীকে শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগ বহিষ্কারের সম্মত হয়। ২৩ মে ৯১ গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক জরুরী সভায় সন্ত্রাস প্রসঙ্গে কয়েক ঘন্টা বাকবিতন্ডার পর ছাত্রলীগ এ ব্যাপারে মতামত দেয়। বিতর্কিত এই ৫ জনের নাম মাসুদ, সজল, মনির, খোকন ও জুয়েল।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার ও ডা. মিলন হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ২৬ মে পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। ওইদিন কেন্দ্রীয় ৫ দলের ষ্টিয়ারিং কমিটির এক সভায় ডা. মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবী করা হয়েছে। বাসদ আহবায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ৫ দল তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

ছাত্র ঐক্যে ভাঙ্গন : ক্যাম্পাসে উদ্বেগ

ঢাবি ক্যাম্পাসে পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিদিন প্রায় ৪ প্লাটুন বিডিআর ও ১৪ প্লাটুন পুলিশ পালা করে ক্যাম্পাসে টহল অব্যাহত রাখলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। একটি সূত্র জানায় ছাত্রদল হতে একদল কর্মী ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদান করায় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ পাল্টে গেছে। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বের কারণে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় সন্ত্রাস বিরোধী প্রশ্নে গতকাল যারা ছিল ঐক্যবদ্ধ আজ তারা নিজেদের অবস্থান নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করছে। সকল ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাস সন্ত্রাস মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও নিজেদের দলীয় অবস্থান

www.pathagar.com

দৃঢ় রাখার লক্ষ্যে বিশেষ করে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসকারীদের ক্যাম্পাসে বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছে। প্রতিদিন কলাভবনে সমাবেশ, মিছিলে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের দাবী করা হচ্ছে। অথচ হলে হলে অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেন দেখেও দেখছে না।

কলাভবন সংলগ্ন কয়েকটি হলের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। একজন ছাত্র তার হলের পরিস্থিতি বর্ণনাকালে জানায়, রাত ৯টা- ১০টার পর হল গেটে অপরিচিত তরুণদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। অনেকে প্রকাশ্যে অস্ত্র-হাতে গেট পাহারা দেয়। গভীর রাতে হল ক্যাম্পাসে হোন্ডা অথবা গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেলে তরুণদের মধ্যে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এই সময় মাঝে মাঝে 'হলট' শব্দ শোনা যায়। অনেক সময় তারা হলের বৈধ ছাত্রের পরিচয়পত্র পরীক্ষাও করে। অপর একজন ছাত্র নিজের হলের বর্ণনা দিয়ে জানায়, ২দিন পূর্বে রাত ১০ টার দিকে হলের জনৈক আবাসিক শিক্ষক একা হল পরিদর্শনে আসলে সশস্ত্র তরুণদের বাধার সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে তার সম্মুখে অস্ত্র উঁচানো হয়। পরে পরিচয় পেয়ে তরুণরা অস্ত্র লুকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে।

সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা ও ডা. মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে পৃথকভাবে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত ছাত্রদলের সভায় বলা হয়, যারা ডা. মিলনের হত্যাকারীদেরকে সংগঠনে আশ্রয় দিয়েছে তাহারা জনগণের শত্রু।

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্র মৈত্রী, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পৃথক সভায় অবিলম্বে ডা. মিলনের হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবী করেছে। উভয় সভায় ছাত্র ঐক্যের ভাঙ্গনের জন্য দুইটি ছাত্র সংগঠনকে দায়ী করা হয়।

ডা. মিলন হত্যার আসামী মাসুদ গ্রেফতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সন্ত্রাসী কথিত মাসুদুর রহমান ওরফে মাসুদকে ৯ সেপ্টেম্বর মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল হতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার করে। মাসুদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে একদল ছাত্র নীলক্ষেত এলাকায় ৩টি গাড়ী ভাংচুর এবং একজন পুলিশ সার্জেন্টের মোটর সাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে।

পুলিশ জানায়, ১৯৯০ সালের নভেম্বরে গণ আন্দোলন চলাকালে ডা. সামসুল আলম খান ওরফে মিলন হত্যার অন্যতম আসামী বলে কথিত মাসুদুর রহমান মাসুদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হলে অবস্থান করছে। এমন খবর পেয়ে গোয়েন্দা পুলিশের ৪টি বিশেষ দল হলে আকস্মিক অভিযান চালায়। মাসুদ ও তার সহযোগীরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলিবর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পুলিশ মাসুদুর রহমানের পিছু ধাওয়া করে তার হাঁটুর নিচে এক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। মাসুদ মাটিতে পড়ে পুনরায় দৌড়াতে চেষ্টা করে এবং কাজী নজরুল ইসলাম হলের একটি কক্ষে আত্মগোপন করে। পুলিশ তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তার অন্য সহযোগীরা পালিয়ে যায়। মাসুদের পিতার নাম মোখলেছুর রহমান। তার দেশের বাড়ী

www.pathagar.com

পটুয়াখালীর দশমিনা গ্রামে। ইতিমধ্যে সিআইডি পুলিশ মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেছে।

টিভির খবর : শুধু ভয়েস কাস্টিং বন্ধ হয়েছে

সরকারের পরিবর্তন হলেও ভয়েস কাস্টিং বন্ধ ছাড়া টেলিভিশন সংবাদে গুণগত কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে ভয়েস কাস্টিং বন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন শুধু ভয়েস কাস্টিং গিয়েছিল। ওসমানী মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। রাতের টেলিভিশন সংবাদে ভয়েস কাস্টিং হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী পরদিন নির্দেশ দেন, 'এরশাদীয় কায়দায়' সংবাদ যাবে না। টিভিতে এখন সরকারী খবরের প্রাধান্য বেশি হওয়ায় বিরোধী দলের খবর ক্রমেই কমছে। মন্ত্রীরা টিভিতে নিজেদের খবর প্রচারের জন্য প্রতিযোগিতা করছেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মন্ত্রীদের এই প্রতিযোগিতায় বিরক্ত। দুই-একবার মন্ত্রীদের প্রতিযোগিতা না করার জন্যও বলেছেন।

তারপরও মন্ত্রীরা আগের মতই সরাসরি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে ক্যামেরার জন্য ফোন করেন। সরাসরি বার্তা বিভাগে ফোন করে অনুযোগ করেন, অমুকের প্রচার হলে আমার প্রচার হবে না কেন? মন্ত্রীদের জনসংযোগ কর্মকর্তারা প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকেন এই নিয়ে। বেচারী অসহায় বার্তা কর্মীদের বক্তব্য: আমরা বিরোধীদলের খবর দিতে চাই। মানসিকভাবে আমরা সে রকম প্রস্তুত। এজন্য সরকারী দিক-নির্দেশনা দরকার। ছয় মাস হতে চলছে স্পষ্ঠভাবে আমাদের কিছু বলা হয় নি। সংবাদের সময়ও ঠিক থাকছে না। সাধারণত আটটায় বাংলা সংবাদ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। মাঝে মধ্যে ত্রিশ হতে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত গড়ায়। ফলে মন্ত্রীদের প্রচারণা বেশি হয়। বিরোধীরা একদম বাদ পড়েন। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রচার হওয়াটা স্বাভাবিক। এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। হালে দেখা যাচ্ছে 'লায়ন্স'-এর খবর প্রতিদিন প্রচারিত হচ্ছে। স্থানীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের খবর প্রচারের জন্যও মন্ত্রীগণ টিভি কর্তৃপক্ষকে ক্যামেরা পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান।

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বিরোধ : ক্যাম্পাসে কারফিউ

২৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছিল রণক্ষেত্রে। প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (আ-অ) কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে গোলাগুলির ঘটনায় ২ জন ছাত্র নিহত ও ১৫ জন ছাত্র-তরুণ ও টোকাই আহত হয়। নিহত ২ জন মীর্জা গালিব ও শফিকুল ইসলাম লিটন তারা ছিল ছাত্রদলের কর্মী। আহতদের মধ্যে ছাত্রলীগ (আ. অ) কর্মী মিজানুর রহমান মিজান ও ২ জন টোকাইর অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। মিজানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। পুলিশ বলেছে; কারফিউ ভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্যাম্পাসে অসংখ্য পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

www.pathagar.com

প্রায় ৪ মাস ধরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীদের মধ্যে অব্যাহত সন্ত্রাসের জের ধরে ২৭ অক্টোবরের গুরুতর ঘটনা ঘটে। সাম্প্রতিক সময়ের সব চাইতে ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী ঘটনায় ক্যাম্পাসে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ক্লাসরুম, লাইব্রেরীতে শ্বাসরুদ্ধকর সময় কাটান। একই সময় নগরীর বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার শুরু বেলা ১২ টায়। ক্যাম্পাসে যথারীতি ক্লাস চলছিল। অকস্মাৎ ক্যাম্পাসে গুলি বিনিময় শুরু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা প্রাণভয়ে ছোটা-ছুটি শুরু করে। একজন ছাত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান হঠাৎ করে গোলাগুলি শুরু হলো। কলাভবন ক্যাফেটেরিয়া ও লাইব্রেরী এলাকায় ছাত্রদলের সশস্ত্র-কর্মীরা এবং টিএসসি, রোকেয়া হল এলাকায় ছাত্রলীগের (আ-অ) কর্মীরা কখনো থেমে থেমে কখনও একটানা গুলি বিনিময় করছিল। আমরা ঠিক যেন কোনো ছায়াছবির রুদ্ধ শ্বাস কর দৃশ্য দেখছিলাম। প্রকাশ্য দিবালোকে দুই পক্ষ অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। দূরে পুলিশ অসহায় দর্শকের মতো তাকিয়ে আছে।

ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

বেলা ২ টার দিকে ছাত্রদলের কর্মীরা তাদের অবস্থান পাল্টায়। তাদের কেউ কেউ ভাষা ইনস্টিটিউট অতিক্রম করে লাইব্রেরীর পাশে অবস্থান নিলে ছাত্রলীগ কর্মীদের কেউ টিএসসির কোণায় এবং কয়েকজন রোকেয়া হলের গেট টপকে ভিতের ঢুকে পড়ে। এই সময় ভয়াবহ গোলাগুলি শুরু হয়। এক পক্ষ ভাষা ইন্সটিটিউটের ছাদে, অন্য পক্ষ রোকেয়া হলের গেস্টরুমের ছাদে উঠে গুলি বিনিময় করে। বেলা সোয়া দুইটায় ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে ছাত্রদল কর্মী ঢাকা কলেজের ছাত্র মির্জা গালিব গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে গোলাগুলির তীব্রতা বেড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই গালিব মারা যায়।

গুলিবিদ্ধ মির্জা গালিব ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তার পক্ষের তরুণরা তখন তাকে আনার জন্য কয়েকবার ক্রলিং করে ব্যর্থ হয়। যখনই মির্জাকে আনার জন্য কেউ ক্রলিং শুরু করে তখনই প্রতিপক্ষের দিক হতে বৃষ্টির মতো গুলি শুরু হয়। প্রায় আধঘন্টা ধরে গোলাগুলি শেষে ভাষা ইনস্টিটিউটের দুই দিকের দেওয়াল ডেঙ্গে ছাত্রদল কর্মী লিটন সহ অন্যান্যরা মির্জা গালিবকে আনতে গেলে ঘাতক বুলেট লিটনের পেট ভেদ করে চলে যায়। গুলিবিদ্ধ মির্জা ও লিটনকে সরাতে গিয়ে আনিসুর রহমান, হেদায়েত উল্লাহ ও মিজানুর রহমান নামে ৩ জন ছাত্রদল কর্মীও গুলিবিদ্ধ হয়।

পুলিশের আহবান

বেলা সোয়া ২ টায় ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে মির্জার মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেই গোলাগুলি চলছিল দুই পক্ষের মধ্যে। সাধারণ ছাত্রদের অনুরোধে টিএসসি এলাকা হতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা মাইকে বলতে শুরু করলেন, ভায়েরা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন করিবেন না। আপনারা গোলাগুলি থামান। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আটকে পড়েছেন। পুলিশ কর্মকর্তার আকুতি কোনো কাজে আসে নি। বরং গোলাগুলির ঘটনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধ

মির্জা ও লিটন গুলিবিদ্ধ হলে ছাত্রদলের অবস্থান হতে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এক পর্যায়ে কর্মীরা হাকিম চত্বরে এসে পড়ে। এই সময় টিএসসির পাশে রেজিস্ট্রারের বাসভবনের সামনে ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়। তার মাথায় গুলি লাগে। একই সময় ছাত্রদলের অবস্থানে ২ জন টোকাই এবং ছাত্রলীগের অবস্থানে শফিউল আলম, শফিকুল ইসলাম ও জাফর সাদী বিপ্লব নামে ৩ জন ছাত্রলীগ কর্মী এবং মোক্তার আলী নামের একজন গার্মেন্টস শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়। ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে ভাষা ইনস্টিটিউটের করিডোরে, হাকিম চত্বরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখে অনেকে শিউরে উঠে। গুলিতে অজ্ঞাতনামা টোকাইয়ের ভুড়ি বের হয়েছিল এ বর্ণনা দিয়া ১ জন টোকাই কেঁদে ফেলল। বলল, স্যার পিচ্চি সিগারেট বিক্রি করত।

লাশ নিয়ে মিছিল

ভাষা ইনস্টিটিউটের সামনে হতে গুলিবিদ্ধ লিটন ও মির্জাকে পিজি হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার তাদের মৃত ঘোষণা করে। ছাত্রদলের কর্মীরা লাশ নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভাশেষে লাশ ডাকসু ভবনের সামনে আনার পর হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সূচনা হয়। লিটনের সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এসময় ছাত্রদলের কর্মীরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

লাশের পাশে প্রধানমন্ত্রী

২৮ অক্টোবর বেলা পৌনে দুইটায় প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া নিহত ছাত্রদল নেতৃদ্বয়ের লাশ দেখার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে অনেক ছাত্রদল কর্মী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারা লিটন ও মির্জা গালিবের হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে। ছাত্রদল কর্মীরা বলেন, ম্যাডাম, আমরা আমাদের সহকর্মীর হত্যার বিচার চাই। আমরা এভাবে কতদিন প্রাণ দেব?

হত্যাকান্ড ছাত্রদলের আত্মকলহের পরিণাম– আওয়ামী লীগ

আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমীর হোসেন আমু এক বিবৃতিতে রোববার ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ঢাবি-এ সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনা মূলত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের দুই বিবাদমান গ্রুপের মধ্যকার অন্তর্কলহের পরিণাম। অথচ সরকারী প্রেসনোটে এই ঘটনাকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসেবে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিবৃতিতে আমু বলেন, ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় ছাত্রদল নামধারী সংগঠনটি চর দখলের কায়দায় ঢা. বি. সহ প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। তাদের হামলায় ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের শরীফুল ইসলাম শরীফ, পরাগ, চয়ন,

www.pathagar.com

মল্লিক, স্বপন সহ অনেক নেতা কর্মী প্রাণ দিয়াছে। তারা মুন্সীগঞ্জ হাসপাতালে মুমূর্ষ ছাত্র নেতা শাহীনকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এসব হত্যাকান্ডের দায়দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে ছাত্রলীগের উপর চাপানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। জনাব আমু আরো বলেন, রোববার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়। ২৫ অক্টোবর রাতে ছাত্রদলের ইলিয়াস ও কামরুজ্জামান রতন গ্রুপের সংঘাতে ছাত্রদল কর্মী শাহজাদা ও ববি গুলিবিদ্ধ হয়। সেই ঘটনার জের হিসেবেই রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আভ্যন্তরীণ সংঘাতে বহিরাগত মীর্জা গালিব ও শফিকুল ইসলাম লিটন নিহত হয়েছে।

দুই দল মুখোমুখি

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজয় অর্জনের পর আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রাধান্য প্রায়। রাজনৈতিক লক্ষ্য, তিন জোটের রূপরেখা, সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার উর্ধ্বে উঠে আসে ক্ষমতার প্রশ্ন। বিভিন্ন ঘটনায় এর বর্হিপ্রকাশ ঘটতে থাকে। অবশেষে এরশাদ সরকার পতনের এক বছর পর ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একই স্থান ফুলবাড়িয়া-গুলিস্তানে গণঅভ্যুত্থান দিবসের আলোচনা সভা আয়োজন করে। এ সময় পুরো এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ নেয়। পাল্টাপাল্টি বোমাবাজি ও গোলাগুলি চলে। পত্রিকার ছবিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পুলিশের ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসে মুখ ঢেকে সভাস্থলে শংকিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাটি দু'দলের দূরত্ব বৃদ্ধিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

ছাত্রলীগে কোন্দল

'৯২ সালের ৯ জানুয়ারি শেখ হাসিনা টি এস সি সড়ক দ্বীপে ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে উপস্থিত থাকা অবস্থায় জগন্নাথ হলে আবাসিক শিক্ষকদের বাসভবনের নিচে ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে খুন হলো হাবিব-অসীম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরবর্তী সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় সভাপতি প্রার্থী মনিরুজ্জামান বাদল। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বিশাল বিপর্যয় আসে। শেখ হাসিনা বাদল হত্যার দায়ে মোস্তফা মোহসীন মন্টুকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। ছাত্রলীগের মধ্যে মন্টু গ্রুপের জন্ম হয়। ছাত্রলীগের মন্টু গ্রুপ দুর্ধর্ষ থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ নামেও পরিচিতি পায় এবং পুরো '৯২ সাল জুড়েই একের পর এক হল দখলে নিজেদের যুদ্ধংদেহী আধিপত্য বজায় রাখে। ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ কমান্ডো স্টাইলে জহরুল হক হল দখল করে, জগন্নাথ হলে ওয়ার্লেস সেট নিয়ে বিদেশী দামী অস্ত্র-শস্ত্রসহ হামলা চালায়, মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি, সূর্যসেন হল, হল চত্বরসহ সকল স্থানে গোলাগুলি অব্যাহত রাখে। ছাত্রলীগের হাবিব-অসীম-এর নেতৃত্বাধীন মূল দলটি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। থার্ড ওয়ার্ল্ডের নেতারা হল দখল করে সাধারণ ছাত্রদের বলে, আর কোন ভয় নাই, হলে থার্ড ওয়ার্ল্ড, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড বলে কিছু থাকবে না। সবাই সমান।

www.pathagar.com

সে সময় একজন ছাত্র নিজের হলের পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বহিরাগতদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গেস্ট রুম, টিভিরুম সর্বত্র বহিরাগতদের দাপট। রাতে সশস্ত্র সন্ত্রাসী পালা করে হল গেটে প্রহরা বসায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ। বছর জুড়ে প্রায় প্রতিদিন পত্র পত্রিকা শিরোনামে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের খুনোখুনি, মারামারি, গোলাগুলি, হল দখল, ক্যাম্পাসে আতংক ইত্যাদি ফলাও করে প্রকাশ পায়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক ছিল যে, ক্যাম্পাসের আশেপাশের স্কুল-কলেজ এবং ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের কার্যক্রম নিয়ে শংকার মধ্যে পড়তো। ক্যাম্পাসে অবস্থিত স্কুল-কলেজগুলোর ছাত্র-অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তায় ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল হলেও গোলমালে ভয়ে বাচ্চাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া বা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। সেসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সরকারী দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকেই বেশী গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে, যা পরবর্তীকালে কালচারে দাঁড়িয়ে যায়। ছাত্রলীগের চলতে থাকা এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল ঘাতক দালালদের নির্মূলের আন্দোলন বেগবান হয়। আন্দোলনে আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল ও বাম ধারার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সংগঠন সংহতি জানিয়ে এগিয়ে আসে।

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ গোলাগুলি

১৩ মার্চ ১৯৯২ তারিখের সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় টিএসসির আনন্দমুখর পরিবেশে হঠাৎ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (হাবীব-অসীম) কর্মীদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। ১৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের খবর অনুযায়ী সেদিনের গোলাগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। টিএসসির সড়ক দ্বীপে দলের কর্মীরা বসেছিল। এক পর্যায়ে টিএসসি এলাকায় একদল কর্মীর আবির্ভাব ঘটলে একপক্ষ হতে 'ধর' শব্দ উচ্চারণ হওয়ার সাথে সাথে গোলাগুলি শুরু হয়। ছাত্রলীগের কর্মীরা ডাসের সম্মুখে এবং ছাত্রদল কর্মীরা ডাস সংলগ্ন সোপার্জিত স্বাধীনতা'র আড়ালে গুলি বিনিময় করে। দুপক্ষের মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র ৪০-৫০ গজ। উভয় পক্ষের কেউ কেউ রাস্তায় শুয়ে ফিল্মী কায়দায় গুলি ছুঁড়তে থাকে। এই সময় টহলরত পুলিশের চেহারা ছিল করুণ। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দর্শকের ভূমিকা নিল। গোলাগুলির ঘটনায় বিভিন্ন নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কয়েকশত কর্মীসহ কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রাণভয়ে ছোটাছুটি শুরু করে। এ সময় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস-বিরোধী মিছিল চলতে থাকায় গুলিবিদ্ধ হয় রাজুসহ ১০-১২ জন ছাত্র-ছাত্রী। গুলিবিদ্ধ রাজুর মৃত্যু হলে রাজুর সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ক্যাম্পাসে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সূচনা হয়। কয়েক মিনিটের মাথায় রাজুর গুলিবিদ্ধ স্থান সড়ক দ্বীপের পশ্চিম কোণার রাস্তায় হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় জমে। এলাকায় চাপ-চাপ রক্ত ও মাথার মগজ পড়ে থাকায় পার্শ্ববর্তী শিক্ষকের বাসা হতে রক্ত জবা ফুল এনে

www.pathagar.com

এলাকাটি ঘিরে দেয় রাজুর সহপাঠীরা। পরদিন গায়েবানা জানাজায় ভিসি মনিরুজ্জামান মিয়া, শিক্ষক সমিতির এস. এ ফয়েজ সহ হাজার হাজার ছাত্রজনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জমায়েত হন।

রাজু হত্যার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য বিশাল মিছিল বের করে। মিছিল চলাকালে হঠাৎ কয়েকজন সশস্ত্র তরুণ অস্ত্র উচিয়ে 'ধর' 'ধর' শব্দে চিৎকার করলে এবং গুলি চালালে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়। পুলিশের লাঠিপেটায় ছাত্রীরাও আহত হয়। পরে আবার মিছিল সংগঠিত হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে পৌছে বিশাল ছাত্র-সমাবেশ ঘটায়। ছাত্রনেতা নাজমুল হক প্রধান, বেলাল চৌধুরী, রুহিন হোসেন প্রিন্স আব্দুস সাত্তার খান, আমিনুল ইসলাম, মিজানুর রহমান চন্দন প্রমুখ বক্তব্য দেন। সমাবেশে রাজু হত্যার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে বলা হয়, ২৬ মার্চ ১৯৯২ গণ আদালতে '৭১ এর ঘাতক গোলাম আজমের বিচার নস্যাৎ এর জন্য সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল পল্টন মোড়ে পৌছা মাত্র পুলিশ লাঠিচার্জ করে। অসংখ্য নেতা-কর্মী আহত হন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ছাত্রদের রক্ষা করতে গেলে পুলিশ তাকে লাঞ্ছিত করে।

পথচারী এবং আহত ছাত্রদের ছবি তুলতে গিয়ে সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হলে এর প্রতিবাদে ফটো সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তায় বসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ ঘটনায় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলসমূহ মিছিল-মিটিং নানা বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও ছাত্রনেতা রাজুর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করা হয়।

বিএনপি-আওয়ামী লীগ বিরোধ

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল না করা, সন্ত্রাস দমন আইন পাশের মাধ্যমে বিরোধী দলকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাসহ নানা ইস্যুতে বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে থাকে। তবে সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয় যখন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ১২ আগস্ট ১৯৯২ তারিখে দিবাগত রাত ৩ টায় অর্থাৎ ১৩ আগস্টে বিভক্তি ভোটে নাকচ হয়ে যায়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ১২২টি বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি। জামায়তের ২০ জন ভোটদানে বিরত থাকে। এনডিপি সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং ইসলামী ঐক্য জোটের ওবায়দুল হক ভোটাভুটি শুরুর পূর্বেই সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

মূলত এরপর থেকে দু'নেত্রী তথা দু'দলের মধ্যে মেরুকরণ স্থায়ী রূপ নিতে শুরু করে। বৈপরীত্যকে মুখ্য ভেবে নীতি-আদর্শের তোয়াক্কা না করে নেত্রীদ্বয়কে খুশী করার জন্য নিজ নিজ দলের ছাত্র সংগঠনগুলো দোষারোপের কুপ্রথা রাজনীতিতে চালু করে। ফলে দলের নেত্রী দড়িকে সাপ বললে ছাত্র নেতারা জ্ঞান-মেধাকে জলাঞ্জলী দিয়ে অনুগত ভৃত্যের মতো দড়িকে সাপই বলেন আবার নেত্রী সাপকে দড়ি বললে তারাও বলেন উঠেন, ঠিক বলেছেন নেত্রী/ম্যাডাম ওটা সাপ নয়, দড়িই বটে!

www.pathagar.com

আগে এও বলেছি ৩১ মে ১৯৮১ ছাত্রদলের কাউন্সিল নির্ধারিত ছিল, যা ৩০ মে জেনারেল জিয়ার হত্যার মধ্যে দিয়ে পিছিয়ে যায়। ছাত্রদলের এই সম্মেলনই অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দেড়মাস পরে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হলো একই কাউন্সিল। আগে থাকতেই ঘোষণা করা হল কারা কারা প্রার্থী হবেন। কাউন্সিলারদের মতামতের ভিত্তিতে জনাব গোলাম সরওয়ার মিলন সভাপতি এবং কাশেম চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ছাত্রদলের এক প্রাক্তন নেতার বক্তব্য অনুযায়ী '৯১ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিলো।

'৯২-এর ১৬ জুন পুনরায় ছাত্রদলের সম্মেলন ঘোষণা করা হয়। ঐ সম্মেলনে মিলন, আলম, এ্যানি, জগলুসহ অনেক ভালো ভালো নেতা থাকলেও ভোটের মাধ্যমে রিজভী ও ইলিয়াস কমিটি হয়। কিন্তু ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা কর্মীরাও তা মেনে নেয়নি। তারা এরকম প্রচারণা চালায় যে ইলিয়াস জেলার নেতাদের স্বর্ণের চেইন ও সাইফুর রহমানের আশীর্বাদ দিয়ে প্রভাবিত করেও যখন হতে পারেনি তখন সাইফুর রহমান খালেদা জিয়াকে বলে ইলিয়াসকে সাধারণ সম্পাদক করেছে। ইলিয়াস পরের দিন ক্যাম্পাসে এলেই প্রতিরোধ হলো। ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হলো। প্রতিদিন ছাত্রদল নিজেদের মধ্যে সকাল-বিকাল, সারারাত গোলাগুলি করে। ফলসরূপ দেখা গেল ইলিয়াস গ্রুপের হাতে আর কোন হল রইল না। ইলিয়াস গ্রুপ মরিয়া হয়ে উঠে হল দখল নিতে। এই সময় খালেদা জিয়া বিদেশ গেলে ইলিয়াস গ্রুপ হল উদ্ধারের চেষ্টায় সূর্যসেন হল আক্রমণ করে।

ছাত্রদলে কোন্দল

'৯২-এর সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত ৩ টায় ইলিয়াস আলীর সমর্থক শামীম-শিব্বির গ্রুপের একদল সশস্ত্র কর্মী সূর্যসেন হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এর আগে সূর্যসেন হল ছাত্রদল নেতা কামরুজ্জামান রতন সমর্থিত সাঈদ-সোহরাব গ্রুপের দখলে ছিল। গেটে পাহারারত সাঈদ-সোহরাব গ্রুপের সশস্ত্র প্রহরীরা গ্রুপের সাথে বেঈমানী করলে শামীম-শিব্বির গ্রুপ বিনা বাঁধায় হলে প্রবেশ করে। তাৎক্ষণিক তারা ২৬৫ নং কক্ষে সাঈদ-সোহরাব গ্রুপের মামুন ও জুনায়েদের উপর গুলি চালায়। পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দোতলা থেকে লাফিয়ে জুনায়েদ প্রাণে বাঁচলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ছাত্র আশরাফুল আযম মামুন নিহত হন। ৪ সেপ্টেম্বর সকালে খন্দকার মাহমুদ হোসেন সোহেল নামে শামীম-শিব্বির গ্রুপের আরেকজন ছাত্র মুজিব হলের দেয়াল টপকে বাইরে যাবার সময় প্রতিপক্ষ সাঈদ-সোহরাব গ্রুপের কর্মীদের হাতে পড়েন এবং সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে পড়তেন।

সূর্যসেন হলে মামুনের রক্তাক্ত লাশ হলের পানির ট্যাংকে ঢুকিয়ে মুখ লেপতোষক-বালিশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জের ধরে সমস্ত ক্যাম্পাস জুড়ে আতংকের ছায়া বিস্তার লাভ করে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বেগম জিয়া বিদেশ থেকে ফিরে ৬ সেপ্টেম্বর '৯২ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত করেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য '৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হালিম-মুন্না-রহিম, হত্যাকাণ্ডের পর ঐ বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলিয়াস-নিরু-অভিসহ ১৪ জনকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তী সময়ে '৯২-এর ১৬ জুন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সারা দেশের কাউন্সিলদের প্রত্যক্ষ ভোটে ইলিয়াস আলী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২ আগস্ট ছাত্রদলের নির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুমোদন ছাড়া ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হলে নির্বাচিতদের সঙ্গে মনোনিতদের অন্তর্কলহ শুরু হয়। এরই জের ধরে ৩০ আগস্ট ইলিয়াস সমর্থক ও রতন সমর্থকদের বন্দুক যুদ্ধে ১ জন এবং ৪ সেপ্টেম্বর ২জন ছাত্র নিহত হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ইলিয়াস আলীকে তার শ্যামলীস্থ বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। একই সাথে বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান রতনের সন্ধানে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকে। এছাড়া ক্যাম্পাসে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন ৩৬ জন ছাত্র নেতার খোঁজে অভিযান চলে এবং পর্যায়ক্রমে তারা একে একে গ্রেফতার হন।

পত্রিকার খবর অনুযায়ী, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ইলিয়াস আলী জোড়া খুনসহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করলেও গোয়েন্দা পুলিশ এসব কর্মকাণ্ডের সাথে তার জড়িত থাকার কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে বলে বিশেষ সূত্রে প্রমাণ আসে। পুলিশের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ইলিয়াস আলীর আটক প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিনিধিকে জানান, "সবইতো বোঝেন ইলিয়াস আলী সরকারী দল বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে তিনি বিদেশ ঘুরে এসেছেন। তাই উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত ছাড়া তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া পুলিশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ কখন আবার কি হয়ে যায়।"

এদিকে সরকারী ছাত্র-সংগঠনের নাম ভাঙ্গিয়ে ছাত্র নামধারী ও সুযোগ-সন্ধানী তরুণরা সন্ত্রাসের পাশাপাশি চাঁদাবাজী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। ৯২-৯৩ সালে দেখা যায়, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে বিনা টিকিটে সিনেমা দেখা, পুলিশের বাঁধায় ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদি রুটিন বাঁধা, দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। ব্যবসায়ী-মধ্যবিত্তরা, যারা আগে গুণ্ডা মাস্তান, অশিক্ষিত সন্ত্রাসীদের ভয় পেত, ঘৃণা করতো, ছাত্রদের বন্ধু ভাবতো, ছাত্র-রাজনীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো '৯২ পরবর্তী সময়ে ছাত্র নামধারীদের ব্যাভিচার-অনাচারে তারা ক্রমান্বয়ে তাবৎ ছাত্র-সমাজের রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হতে শুরু করে।

১৯ ডিসেম্বর '৯২-এ ড. কামালের গণতান্ত্রিক ফোরামের উদ্যোগে তিন জোটের রূপরেখা দিবস উপলক্ষে ৫ ঘন্টা ব্যাপী এক বিশাল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দেশের বুদ্ধিজীবী মহল, পেশাজীবী পরিষদ, শিল্প-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং প্রখ্যাত ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা দুই নেত্রীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। ডা. মিলন সহ অন্যান্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত চিহ্নিত অপরাধীদের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে আশ্রয় দেবার জন্য দুই নেত্রীর প্রতি নিন্দা জানায় বিভিন্ন দল-মতের ছাত্রনেতারা। অনুষ্ঠানের বলা হয় নেত্রীদ্বয় একক ঘোষণায় ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ড

www.pathagar.com

স্থগিত করেন, পারিবারিক ঝগড়া করেন, নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করেন। বক্তৃতায় ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, দুই নেত্রীর আঁচলের গিটে ছাত্র সমাজসহ সমগ্র দেশ আটকে গেছে, এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে না পারলে গোটা জাতি অন্ধকারে পতিত হবে।

এমনই অবস্থায় ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠিত হয়। নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে ছাত্রদলের সভাপতি নিযুক্ত করেন বেগম খালেদা জিয়া, যিনি খুনসহ বিভিন্ন অভিযোগে আজও কারাগারে।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ

ছাত্রদল সম্পর্কে যখন আমরা এ সব আলোচনা করছি তখন আমাদের ছাত্রলীগ নিয়েও একটা আলোচনা জরুরী। কারণ ছাত্রলীগও এসবের উর্ধ্বে ছিল না।

১৯৯২ সালের ৯ জানুয়ারি শেখ হাসিনা টিএসসি সড়ক দ্বীপে ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে উপস্থিত থাকা অবস্থায় জগন্নাথ হলে আবাসিক শিক্ষক সমাবেশে উপস্থিত থাকা অবস্থায় জগন্নাথ হলে আবাসিক শিক্ষকদের বাসভবনের নিচে ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে খুন হলো হাবিব-অসীম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরবর্তী সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় সভাপতি প্রার্থী মনিরুজ্জামান বাদল।

বাদল হত্যার ৪/৫ মাস পরে ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সুজন আনছারী বিদায় নেয়। লিজু ও পংকজ নেতৃত্বে আসে। আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসে মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও ইকবালুর রহিম। উল্লেখ্য নির্বাচনের পর বাকশাল আওয়ামী লীগে যোগ দেয় এবং ঐ বাকশালীদের পক্ষে থেকে ইকবালুর রহিম সাধারণ সম্পাদক হন। এর আগে ইকবাল জাতীয় ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

এই সময় ছাত্রলীগের অবস্থা খারাপ ছিলো। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের পরিশ্রমে সংগঠনের কার্যক্রম, কর্মসভা সহ নিয়মিত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চলছিলো। এর মধ্যে কয়েক দফা গোলাগুলি হয় ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে। ইতিমধ্যে হলগুলোতে দখলদারিত্ব কায়েম হয়েছে। জহুরুল হক হল মন্টু গ্রুপের দখলে ছিল। এস এম হলে জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রদলের সহ অবস্থান। ছাত্রলীগের তখন হল মাত্র জগন্নাথ। তবে সবচেয়ে ভালো সহ অবস্থান ছিলো সূর্যসেন হলে। সূর্যসেন হলে সব দলই ছিলো। তখন পর্যন্তও ডাকসুর শেষ সংসদ আমান-খোকন ও আলম সক্রিয় এবং ডাকসু নির্বাচনের চেষ্টায় ছিলো বিএনপি ও ছাত্রদল। সে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত একটি মহলের কারণে ব্যর্থ হয়।

এই সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মইনুদ্দিন-ইকবাল ঘোষণা দেন যে তারা সময়সীমার মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে চান। সম্মেলন হবে এই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়। লিজু পঙ্কজ হল সম্মেলনে হাত দেয়। অনেক নাটক, মারামারি, গোলাগুলি সত্ত্বেও তারা ১৫টার মধ্যে ৬টা হলে কমিটি ঘোষণা করে। অতঃপর ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে আসেন বাহাদুর বেপারী ও আবদুল ওয়াদুদ খোকন। উল্লেখ্য বাহাদুর ও খোকন মাত্র তিন জনের কমিটি দিয়ে ৪ বছর পরে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা নিয়ে অনেক নাটক হয়। উন্মোচিত হয় আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কারো কারো স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয় নেতা খিজির হায়াত লিজু ছিলেন একজন শক্তিশালী সভাপতি পদপ্রার্থী। ভোটে তিনি জিততেন বলে মত প্রকাশ করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী। কিন্তু ভোট হয় না সেখানে। ঘোষিত হয় শামীম-শাকিল কমিটি। মাত্র ৯ ঘণ্টা স্থায়ী হয় এ কমিটি। অতঃপর জনাব আমীর হোসেন আমু আসেন দায়িত্ব নিয়ে। গঠিত হয় শামীম-পান্না পরিষদ। অশান্ত হলো ছাত্রলীগ। গ্রুপিং সংঘর্ষে রূপ নিতে থাকল। মন্টু গ্রুপের ছেলেরা জহুরুল হক হল তাদের দখলে রাখলো। ঐ দিকে শামীম-পান্না ক্যাম্পাসে আসতে বাঁধা পেল। সভাপতি হতে না পারলেও তখন লিজুর প্রচণ্ড দাপট। ঐ সময় কিছু গুপ্ত হত্যা হয়। ছাত্রলীগের জয়দীপ বাপ্পি, জাকির জগন্নাথ হলের মধ্যে খুন হয় এবং টিএসসিতে ফিরোজের হাঁটু গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পরিবর্তন হয়। ভিসি হলেন এমাজউদ্দিন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। পূর্বেই বলা হয়েছে '৯০-এর নির্বাচনের পরে ছাত্রদলের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান পদত্যাগ করলে মনিরুজ্জামান মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারী পাণ্ডাদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। পূর্ব পাকিস্তানে এন, এস, এফ-এর আমলে এ রকম হয়েছিলো। ভিসি এবং শিক্ষকদের একটি গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছেন সেটা আমরা স্বাধীনতার পরে দেখেছি। মনিরুজ্জামান মিয়াকে নিয়ে আমি বড় কোন সমালোচনা করব না। কারণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দিকে দৃষ্টি দেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সাথে মিটিং এর পর মিটিং করেন। পরিবেশ পরিষদের মিটিং করেন এবং ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সংগঠনগুলো নিয়ে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

ঢাবি প্রশাসনে লাগামহীন বিশৃঙ্খলা

কিন্তু এমাজউদ্দিন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে থাকে। অভিযোগ ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ছাত্ররাজনীতিতে সরাসরি মদদ দেওয়ার ছাত্রদলের নেতাদের কথায় বিশ্ববিদ্যালয় চলতো।

ঐ সময় মহসীন হলে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়, যা পরবর্তীতে এমাজউদ্দিন প্রশাসন ধামাচাপা দেয়। পাভেল নামে ভৈরবের এক হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান, মেধাবী ছাত্র, ৫ শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ১ম বর্ষ পর্যন্ত বৃত্তির টাকায় পড়ে এসেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে ভর্তি হয়। বাবা পরের বাড়ি কাজ করে তা দিয়ে সংসার চালায়। মহসীন হলে Attached হয়। হলে উঠতে হয় ছাত্রদলের নেতাদের হাত ধরে। হলে উঠেই কোমরে আসে কাটা রাইফেল। অল্পদিনে বেশভূষা পরিবর্তন, কেন্টিনে ফ্রি খাওয়া, হলে অনেক কিছুর নিয়ন্ত্রক। এক পর্যায়ে একটা চাঁদার টাকা তার হাতে আসে, কারণ ঐ টাকার জন্যে যে সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে হয়েছিলো তার কমান্ডিং

www.pathagar.com

নেতা সে ছিলো। তাই টাকাগুলো তার নেতার কাছে না গিয়ে পাভেলের হাতে আসে। টাকা পেয়ে পাভেল মনে করে ঐ টাকা ওর। ঐ টাকা দিতে সে অস্বীকার করে। ফলে তাকে ঐ দিন ভোর রাতে রুম থেকে নিয়ে আসা হয় মহসীন হলের প্রভোস্ট এর রুমের পাশের রুমে। ওখানে ফেলে সারাদিন ওর মুখ বেঁধে তিলে তিলে হত্যা করে জিয়া হল ও মহসীন হলের পাষণ্ডরা। তারা তার পুরুষ অঙ্গ থেতলে দেয়। ওকে বস্তায় ঢুকিয়ে পানি ভরা কাঁচের বোতল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বস্তরে বিরাজ করে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। উপাচার্যের মদদে ছাত্রদল বেপরোয়া। ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগসহ বাম সংগঠনগুলোও ছাত্রদলের রোসানলে পড়ে। তখন আওয়ামী লীগ রাজপথে, আন্দোলনে। বাকী প্রায় সকল সংগঠন আওয়ামী লীগের সমর্থনে। ঐ অবস্থায় মন্টু গ্রুপের সদস্যদের সাথেও ছাত্রলীগের দূরত্ব কমতে থাকে। তখন ছাত্রদল উত্তর পাড়া এবং দক্ষিণ পাড়ায় হলগুলোতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। ছাত্রলীগের ভালো সংগঠকদের চিহ্নিত করে হলের বাইরে চলে যেতে বাধ্য করতে থাকে। যাতে কিনা, আওয়ামী লীগের আন্দোলনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে অংশ গ্রহণ করতে না পারে।

ভিসি পরিবর্তনেও অবস্থার উন্নতি হয়নি

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর যখন আজাদ চৌধুরী ভিসি হন তখন শিক্ষকদের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে দলের আনুগত্য প্রকাশ করা, দলের পক্ষে কাজ করতে ও নিজের প্রভাব বিস্তার করতে নিজ নিজ দলের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করা, নিজ নিজ দলের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া শুরু হয়। বিএনপি প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির সাথে একই গতিতে মান হারাতে থাকে। শিক্ষকরা চেয়ারের জন্যে তাদের শিক্ষক সুলভ আচরণ ভুলে যেতে থাকেন, যার ফলে ছাত্র রাজনীতির মান আরো দ্রুত নামতে থাকে। এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষক আছেন যারা নিয়োগ পেয়েছেন দলীয় পরিচয়ে। কোন যোগ্যতা যাচাই না করে একাডেমিক রেজাল্ট বিবেচনার ক্ষেত্রেও মেধাবীদের বাদ দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অন্তহীন কোন্দল ও সন্ত্রাস

এই সময় ছাত্রলীগের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। আন্দোলন বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সম্ভবতঃ মন্টু গ্রুপে অনেকের মধ্যেই একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তারাও এই আন্দোলনে যোগ দিতে চায়। ছাত্রলীগের সঙ্গে তাদের একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে। ছাত্রলীগ ও মন্টু গ্রুপ যৌথভাবে ছাত্রদলকে আক্রমণ করে এবং জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লাহ হল থেকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বের করে দেওয়া হয়। তখন এই তিনটি হল সহ স্যার এ. এফ রহমান হল ছাত্রলীগের দখলে আসে।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। তখন ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। সম্মেলনের পর ২ বছর পার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩ জন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে ছাত্রলীগের সকল ক্ষমতার উৎস হয় ফরিদপুর গ্রুপ, যাদের বেশির ভাগ সদস্য বহিরাগত সন্ত্রাসী। তখন আওরঙ্গ ও লিয়াকতের আশীর্বাদপুষ্টরা ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করে। ১ম বছরে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলের মধ্যে জিয়া হল, জসিমউদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু হল বাদে সকল হলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ছাত্রদল বিতাড়িত হয়। কিছু ভয়ে পালায় বাকীদের বের করে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের এক সকালে ছাত্রদল ছাত্রলীগের মধ্যে মধুর কেন্টিনে সংঘর্ষ হয়। ঐ অজুহাতে ছাত্রলীগ উত্তর পাড়ার তিনটি হল আজই দখল করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং জসিমউদ্দীন হলে ছাত্রদলকে ধাওয়া দেয়। ছাত্রদল আগে বুঝতে পেরেছিলো, তারাও প্রস্তুত ছিলো। ছাত্রলীগ সূর্যসেন হলের সামনে থেকে ছাত্রদলকে ধাওয়া দিলে ছাত্রদল প্রথম গুলি করে জবাব দেয়। শুরু হয় তুমুল বন্দুক যুদ্ধ। তাতে মারা যায় ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পার্থ প্রতিম। ঐ দিন দুই পক্ষের গুলিতে একটা গরুও মারা যায়। সূর্যসেন হলের গরীব দারোয়ানের দুধ দেওয়া গাভী। যাই হোক পার্থর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গোলাগুলি শেষ। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ সকল হলের গেটে অবস্থান নেয়। অতঃপর কেন্দ্রীয় নেতারা হলে দেখা করতে আসে বিজয়ীর বেশে। ছাত্রদল ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়, নেতারা হল ত্যাগ করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চাপ দেয় এবং ধর্মঘটের হুমকি দেয়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদালয়ের ভিসি হয়েছেন আজাদ চৌধুরী। আজাদ চৌধুরী খুব দ্রুত ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে বসেন এবং তাদের হলে ওঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ধর্মঘট রোধ হয়।

আজাদ চৌধুরীর কারণে তখন ছাত্রলীগের নেতারা ছাত্রদলের নেতাদের হলে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু প্রতিটা হলে এমন সব কর্মকাণ্ড করে যাতে ছাত্রদল হল ছাড়তে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে একক অবস্থানে ছাত্রলীগ চলে আসে। আর ছাত্রদলের নেতৃত্ব পর্যায়ের ১০/১২ জন বিভিন্ন হলে থাকতে আরম্ভ করে।

বন্যা শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। তখন ছাত্রলীগের আহ্বানে ত্রাণ তৎপরতা শুরু হয়। পাশাপাশি ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের এক অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মেলনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এমন অবস্থা যে ৪ বছরে কোন কমিটি নেই। তিনজনে দল চালায়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে সম্মেলন ১৯৯৮ সালে বন্যা শেষ হওয়ার ৩৪ মাস পর। সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সাজ্জাদ, সাধারণ সম্পাদক আজিমসহ ৯ জনের কমিটি ঘোষণা হয় গণভবনে থেকে। তার অল্পদিন পরে কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয় এবং সভাপতি হন বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন।

www.pathagar.com

বাহাদুর বেপারী ও অজয় কর খোকন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসলে ছাত্রলীগের মধ্যে একটা গতিসঞ্চার হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তা আবার স্তিমিত হয়ে যায় এবং ছাত্রলীগের গ্রুপিং চরম আকার ধারণ করে। ঐ সকল গ্রুপিং আসলে কখনোই কোন নীতি নৈতিকতার গ্রুপিং নয়। সর্বস্তরে প্রাধান্য বিস্তার, টেন্ডারবাজী ও হল দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। আওয়ামী লীগের ক্ষমতার সময় ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন আজাদ চৌধুরী। ছাত্রলীগে তখন প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে গ্রুপিং এর ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক হিসেবে আজাদ চৌধুরী শক্ত হাতে সেসব দমন করেন। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা থেকে চলে যায় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ৭২ জন বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ছিলো।

তবে সাথে সাথে এটাও বলতে হয় এ সময়ে ছাত্র রাজনীতির গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। দিন দিন রাজনীতি অশ্লীল স্লোগান সর্বস্ব হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

বেগম জিয়ার দ্বিতীয়বারের শাসন

আগেই বলেছি এরশাদ সরকারের পতনের পর গণতন্ত্রের চাইতে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় দুটি দলেরই কাছে। ক্ষমতার প্রশ্নে তাদের সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক না হয়ে দিনকে দিন বৈরী হয়ে পড়ে। '৯১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা বিএনপির বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ আনেন এবং এর ওপরে একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিএনপি এই কারচুপির কথা কখনও স্বীকার করেনি। এই প্রচারে তেমন গাও করেনি। খালেদা জিয়ার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চেতনা ও তিন দলের ঘোষণার চাইতে দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। অপশাসনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অক্ষুন্ন রাখতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল তা উপেক্ষিত হয়। শিক্ষাঙ্গণেও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও দলবাজী অব্যাহত থাকে। সন্ত্রাস বিশৃঙ্খলার ফলে শিক্ষার পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বৈরি সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠে বিরোধী দলের প্রচারণাকে বিবেচনায় নেওয়ার চাইতে উপেক্ষা কৌশলই আঁকড়ে ধরে ক্ষমতাসীন বিএনপি।

১৯৯৫-র শেষ দিকে মাগুরা উপনির্বাচনে ন্যাক্কারজনক ঘটনায় আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দলীয় সরকারের বদলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি-জামায়াতের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। বিএনপি সরকার চাপের মুখে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংবিধান রক্ষার নির্বাচন করে। আওয়ামী লীগসহ জোটবদ্ধ দলগুলো বর্জন করলেও দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল সে নির্বাচনে অংশ নেয়। বিএনপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। সংসদের প্রথম অধিবেশনেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংবিধানের সংশোধন করে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পাস করে। সে অনুযায়ী মতেই অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন।

নির্বাচনে জিতে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি একইভাবে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে সরকার বিরোধীতাকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। আগে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যা করেছে বিএনপিও সেইভাবেই আন্দোলন-সংগ্রাম, সংসদ বর্জনের পথ গ্রহণ করে। অন্যদিকে ক্ষমতা পেয়ে আওয়ামী লীগও বিএনপির মতো শিক্ষাঙ্গণসহ সর্বত্র দলীয়করণ, দুর্নীতিতে মেতে ওঠে। ফলে পরিস্থিতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে সময় লাগেনি।

ফলে পরবর্তী নির্বাচনে আবারও সরকার পরিবর্তন হয়। ২০০১ সালে পুনরায় বিএনপি জামায়াতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে যখন ক্ষমতায় যায় তখন তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

প্রথম যে অভিযোগ ওঠে তা হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্বিচার নিপীড়নের। বিরোধীদলের ওপরেও বেধড়ক নির্যাতন চালায় তারা। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ বেশ খানিকটা বেদিশা, অসংগঠিত থাকলেও ২ বছরের মাথায় ঘুরে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে তারা।

সেই পুরানো দৃশ্য

ক্ষমতায় এসেই নতুন সরকার সব জায়গায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতা হারানোর ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত তখন শিক্ষাঙ্গণে ছাত্রলীগের অনুপস্থিতিতে ছাত্রদল জেঁকে বসতে তৎপর। আগের ধারা অনুসরণ করে তারা হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিয়ে নিজেদের মধ্যেও কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির অবনতি কীভাবে হয়েছিল সেটা বুয়েটের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েট ক্যাম্পাসে টেন্ডার নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। ক্লাস ও পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে পড়লে ছুটাছুটি করে নিরাপদ স্থান খুঁজতে থাকে। এসময় বুয়েটের মেধাবি ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ নিয়ে ক্যাম্পাস জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও বই খাতা ফেলে লাগাতার আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রদলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়।

ক্ষমতাসীন বিএনপি এই সময় হাইকোর্টের বিচারপতিদের বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে তাদের দলের এককালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় সম্পাদক কে. এম. হাসান পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তীব্রভাবে এর বিরোধীতা করে এবং অসংগঠিত ১৪ দল পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। তীব্রতা লাভ করলেও তা এমন তীব্র হয় নি যে জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে। বিএনপি-জামায়াত জোট তাদের পুরো টার্ম পূরণ করে। অতঃপর রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এতে যেন আন্দোলনে ঘৃতাহুতি হয়। দিনের পর দিন গণভবনের চতুর্দিকে অবস্থান ধর্মঘট চলতে থাকে। রীতিমতো সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে আন্দোলন। মৃত্যুবরণ করে অনেকেই। চার উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। এই অবস্থায় ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে জনাব ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। পুরা ঘটনা ঘটবার পেছনে সক্রিয় থাকে সামরিক বাহিনী। সামারিক বাহিনী অনেকটা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়তে বাধ্য করে। এই ঘটনা ইতিহাসে ওয়ান-ইলেভেন বলে পরিচিত।

জোট সরকারের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তী সময়ে ১৪ দল গঠিত হলে তাদের সহযোগী ছাত্রসংগঠনসমূহ এই আন্দোলনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল। যখন পুরা স্টেডিয়াম বা পল্টন এলাকা জুড়ে অবরোধ আন্দোলন চলছিল তখন ছাত্র সংগঠনগুলিও আলাদা করে মাঝে মাঝে তাদের কর্মসূচী

www.pathagar.com

পালন করছিল। কিন্তু এখন তো '৬৯ নয়। তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর মতো দ্বিধাগ্রস্থ নয় আওয়ামী লীগসহ বর্তমান দলসমূহ। অতএব রাজনৈতিক আন্দোলনকে ছাপিয়ে তখন আর ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠবার অবকাশ নেই। ওঠেও নি।

ছাত্রদল কি করছিল তখন? পরপর দুটি নতুন কমিটি গঠিত হয় ছাত্রদলের যার প্রথমটিতে সভাপতি নিযুক্ত হন হেলালউদ্দিন, যিনি দশ বছর আগে তার ছাত্রজীবন শেষ করেছিলেন। পরবর্তী কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বয়স্ক সালাউদ্দিন টুকু। যার কারণে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তারা। পাঁচ বছরের বিএনপির শাসনে তারা আন্দোলন দমনে সরকারের ঠ্যাংগাড়ে বাহিনীর দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র।

বুয়েটের মতো ঢাবির শিক্ষার্থীরাও রুখে দাঁড়িয়েছিল

সনি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে বুয়েটে যেমন ছাত্র বিক্ষোভ ঘটেছিল, তেমনি ২০০২ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা নিয়েও জেগে উঠেছিল ছাত্র সমাজ। ঐ দিন গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলের সাধারণ ছাত্রীদের ওপর অতর্কিত হামলা করে পুলিশ। ২৫ জুলাই প্রথম আলো'র খবরে শামসুন্নাহার হলের একজন ছাত্রী জানায়, পুলিশ আমাদের প্রহার করার সময় মেয়ে বলে এতটুকু ছাড় দেয়নি। পুরুষ পুলিশরা হল কক্ষের বাইরে থাকা মেয়েদের শুধু মারেনি, বরং সেই গভীর রাতে নিজের ঘর বা বাগানে লুকিয়ে থাকা মেয়েদের চুল ধরে টানতে টানতে গাড়ীতে উঠিয়েছে।

হল থেকে বহিরাগত ছাত্রীদের বহিষ্কার এবং অধ্যাপক সুলতানা শফিকে হল প্রভোস্টের দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট সময়কাল পার করতে দেয়ার দাবীতে শুরু হওয়া আন্দোলনের যে এরকম সমাপ্তি ঘটবে হলের কোন ছাত্রীই তা কল্পনা করেনি। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে পুলিশের হামলার ঘটনা ছিল এটাই প্রথম।

শামসুন্নাহার হলের প্রভোষ্ট সুলতানা শফি আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন। বিএনপি সরকারের আমলে তাকে ঐ পদ থেকে যেতে হবে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এজন্য প্রভোষ্ট অফিসে তালা মেরে তাকে মেয়াদ পূরণের আগেই যেতে বাধ্য করা হবে কেন? আর কেনই বা এ নিয়ে পুরুষ পুলিশ ছাত্রীদের আবাসিক হলে ঢুকে পড়বে? সাধারণ ছাত্রীদের বেপরোয়া মারধোর করবে? অপমানজনক কথাবার্তা বলবে এবং রাত দুপুরে গুরুতর ফৌজদারী আসামীর মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রীদের পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে? কেন এই অভিযানে ছাত্রীদের সঙ্গে পুরুষ পুলিশের অসংযত আচরণের অভিযোগ উঠবে? সকাল পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না?

ডিসি ও পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা

এত কিছুর পরও উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও পুলিশের পক্ষ থেকে সাফাই বক্তব্যে বলা হয়, রাতে পুলিশ শামসুন্নাহার হলে ঢোকেনি। তাদের এ অসত্য ভাষণের

www.pathagar.com

প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র সমাজ। ২৫ জানুয়ারি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শ্লোগানে-মিছিল আর বিক্ষোভ সমাবেশে উত্তাল হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সমাবেশে অপরাজেয় বাংলার তিন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতির চোখে কালো কাপড় বেঁধে দেয় শিক্ষার্থীরা। ২৭ জুলাই ২০০২ এর প্রথম আলোর খবরে আসে ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ও গভীর রাতেও ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে আবাসিক হলগুলোতে স্বতঃস্ফূর্ত জনসংযোগ অব্যাহত রাখে। অপরদিকে ছাত্র দলের ক্যাডাররা আন্দোলনে অংশ না নেয়ার জন্য সাধারণ-ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেয়। ২৭ জুলাই রাত দশটায় ভিসি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী আকস্মিকভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে, রাতেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ ছাত্রদের হল ত্যাগে বাধ্য করতে প্রতিটি হলের সামনে ব্যাপকভাবে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে। রাত ১২ টায় ক্যাম্পাসে পুলিশ বিডিআর এবং সাধারণ ছাত্ররা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। রায়টকার টহল দেয়। ক্যাম্পাসের সব প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলকে উপাচার্য বহিরাগতদের মিছিল এবং আন্দোলনকে তথাকথিত আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করেন।

এর আগে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তলবি সভায় তুমুল হট্টগোল হয়। বিডিআর প্রতিটি হলের প্রধান দরজায় গিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেয়। তবে এর মধ্যেই সূর্যসেন, জসীম উদ্দিন, জিয়া ও মুজিব হলের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। হাজার হাজার ছাত্র মল চত্বর, মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি এলাকায় একের পর এক মিছিল করতে থাকে। ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবন আক্রমণ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। জিয়া হল সহ বেশকটি হলে পুলিশ ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের কয়েকজন ছাত্রী সাংবাদিকদের জানায়, হলে এসে স্বয়ং উপাচার্য ও হলের হাউস টিউটররা ছাত্রীদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়ার চেষ্টা করেন। তারা ছাত্রীদের ২৩ জুলাই রাতে পুরুষ পুলিশ হলে প্রবেশ করে নাই এই মর্মে স্বীকারোক্তি দিতে চাপ দেন।

২৮ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মিছিলে মিছিলে উত্তাল থাকে। ১০ হাজার ছাত্রের মিছিল হলেও উপাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, মিছিলে মাত্র দু'হাজার মানুষ, এদের বেশীরভাগ বহিরাগত [প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০০২]। ঐদিন অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশে উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। সমাবেশে কোন ছাত্র নেতা নন, ১৫টি হলের যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচিত ১৫ জন প্রতিনিধি ভাষণ দেন।

শিক্ষকদের সমর্থন

সমাবেশে সংহতি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন, প্রবীণ শিক্ষকরা। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আহাদুজ্জামান, মোঃ আলী, অধ্যাপক আকমল হোসেন, অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, জাহিদ হোসেন চৌধুরী, মেহের নিগার, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, হাফিজুর রহমান কার্জন, ইস্রাফিল শাহিন, রোবায়েত ফেরদৌস, নুরুজ্জামান, মফিজুর

www.pathagar.com

রহমান, শামীম রেজা, নূরে আলম সিদ্দিকী, ফাহমিদুল হক প্রমুখ। শিক্ষকরা বলেন, এ আন্দোলনে সাধারণ ছাত্ররা শুধু নিজেরাই খোলস ভেঙ্গে বের হয়ে আসেনি, তারা কিছুটা হলেও মুক্ত করেছে আমাদের শিক্ষকদেরও।

২৯ জুলাই ছাত্ররা শাহবাগ থেকে রোকেয়া হলের সামনের এলাকাকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দিনরাত ২৪ ঘন্টা ছাত্র অবস্থান চলে। পুলিশ লাঠি ও রড দিয়ে প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনকে বেধড়ক পেটায়। এসময় দফায় দফায় আইন বিভাগের শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জন, সমাজ বিজ্ঞানের মশিউর রহমানসহ অর্ধ-শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পুলিশী হামলার শিকার হন। সেসময়ের বিতর্কিত পুলিশ কর্মকর্তা কোহিনূর মিয়াকে সাংবাদিকসহ ছাত্র-শিক্ষক পেটানোয় মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায়। প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বোরহানুল হক সম্রাটকে গলা ধরে উচু করে ফেলে পুলিশ, শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে পেটানো হয়। একই সাথে ইত্তেফাকের মাহাবুল হক সাবু, ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেসের নূরুন্নবী সহ বহু সাংবাদিককে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

৩০ জুলাই শহীদ মিনারে সাধারণ ছাত্ররা আমরণ অনশনে নামে। গিটার, হারমোনিয়াম, বাদ্য-বাজনা নিয়ে গানের আসর চলে দিন রাত। প্ল্যাকার্ড থাকে সকলের হাতে, তাতে লেখা ৫২, ৬২, ৬৯, ৭১, ৯০, ২০০২, শুধু এটুকুই।

আওয়ামীলীগের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, জোহরা তাজউদ্দিন, সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ শহীদ মিনারে গিয়ে ছাত্রদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ, আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি, ১১ দল, সিপিবি, ওয়ার্কাস পার্টি, গণফোরাম, মহিলা পরিষদ, নারী প্রগতি সংঘ, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদসহ সকলে ছাত্রদের আন্দোলনের ব্যাপারে সহমত প্রকাশ করেন।

অবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের ৫৬ ঘন্টার অনশনের পর প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ৩১ জুলাই ২০০২-এ উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রকটর নজরুল ইসলাম পদত্যাগ করেন। ছাত্র আন্দোলনের আটদিন ও ৫৬ ঘন্টার অনশনের ইতি টানেন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের সমন্বিত আন্দোলনে ভিসি-প্রক্টরের অপসারণ অন্যায়ের প্রতিবাদে সাম্প্রতিক সময়েও ছাত্র শক্তি উন্মেষের জানান দেয়।

www.pathagar.com

জরুরী অবস্থা ও ছাত্ররাজনীতি

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও নব্বই এর শুরু থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতির অবক্ষয় ছিল চোখে পড়ার মতো। তারপরও জরুরী অবস্থার মধ্যেই ছাত্রসমাজ তাদের স্বভাবজাত কারণে ঘুরে দাঁড়ায়। ইতিহাস তো আর অনির্দিষ্টকালের জন্যে চোরাবালিতে আটকে থাকে না। তা ছাড়া ছাত্রসমাজ কোন স্থিত জনগোষ্ঠি নয়। এটা একটা প্রবাহের মতো। প্রজন্মের পর প্রজন্ম আসছে। পুরাতন চিরস্থায়ী নয়, স্বল্পকালীন। নতুনরা এসে নতুনভাবে দাঁড়াচ্ছে। জীর্ণ পুরাতন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। '৫২-এর বরকত, সালামরা বারে বারে ফিরে আসছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আবারো রুখে দাঁড়াচ্ছে।

'৯০-এর দশক থেকে এই অবক্ষয়ের পূর্বেও তারা দ্রোহী, প্রতিবাদী, আন্দোলনকারী তার প্রমাণ আমরা সর্বশেষ পাই বিগত সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। ১১ জানুয়ারি বা One Eleven খ্যাত এই সরকার ক্ষমতায় আসবার পরেই দেশবাপী এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। One Eleven নিয়ে অনেক কথা-বার্তা, লেখা-লেখি ইতিমধ্যে হয়েছে। জোটের সরকার এবং মহাজোটের আন্দোলন মিলে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, সেনাবাহিনীর সহায়তায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা দখল করবার পর তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। এ রকম একটা অচলায়তন তৈরি হয়েছিল যে মানুষ আর কোন বিকল্প পাচ্ছিলো না। ক্ষমতা নেবার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এমন সব আচরণ ও উচ্চারণ করছিল যাতে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি তারা দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করবে, রাজনীতিকে বিশুদ্ধ করবে, নির্বাচন দিয়ে দেবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। রাজনৈতিক দলগুলো এক প্রকার নিশ্চুপ বসে ছিল। এই পরিস্থিতিতে ২০ আগস্ট ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে একটি ঘটনা ঘটে।

ঢাবি ছাত্ররা গর্জে উঠল

সে দিন বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে দুটি বিভাগের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা ছিল। জিমনিসিয়ামের পাশে খেলার মাঠে তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সেনা ক্যাম্প বসিয়েছিল। খেলার মাঠে সেনা সদস্যরা এক ছাত্রকে প্রহার করে। তাকে তারা ধরে নিয়ে যায় এবং ক্যাম্পের ভেতরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন চালায়।

দাবানলের মত এই খরব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন দেশে বন্যা ছিলো। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য জায়গায় ত্রাণের কাজ করছিল। সেখান থেকে, হলগুলো থেকে এবং সমস্ত জায়গা থেকে তারা খেলার মাঠের দিকে মিছিল সহকারে যেতে থাকে। তাদের দাবি ছিল অসৎ আচরণের জন্য সেনা সদস্যের মাফ চাইতে

www.pathagar.com

হবে। দেখতে দেখতে হাজার হাজার ছাত্র (অনেকের মতে কমপক্ষে বিশ হাজার) সেই মিছিলে যোগ দেয়। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে লাঠি চার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। মেডিকেলে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। আহত, রক্তাক্ত ছাত্ররা মেডিকেলের বারান্দায় পর্যন্ত গড়াগড়ি খেতে থাকে, যেহেতু মেডিকেলের কোন সিট ছিল না। সমস্ত শিক্ষক ছুটে যান ছাত্রদের সাহায্যে। তারাও ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিসহ ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

সেনাকর্তৃপক্ষ প্রথমে দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষককে গ্রেফতার করে। কিন্তু ২০, ২১ ও ২২ আগস্ট ২০০৭ লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কঠোর জরুরী অবস্থার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ব্যাপক ছাত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করে। ছাত্রদের দাবি দাওয়া মেনে নেয় এবং ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

ছাত্ররা যে জবর দখল মানে না, জুলুম সহ্য করে না এবং শত ভয়ভীতির মধ্যেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে ২০-২২ আগস্ট ২০০৭-এর সর্বশেষ প্রমাণ। এই তিন দিন লাগাতার আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা হয়নি, সহিংসতা হয়নি, কোন গাড়ি ভাঙেনি, এমনকি একটি রিকশার টায়ার পর্যন্ত কাটা হয়নি, বলা যেতে পারে ছদ্মবেশি নিষ্ঠুর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এটা ছিল ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন। বিভিন্ন দলের ছাত্রকর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ছাত্রদের দাবির মধ্যে গণতন্ত্রের কথাও ছিল। সেই মর্মে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল। শিক্ষকরা জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দাবী করেছিলেন, কারাবন্দী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়ার মুক্তিও চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা কোন দলীয় আন্দোলন ছিল না।

জরুরী অবস্থার পর

ছাত্রদের এই আন্দোলনের পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে। প্রাথমিকভাবে ১/১১ এর ক্ষমতার পালাবদল জনগণ পছন্দ করেছিল। বিএনপি বা জোট সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট যে আন্দোলন করছিল তা সাধারণভাবে যৌক্তিক ছিল এবং মানুষের সমর্থন ছিল তার প্রতি। কিন্তু সে আন্দোলন ধীরে ধীরে এমন বিভৎস রূপ লাভ করে যে মানুষ ভয় পেয়ে যায়। ২০০৬ সালে ঢাকার রাজপথে সরকারি জোটের সমর্থক কর্মীদের সাপের মত পিটিয়ে যেভাবে হত্যা করা হয়, তা দেখে শিউরে ওঠে সবাই। পরিস্থিতির অবনতিতে কোন পক্ষেই যুক্তি কাজ করছিল না। ক্ষমতাসীন সরকার তো ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং শেষ পরিণতিতে নির্বাচনকে নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করেছিল। এতে মহাজোট তথা সারাদেশের মানুষ তাদের ওপরে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। লাগাতার অবরোধ ও ঘেরাও চালিয়ে যাচ্ছিল বিরোধী দল। সারাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল রাজধানী ঢাকা থেকে।

www.pathagar.com

গণভবন পর্যন্ত ঘেরাও করেছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোন নমনীয় মনোভাব দেখানো হয় নি। সেই পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। কার্যত তারা ইয়াজউদ্দিন সরকারকে উৎখাত করে এবং তার জায়গায় ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে আরেকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এই সরকার। বিএনপিকে উৎখাত করে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে বিএনপি এই সরকারের উপরে রুষ্ট ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন এই সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। তিনি এই সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগও দেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সেনা সমর্থিত এই সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের কথা বলে এবং দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে বহু সংখ্যক রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে যার মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি উভয় দলের লোক ছিল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই সরকার একটু আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে যে ধারণা গড়ে উঠতে পারত সেটা নস্যাৎ হয়ে যায়। তারা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাজনীতির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং জরুরী অবস্থার কারণে জনগণের অনেক গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার খর্ব হয়ে যায়।

জোট সরকারের পুরো সময় গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন এটাকে কি তার বিজয় বলা যেত? শেখ হাসিনা যে রকম করে এই সরকারকে আন্দোলনের ফসল বলেছিলেন বিষয়টি সে রকম করে প্রতিভাত হলো না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নির্বাচন হলো না। পুরো দুই বছর তারা ক্ষমতায় থাকল। এর মধ্যে দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করবার চেষ্টা চলল, ইতিহাসে যা মাইনাস-টু হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করল। উভয় দলই তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে সেনা সমর্থিত এই সরকার প্রথমে খালেদা জিয়া এবং পরে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতারকৃত নেতাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে নানা রকম তৎপরতাও চালাতে লাগল।

ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সরকার প্রাথমিকভাবে ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল সে কথা আমি একটু আগে বলেছি। কিন্তু দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতিবাজদের গ্রেফতারের নামে তারা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলে রীতিমত বিভীষিকা তৈরি করে ফেলেছিল। ব্যবসায়ীরা সব পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। দামি দামি গাড়িগুলি উধাও হয়ে গিয়েছিল। আর শখের পোষা হরিণ অজগরকে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবৈধ দখল উচ্ছেদের নামে দেশজুড়ে জুলুম-নির্যাতন ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। আর যা হয়, সামরিক বাহিনীর সদ্যবৃন্দ নতুন করে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যখন আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি কেউই কার্যকর প্রতিবাদ করতে পারছিল না তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এবং সামারিক বাহিনীকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল। আন্তর্জাতিক বন্ধুরা যারা হয়ত বা প্রাথমিকভাবে ১/১১ সমর্থক ছিল তারাও বুঝতে পারে যে, এইভাবে চলবে না। আবার গণতন্ত্রে ফিরে যেতে হবে। পরিস্থিতি ক্ষমতাসীনদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

জাতীয় নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে কিংস পার্টি বলে পরিচিত নবগঠিত দলগুলোর ভূমিকা ছিল কৌতুহলোদ্দীপক। তবে সবার দৃষ্টি ছিল বড় দল দু'টির দিকে। যদিও দুই দলের দুই নেত্রীকে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। 'মাইনাস-টু' প্রচেষ্টার কথাও কারও অজানা ছিল না। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভেতরে যে সংস্কারের দাবী উঠেছিল তা দল দু'টোকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দু'নেত্রীর বিরোধীতা করে যারা সংস্কারের দাবী তুলেছিলেন তাদের সঙ্গে ক্ষমতা দখলকারীদের সম্পর্কের কথাও মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও সবার ক্ষেত্রেই এক কথা বলা যায় না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারলেও বিএনপির পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বিশেষ করে দলটিকে দ্বিধা বিভক্ত করতে তোড়জোড়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল খুবই স্পষ্ট। এ নিয়ে বিএনপি ক্ষোভ, হতাশা ও দ্বিধাগ্রস্থতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত জোটবদ্ধ ভাবেই দলটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট তাদের পূর্ব প্রস্তুতি মতই কোমর বেঁধে নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরিস্থিতি ছিল তাদের অনুকূলে। ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে আঁতাতের কথাও ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ আসনে জিতে সরকার গঠন করে মহাজোট। নির্বাচনের এই ভূমিধ্বস বিজয়ে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। বিএনপির পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে দেশী-বিদেশীদের হাত খেলানোর অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে আগের পাঁচ বছরে বিএনপি যে দুঃশাসন করেছিল, হাওয়াভবন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতির হেডকোয়ার্টার করেছিল তাতে তার বিজয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বিএনপি ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিতে রাজি ছিল না।

আওয়ামী লীগ সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। মানুষ যে, বিএনপি অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল, জীবন ও ভোট দিয়েছিল সে কেবল এক দলকে সরিয়ে আরেক দলকে ক্ষমতায় বসাবার জন্যে নয়। তারা রাজনীতির পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগও ইতিহাস থেকে বা ১/১১ থেকে যে কোন শিক্ষা নিল তা মনে হলো না।

www.pathagar.com

'৯০-র ঘটনার পুনরাবৃত্তি

২০০৯-এর ৬ জানুয়ারি মহাজোট সরকার শপথ নেবার পরই রাতারাতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চেহারা বদলে গেল। রুটিন মোতাবেক সমস্ত জায়গায় ছাত্রলীগের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। হল দখল, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে ছাত্র পেটানো, শিক্ষক পেটানো, হলের ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া, রামদা-চাপাতি দিয়ে প্রতিপক্ষকে কোপানো, গোলাগুলি, হত্যা-খুন থেকে শুরু করে সব ধরনের সংবাদের শিরোনাম হতে থাকে ছাত্রলীগ। ২০২১ সালের রূপ-কল্পের স্বপ্ন নিয়ে যারা দুই হাত দিয়ে ভোট দিয়েছিল এই সরকারের অভিষেকে তারা বিস্মিত বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল। সবাই বলতে শুরু করলো যেটুকুই আছে সরকারের অর্জন তার সবকিছুই বিসর্জন দিচ্ছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগকে লাগাম দিতে না পারলে শেষ পর্যন্ত ডুববে সরকার। কিন্তু এ কথায় কেউ কান দেয়নি। ফলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি চরমে ওঠে।

লাগামহীন ছাত্রলীগ

২০১১, ১২, ১৩ সাল জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের রামরাজত্ব দেখতে হয়েছে দেশবাসীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে একাধিপত্য কায়েম করে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। বড় ভাইদের সালাম না দেওয়া বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ না নিলেই নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। হল প্রাধ্যক্ষ বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণও চলে যায় ছাত্রলীগের হাতে। ক্যাম্পাসের বাইরেও তাদের বাড়াবাড়ি অবাধ হয়ে ওঠে। ঢাকার বিভিন্ন রাস্তার ফুটপাত ও সড়ক দ্বীপের আমের ব্যবসাও দখল করে নেয় তারা। রাস্তার ওপরে সরকারী জমিতে অফিস এবং দোকান চালু করে।

২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর পুরনো ঢাকায় এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঐ দিন বিরোধী দলের হরতাল ছিল। সেই হরতাল ভাঙতে নামে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। সদরঘাটে নিরপরাধ এক দর্জি দোকানী বিশ্বজিৎকে কুপিয়ে হত্যা করে তারা। এই হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ টেলিভিশনে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল দেশবাসী। কোপের আঘাতে রক্তাক্ত বিশ্বজিৎ এদিক ওদিক ছুটছিল আর মিনতি করে বলছিল, ভাই আমি হিন্দু আমাকে মারবেন না। একটা মানুষ এইভাবে মারা যাচ্ছে টেলিভিশনে দেখছিল দেশবাসী।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে সরকার ও পুলিশের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল যে হত্যাকারীরা ছাত্রলীগের সদস্য না। কিন্তু মিডিয়া যখন হত্যাকারীদের ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ করে, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঘৃণ্য এক চেহারা ফুটে ওঠে বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের। বিএনপির পক্ষ থেকে ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো দাবি করা হয় বিশ্বজিৎ তাদের দলের কর্মী।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের বেশিরভাগই চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, ঠিকাদারিতে জড়িয়ে পরে। বিসিএস ক্যাডার, এন.এস.আইয়ের সহকারী পরিচালক, পুলিশের এস.আই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও তারা ছাত্রলীগের পদে বহাল থেকেছে। ঢাবির হল ও সোহরাওার্দী উদ্যান থেকে চাঁদাবাজি, ছিনতাইয়ের অভিযোগে ছাত্রলীগ কর্মীদের পুলিশের হাতে আটক ও ছাড়া পাওয়ার খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে শহীদুল্লাহ হলের পুকুর ঘাটে বেড়াতে আসা জনৈক আলোকচিত্রী ও তার সঙ্গী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনাও আলোচনার বিষয় হয়েছিল।

ঢাকাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অভিযোগ হল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ব্যবহার করে ছাত্রলীগ কার্যত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপরই নানামুখী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। দুই সপ্তাহে তিনটি ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ছাত্রলীগের সহায়তা নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে ছাত্রলীগের নাম আসায় ১ বছরে শাহবাগ থানায় ২১টি সাধারণ ডায়রী (জিডি) হয়েছে। তবে পুলিশ সেই জিডিগুলোর তদন্ত করেনি।

দুই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অন্য কোনো অভিযোগে ছাত্রলীগ যাদের দোষী বলে গণ্য করছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রশাসন নিজেরা এ বিষয়ে তদন্ত পর্যন্ত করছে না। এমন কী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কী ধরনের কর্মসূচি পালন করতে পারবে, সে ব্যাপারেও ছাত্রলীগ প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপ করছে।

১৪ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, গত ১২ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এইচ টি ইমাম ৫ জানুয়ারি (২০১৪) নির্বাচনকালীন বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, নির্বাচনের সময় আমি তো প্রত্যেকটি উপজেলায় কথা বলেছি, সব জায়গায় আমাদের যারা রিক্রুটেড, তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে দিয়ে মোবাইল কোর্ট করিয়ে আমরা নির্বাচন করেছি। তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, বুক পেতে দিয়েছে। ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন, তোমাদের লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। তার পরে আমরা দেখবো।

২০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রথম আলোর সম্পাদকীয় থেকে বলা হয় চট্টগ্রাম বন্দর যে রাহুর গ্রাসে বারবার পতিত হয়, তার নাম রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনা। এবার ছাত্রলীগের স্থানীয় বিভিন্ন গ্রুপের বিরুদ্ধে জোর করে কাজ আদায় সহ বখরা বাজির অভিযোগ উঠেছে। পত্রিকাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজের

www.pathagar.com

কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করছেন সরকার সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এসব বন্ধ করা না গেলে সেবার মান কমবে এবং বন্দরটি দেশি-বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর আরো বিরাগভাজন হবে।

২১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের শিরোনাম ছিল, নিজেদের কর্মীকে গুলি করে ও কুপিয়ে মারলো ছাত্রলীগ। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ হারিয়েছে এককর্মী।

সংঘর্ষকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও পুলিশ সদস্যসহ আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। সংঘর্ষের জেরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ এ সংঘর্ষ ঘটে। ছাত্রলীগের নিহত কর্মী হলেন সুমন চন্দ্র দাস (২২)। তিনি সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের প্রথম আলোর খবরে জানা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৫২ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলছে। সীমানা প্রাচীর নির্মাণে আগে ১০ কোটি টাকার দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়ায়ও শেষের পথে। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সাবেক দুই সাধারণ সম্পাদকের কড়া 'নজর' রয়েছে এসব উন্নয়ন কাজে। দরপত্র আর ঠিকাদারী কাজ থেকে প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিক সুবিধা নিতেই বার বার বিরোধে জড়াচ্ছে দুই নেতার অনুসারী দুই পক্ষ। জানা কথা, ক্যাম্পাসে যে পক্ষ একচেটিয়া প্রভাব খাটাতে পারে, তারাই সব সুবিধা ভোগ করে। এ নিয়েই একের পর এক সংঘর্ষে জড়াচ্ছে দুই পক্ষ। সর্বশেষ ১৪ ডিসেম্বর গুলি করে হত্যা করা হয় ছাত্রলীগের কর্মী তাপস সরকারকে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ফুল হাতে পাশাপাশি হেঁটে চলার সোয়া এক ঘন্টার মধ্যেই খুব কাছে থেকে সতীর্থের গুলি ছিন্নভিন্ন করলো তাপস সরকারের বুক। নিহত তাপস বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারের ভাষ্য মতে, তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে তাপস সরকার খুন হয়েছেন।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আসার পর গত ছয় বছরে সারা দেশে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংর্ঘষে এ নিয়ে ৪০ জন নেতাকর্মী প্রাণ হারালেন।

এরপরও কিছুই হয়নি

ছাত্রলীগের কার্যকলাপ নিয়ে প্রায়শই এ ধরনের সংবাদ গণমাধ্যমের কল্যাণে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠন হলে সেই সংগঠনের আলোচনা-সমালোচনা একটু বেশীই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপকর্মের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা নিন্দনীয় হয় সকল মহলেই। ২০০৯ সালে আওয়ামী সরকারের ক্ষমতারোহনের পর থেকেই টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজী-দখলবাজী থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের অপকর্মের সঙ্গে ছাত্রলীগের জড়িয়ে পড়ার খবর

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ে। এটা যে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ধারাবাহিকতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুত এমন কোন দিনই নেই যেদিন দেশের কোন না কোন জায়গা থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দুষ্কর্মের খবর পাওয়া যায় না। ঢাকা-বুয়েট, জগন্নাথ, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই রোমহর্ষক সব ঘটনা ঘটাচ্ছে ছাত্রলীগ।

সরকার এসব ঘটনায় বেশ খানিকটা বিব্রত হয়েছিল তা বিভিন্ন মন্ত্রীদের এমন কি খোদ প্রধানমন্ত্রীর আচরণে ও উচ্চারণে বোঝা গিয়েছে। কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছিলেন ছাত্রলীগের কোনো সভায় যাবে না তিনি। এমনকি অন্যকোন সংগঠনের সভায় যদি ছাত্রলীগ নেতারা উপস্থিত থাকে তবে সেখানেও যাবেন না তিনি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেই ফেলেছেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী ছাত্রলীগ তাদের কোন অংগ সংগঠন নয়। অতএব ছাত্রলীগের কোন দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেবে না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

অনেকেই মনে করেছিলেন একটা কিছু হবে। কিন্তু হয় নি। জুলাই এর শুরুতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হয়েছে সরাসরি কাউন্সিলদের ভোটে। নেতৃত্ব নির্বাচনে এ প্রক্রিয়ায় সবাই মোটামুটি খুশী হয়েছেন। কিন্তু যারা মনে করেছিলেন সম্মেলন হয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হবে তারা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। সম্মেলনের পরের দেড় মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পেটানো থেকে শুরু করে সন্ত্রাসের বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে ছাত্রলীগ।

বস্তুত কোন কিছুরই তেমন পরিবর্তন হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দখলদারিত্ব এখন মৌরসীপাট্টার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা কিংবা আশেপাশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী ছাত্রসংগঠনের কোন অবস্থান নেই। মেধাবী ছাত্ররা হলে সিট পায় না। টাকার বিনিময়ে হলের সিট বরাদ্দ হয়। ভর্তি এবং সিট বাণিজ্য বলে একটা কথা-ই চালু আছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ছাত্রদের সাথে কথা বলে দেখেছি, তারা আদর্শিকভাবে কোন সংগঠন করে না। কিন্তু মিছিলে যেতে হয়। যদি না যায় তাহলে হল থেকে তাদের বিছানাপত্র বাইরে ফেলে দেয়া হয়। তাদেরকে মারধর করা হয়, এ খবর তো আমরা পত্রিকায় মাঝেমাঝে দেখি। ক্ষমতাসীনরা এগুলো জানে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয় না। সম্ভবত এ জন্য যে এভাবে ছাত্র আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাক, এরকমটি তারা চান।

নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দখলদারিত্বের থাবা বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনে এমনভাবে বিস্তার হয়েছিল, একটা অলিখিত বোঝাপড়াই তৈরি হয়েছিল যে একদল নির্বাচনে জিতলে অপর দলের ছাত্ররা ভোর হওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাবে। সমস্ত ক্যাম্পাস জুড়ে একাধিপত্য থাকবে সরকারি ছাত্রসংগঠনের।

www.pathagar.com

২৪ জুলাই দৈনিক প্রথম আলো তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, রাজারা আগে খাস ব্যক্তিদের তালুক উপহার দিতেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো ছাত্রলীগের তেমন তালুক। তাঁরাই নেতা, তাঁরাই প্রশাসন, আবাসিক ছাত্রদের তাঁরাই 'মালিক'। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দখলদারি বজায় রাখার এটাই হাতিয়ার। প্রাধ্যক্ষ যেখানে ক্ষমতাসীন, সেখানে উপাচার্যেরই দায়িত্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। দখলদারির সুযোগ বহাল রেখে কার্যত প্রশাসনই ছাত্রলীগকে তালুকদারি করার 'ছাড়পত্র' দিয়ে রেখেছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবসিক হলের কর্তৃত্ব সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের। ছাত্রলীগ না করলে হলে থাকা যাবে না, আওয়ামী লীগের নেতার সুপারিশ দেখাতে না পারলে হল থেকে বের করে দেওয়া হবে। নতুন শিক্ষার্থীদের দিয়ে মারধর-চাঁদাবাজি করানো চলবে। আর উপাচার্য বলবেন, সব দায়িত্ব তো প্রাধ্যক্ষের! বাস্তবতা হলো, প্রশাসনপন্থী শিক্ষকেরও ক্ষমতা নেই ছাত্রলীগের নেতাদের বিরুদ্ধাচারণ করার। একমাত্র উপাচার্যেরই এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা রয়েছে প্রশাসনের অধীনে হলগুলোকে নিয়ে আসার।

গত এক বছরে ঢাবিতেই অন্তত ৯৪ জন ছাত্রকে হল থেকে বের করে দিয়েছে ছাত্রলীগ। মিছিল না করায় শীতের রাতে শত শত ছাত্রকে খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখার নজিরও রয়েছে। ক্যাম্পাসে সংগঠিত সন্ত্রাস, অপহরণ, চাঁদাবাজির হোতাও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সব জেনেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না?

মেধা ও নিয়ম অনুযায়ী হলে সিট পাওয়া দুঃসাধ্য। দখলদারির সুবাদে সুস্থ ছাত্ররাজনীতিও একপ্রকার নিষিদ্ধই। ছাত্রসংগঠন যখন দলবাজি চালায়, যখন ছাত্রকর্মীদের স্বাধীন মতামতকে নেতার আনুগত্যের বেদিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়, যখন হলগুলো দুর্বৃত্ত-রাজনীতির খোঁয়াড়ে পরিণত হয়, তখন রাজনীতিও নিষিদ্ধ থাকে।

বেপরোয়া ভর্তি বাণিজ্য

একটু আগে ছাত্রলীগের আমব্যবসার কথা বলেছিলাম আপনাদেরকে। এবার বলবো তাদের ভর্তি বাণিজ্যের কথা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে দেশজুড়ে বেপরোয়া বাণিজ্য চালিয়েছে ছাত্রলীগ। ভালো কলেজে ভর্তি হতে নগদ টাকা গুনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ টাকা গিয়ে ঢুকছে ছাত্রলীগ কলেজ কমিটিগুলোর নেতাদের পকেটে। সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ভর্তি বাণিজ্য সংক্রমিত কলেজগুলোর সিংহভাগই সরকারি কলেজ। এর ফলে প্রকৃত মেধাবীরা পছন্দসই কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার কম জিপিএ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরাও টাকার বিনিময়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা 'একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নীতিমালা' 'কাগুজে নীতিমালা'য় পরিণত হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, কোন কলেজে আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকা এসএসসির ফলের ভিত্তিতে শিক্ষা বোর্ড থেকে নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা। বাস্তবে দেখা গেছে, ছাত্রলীগ নেতাদের চাপে অধ্যক্ষরা এ নীতিমালা ভেঙ্গে মেধা তালিকার পেছনে থাকা শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের সত্যতা স্বীকার

www.pathagar.com

করেছেন। ঢাকার বাইরের কয়েকটি কলেজে ভর্তিবাণিজ্য নিয়ে হামলা, সংঘর্ষের ঘটনা সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপাও হয়েছে।

১১ জুলাই ২০১৪ দৈনিক সমকাল লিখেছে প্রথম দফায় বিলম্ব ফি ছাড়া গত ২৯ জুন ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হবার কথা ছিল আগামী ২২ জুলাই। আর তখন থেকে শুরু হয়েছে লাগামহীন ভর্তিবাণিজ্য।

২ জুলাই ২০১৪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রায় সব দৈনিকে নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে ছাত্রলীগ কিভাবে ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করছে তার একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। পত্রিকা লিখেছে, ৩০ জুন নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে অপেক্ষমান তালিকায় থাকা ছাত্রীদের ভর্তির কথা ছিল। কিন্তু সকাল থেকে কলেজের অফিস কক্ষ দখল করে বসে থাকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ছাত্রী বা অভিভাবকদের কলেজের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে। সরকারি ফির বাইরে তারা ভর্তিচ্ছুক ছাত্রীদের কাছ থেকে পাঁচ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়েছে। কলেজের একাধিক শিক্ষক বলেন, ভর্তি পরীক্ষার শুরু থেকেই ছাত্রলীগ এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকে। তোলারাম কলেজে ছাত্রলীগের স্বঘোষিত ভিপি রিয়াদ সোমবার সকাল ১০ টায় প্রায় ৩০-৪০ জন সশস্ত্র ক্যাডার নিয়ে এসে কলেজের অফিস ও অধ্যক্ষের কক্ষে অবস্থান নেন। সে সময় কলেজের শিক্ষকরা অধ্যক্ষের কক্ষে জড়ো হলে রিয়াদ অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র সাহাকে টেলিফোনে কোন এক নেতার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। এরপর অধ্যক্ষ অপেক্ষমান তালিকায় থাকা প্রায় ৬০০ আসনের ভর্তি তাঁদের হাতে ছেড়ে দেন। ভর্তিবাণিজ্য কোন স্তরে গেছে তার একটি উদাহরণ এটি। মেধাতালিকা থেকে ভর্তির পর ২৯৬ জনের একটি ওয়েটিং লিষ্ট তৈরি করেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা ছাত্রলীগের কারণে সে লিষ্ট প্রকাশ করতে পারেনি।

এ ঘটনা কি সত্যি? অবশ্যই যে কেউ সরেজমিন দেখে আসতে পারেন। যে নারায়ণগঞ্জ নূর হোসেনদের জন্য অভয়ারণ্য, সেটা ছাত্রলীগের জন্যও হবে না কেন? যেখান থেকে নূর হোসেনরা শত শত কোটি টাকা বানিয়েছে, সেখান থেকে ছাত্রলীগ কিছু বানাবে না, তাই কি হয়? এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকেও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শিক্ষাঙ্গনে এ রকম নগ্ন ভর্তিবাণিজ্য চললে শিক্ষার কোন মান থাকে কি? ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপক বলেছে, বাংলাদেশে শিক্ষার মান খারাপ। আর আমাদের এখানে ওপর থেকে নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষায় পাসের হার প্রায় শতভাগ দেখানো হচ্ছে। ভর্তিতেই যদি এ রকম অস্ত্রবাজি চলে তবে শিক্ষার মান আস্তে আস্তে মেধাশূন্য হয়ে পড়বে না। কেন? অবশ্য সরকারি দলের মেধা দরকার নেই। তাদের দরকার মাসলের। নারায়ণগঞ্জেও তারা মাসলকেই বেছে নিয়েছে, সুস্থ রাজনীতিকে নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও তো তাদেরই দাপট হবে। ভালো ছাত্ররা সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কেন? নারায়ণগঞ্জের ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে ঐ প্রতিবেদনে আরও অনেক কথা লিখেছে সমকাল। কিন্তু কেবল নারায়ণগঞ্জ তো নয়, খোদ রাজধানীসহ সারাদেশেই এর ভয়াবহ বিস্তার দেখছি আমরা। রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী সিটি কলেজে

www.pathagar.com

অকৃতকার্য ছাত্রদের ভর্তি করানোর জন্য ভাঙচুর চালিয়েছে ছাত্রলীগ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তি করে মেধার ভিত্তিতে আর ছাত্রলীগ ভর্তি করতে চায় অর্থের ভিত্তিতে। 'মেধাবীদের' সংগঠন বলে দাবি করলেও ছাত্রলীগে মেধার চেয়ে অর্থের কদরই যে বেশি, এ দুটি ঘটনায় তা-ই দেখা গেল। বলা বাহুল্য, এগুলো নতুন কিছু নয়, এটাই সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠনের আসল পরিচয়।

ঢাকা কলেজে অপেক্ষমাণ তালিকার পেছনের সারির কয়েকজন ছাত্রকে ভর্তির জন্য প্রশাসনের ওপর চাপ দিচ্ছিল ছাত্রলীগ। রাজনৈতিক বিবেচনায় ভর্তির সেই চাপে কাজ না হওয়ায় তারা কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যথারীতি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ঘটনাটিকে কিছু 'জুনিয়র' ছাত্রের বিচ্ছিন্ন কাজ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে রাজশাহীর সিটি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি বলেছেন, ওই কলেজে ভাঙচুরের সঙ্গে ছাত্রলীগ জড়িত নয়।

প্রথমত, ছাত্রলীগ ভর্তি-প্রক্রিয়ায় কোন রকম হস্তক্ষেপই করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সংগঠনের কেউ যদি তা করে, তাহলে তাদের সাংগঠনিক শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। তৃতীয়ত, কলেজ প্রশাসনের উচিত ছিল তদন্ত করে দুর্বৃত্ত ছাত্রদের প্রশাসনিক শাস্তি দেওয়া। তারা তা করেনি। পুলিশও কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতাদেরও এদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় বা মর্জি আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং, অনিয়ম, সন্ত্রাস, আইন লঙ্ঘন, ভর্তিবাণিজ্য-কোন কিছুর জন্য শাস্তি দূরে কথা, এগুলোকে মোকাবিলা করারও কাউকে পাওয়া গেল না। ছাত্রলীগের একদিকে এ সরকারে আমলে পরীক্ষাব্যবস্থাকে খেলা করে ফেলা, অন্যদিকে ভর্তি-বাণিজ্য; এই দুই সমস্যা থেকে শিক্ষাব্যবস্থার মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তাই আর রইল না। প্রতিকারহীন এসব অন্যায় কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে শিক্ষার সম্ভাবনা।

এ ঘটনাগুলো আরও দেখাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারপন্থী ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা আসলে কী। এমনকি ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হলেও তাদের প্রতাপ কিছুমাত্র কমেনি। ছাত্রলীগের শাখা নেতারা যাকে বলছেন 'রাজনৈতিক' বিবেচনা, তা আসলে টাকার বিবেচনা।

দায়িত্ব নেবার কেউ নেই

আমি আগে বলেছি, ক্ষমতাসীনরা ছাত্রলীগের এসব আচরণে বিব্রত হয়েছিল। সৈয়দ আশরাফ এবং মতিয়া চৌধুরীর কথা আর উল্লেখ করছি না। খোদ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতৃত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত সব কথা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা! এরকম হয়? যদি হয় তবে ছাত্রলীগের যখন বদনাম হয় তখন প্রধানমন্ত্রী তার দায়িত্ব কাঁধে নেবেন না কেন? হঠাৎ করে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন কেন? এটা একটা ষ্ট্যান্ট। জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। অতএব যা হবার তাই হয়েছে। ছাত্রলীগকে ঠেকানো যায় নি। বরং তারা আরো বেপরোয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রায় সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং তার আশেপাশে হাট, বাজার, বন্দরগুলোতে ছাত্রলীগ আধিপত্য বিস্তার করেছে কেবল অর্থ কামাবার জন্যে। রীতিমতো অপহরণ বাণিজ্য শুরু করেছিল তারা। একটি উদাহরণ দেই, গত ৮ মে ২০১৪ ফরহাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে অপহরণ করে জগন্নাথ হলের একটি কক্ষে আটকে রেখে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে। পরিবার বিষয়টি শাহবাগ থানার পুলিশকে জানায়। মুক্তিপণ দেওয়ার কৌশল করে পুলিশ পরদিন ৯ মে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ সাতজনকে আটক করে এবং ফরহাদকে উদ্ধার করে। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, উর্ধ্বতন এক নেতার চাপে আটক ছাত্রলীগের এক নেতাকে ছেড়ে দিয়ে বাকি ছয়জনকে অপহরণের ঘটনায় শাহবাগ থানা হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এই ঘটনা ভীত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে করা মামলা আর চালাতে চায় না ভুক্তভোগী পরিবার। আসামীপক্ষের আপসের চেষ্টা, ভয়, থানা-পুলিশের নির্লিপ্ততার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আতঙ্কে ঢাকাও ছেড়েছেন ফরহাদ। পুলিশের একটি সূত্র জানায়, আসামীদের বাঁচাতে ছাত্রলীগের উর্ধ্বতন কয়েকজন নেতা চাপ দেওয়া পুলিশ এখন অনেকটাই নীরব এই মামলার ব্যাপারে। ফলে তদন্ত কার্যত থেমে গেছে। পুলিশ ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখায় পরিবারটিও ভীতির মাঝে আছে।

এর আগে ১ এপ্রিল এবং ৪ এপ্রিল ২০১৪, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার ঘটনাটি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে, এটা খুব স্পষ্ট। এজন্য দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ পায়নি ক্ষমতাসীন দল। প্রথম দিকে তারা দোষ অপরের ওপরে চাপাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে তার মোকাবিলা করেছিল। ছাত্রীদের উপরে হামলা করেছিল ছাত্রলীগ। কিন্তু নিহত শিক্ষার্থী এবং তার আত্মীয়ের স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, এই ঘটনাটি ছাত্রলীগই ঘটিয়েছে। একজন শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সরাসরি ছাত্রলীগের পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু তাতে ছাত্রলীগের পক্ষে পরিস্থিতি গড়ায় নি। দুঃখজনক হলো, যে শিক্ষকের অতীতে সবসময় প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সহায়তা প্রদান করেছিলেন সেই তাদেরকে অন্যান্য পেশার মতো বিভক্ত ও দলবাজ করে ফেলেছে পরিস্থিতি।

২০১২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ডের জন্য শিবিরকে দায়ী করেছিল ছাত্রলীগ। আর ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে অন্যায়ভাবে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যখন আন্দোলন করেছিল। পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগও সংঘটিত হয়েছিল। সে আন্দোলনের দায়িত্ব তারা শিবিরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছিল যে এটা স্বাধীনতার বিরোধীদের আন্দোলন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক এবং প্রায় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে কোন আন্দোলনকে দমন করতে ক্ষমতাসীনরা স্বাধীনতা যুদ্ধের কার্ড খেলতে

www.pathagar.com

শুরু করেছে। এতে যে, শুধু ছাত্ররাজনীতি নয়, সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজনীতির কত বড় ক্ষতি হল, তা কি এই সরকার ভেবে দেখেছে? এ কথা বলছি পত্রপত্রিকা পড়ে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কথা বলে।

ছাত্রলীগের ভূমিকা এখন ছাত্র আন্দোলন ভাঙ্গার দালালের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন অতীতে হয়েছিল ছাত্রদল। এ কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আমরা দেখতে পেলাম তেমনি দেখলাম রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। দুঃখজনকভাবে আবারও বলতে হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাজশাহী রংপুর হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে নামতে দেখেছি সরকার সমর্থিত শিক্ষক সমাজের একটি অংশকে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিহীনতার চাষ

'৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংসদে গৃহীত হওয়ার পর যখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন রাজনৈতিক দলগুলো এবং বিশেষত ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এইভাবে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষাকে একটি পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে। অথচ শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি এইভাবে। অতএব, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো। এখন দেশে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি, যা দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক ছিল। অন্তত ঘটনাটা তো সেটাই ঘটেছে। শিক্ষা সুযোগ বললেই হলো না, সে সুযোগ কারো করে দিতে হবে। আমরা সার্বজনীন শিক্ষার দাবি করি; কিন্তু সবার জন্য শিক্ষা কি আছে? আমাদের শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দ আছে, সেটা দিয়ে তা হয় না। আরো অনেক কাজই হয়নি। আসলে সরকারের ততখানি সক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। অতএব, বেসরকারি উদ্যোগকে বাঁধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সে রকম করে না। ইউরোপ-আমেরিকা বা কানাডার বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষা একভাবে পণ্য বলে বিবেচিত হয়।

শিক্ষার নামে বাণিজ্য

এ পর্যন্ত যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি বেশ ভালো করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট হয়। শিক্ষার্থীদের জীবনের দু-তিনটি বছর ক্ষয়ে যায় সেই জটে। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদালয়ে সেশনজট নেই। আর হ্যাঁ, রাজনীতিও নেই। এই একটা জিনিস প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করে নিয়েছে যে তারা তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্ররাজনীতির বীজ রোপিত হতে দেয়নি। কাজটা খুবই মন্দ হয়েছে এই জন্য যে, এতে করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি তথা সমাজবিমুখ হয়ে অনেকটাই আত্মগত হয়ে পড়েছে। তবে এ কথাও চিরন্তন সত্য নয়। কারণ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নামকরা নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি-এনএসইউতে মেধাবী ছাত্রদের হিযবুত তাহরীর-এ ধরনের সংগঠনের

www.pathagar.com

সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। অনেকে মনে করেন, এনএসইউর মতো অন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও এভাবে রাজনীতির চাষ আছে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বললেও তা আসলে বন্ধ হয়নি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি ঢুকলেই যে বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয়ে যাবে-এটা কোনো কথা নয়। ছাত্ররাজনীতি সব অনিষ্টের মূল-সেটাও ঠিক নয়। বরং ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেসব কাজ করেছে, তা আমাদের শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলেছে। ছাত্ররা যে বলছিল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, তা বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রতিবাদ হলো। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টাকা দিলে মেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা পাসের সনদ। শুধু তা-ই নয়, এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে শুরু করে প্রায় সব কাজেই পদে পদে অর্থের অবৈধ লেনদেন হয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনুমোদনের জন্যই এক থেকে তিন কোটি টাকা লেনদেন হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর অস্বীকার

অনেকেই হইচই করে প্রতিবাদ করলেন। সজ্জন বলে পরিচিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তো পুরো অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং এর সপক্ষে প্রমাণ চেয়ে বসলেন। ভাবতে অবাক লাগে, খোদ শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত শিক্ষার হাল সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞাত! এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন কেউ কেউ। মঞ্জুরি কমিশন এই পরিপ্রেক্ষিতে যা বলেছে, তা আরো ভয়াবহ। মঞ্জুরি কমিশন বলেছে, পড়ালেখা, গবেষণা-এসব কিছুর ধার না ধারে উচ্চশিক্ষার নামে, পয়সার নামে সনদ বিক্রির ব্যবসা করছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ। এতে শুধু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে না, জাতিও পঙ্গু হয়ে পড়ছে। তাঁরা বলেন, দেশে মানহীন ও ভূয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়েছে। অনুমোদিত একটি, অথচ ক্যাম্পাস খুলছে একাধিক। বর্তমানে ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১১৬টি শাখা সরকার ও ইউজিসির অনুমোদন নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে জানিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাও তুলে ধরা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

কমিশনের এক সদস্য বলেন, অনেকে কম সময়ে টাকার বিনিময়ে সনদ কিনতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ মার্কা ভর্তি হন। এটাই যদি বাস্তব হয়, তবে আর ছাত্ররা লেখাপড়া করতে চাইবে কেন? যে ছাত্রদের আমরা আগামী দিনের সমাজ গড়ার কারিগর বানাতে চাই, তারা যদি এই পথে অগ্রসর হয়, তবে দেশের কী হবে? বন্ধ করা কি যায় না এই জাতিবিধ্বংসী তৎপরতা?

ইউজিসি বলেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক নির্বাহী প্রধান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বন্দ্বের কারণে উপাচার্য যথাযথ দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করতে পারছেন না। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নানা রকম অব্যবস্থাপনা দেখা দিচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধে ইউজিসির নিষেধাজ্ঞার ওপর উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ ও মামলাজট থাকায় ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে তথাকথিত কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারছে।

অবাধ দুর্নীতি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী এই দুর্নীতির উদাহরণ তুলে ধরেন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, এখানে চারটি গ্রুপ। এ চার গ্রুপ সারা দেশে ১৪০টি শাখা ক্যাম্পাস খুলেছে। দেদার সনদ-বাণিজ্য করছে বলে অভিযোগ পাচ্ছি নিয়মিত। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়েছি। এসব নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ও দুই মাস কাজ করেছে। ইউজিসি সহযোগিতা করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত করেছেন বিচারপতি এবাদুল হক। যিনি খুবই প্রজ্ঞাবান একজন মানুষ। বিচারপতি এবাদুল হক দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এসব বিষয় আইন মন্ত্রণালয় হয়ে আর আসে না। নিশ্চয়ই আইন মন্ত্রণালয়ের কেউ না কেউ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। নয়তো কারো আত্মীয়স্বজন এটি পরিচালনা করেন। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পাস পরিচালনা ও ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা জড়িত। এসব ব্যাপারে ইউজিসি বহুবার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিলেও তা অদৃশ্য কারণে কার্যকর হয়ে ওঠে না। ইউজিসির চেয়ারম্যান আবুল হোসেনের প্রাইম ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উদাহরণ টানেন। এগুলোর মধ্যে কোনো একটি ইউনিভার্সিটিতে একাধিক ভিসি আছেন, আবার পনেরো-ষোলোটি ইউনিভার্সিটিতে কোনো ভিসিই নেই। ভিসি-ডিনসহ এসব পদে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঘোষ পর্যন্ত নেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হলো, এসব বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবগত করার পরও মন্ত্রণালয় তো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি; উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষেই কথা বলছে বেশি। আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কে অভিযোগের কথা তো একটু আগে বললাম। উপায়ন্তরহীন মঞ্জুরি কমিশন শেষ পর্যন্ত বলেছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এবং 'সনদ বিক্রি' বন্ধে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। এ নীতিবিবর্জিত কার্যক্রম বন্ধে স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ, ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের পদক্ষেপ প্রয়োজন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

বর্তমান সরকার নিজেদের দায় এড়াতে আজকাল প্রায়শই জনগণের সচেতনতার অভাবকে দায়ী করছে। এটা প্রকারান্তরে নিজেদের দায় জনগণের ঘাড়ে চাপানোর নামান্তর। তারা বলতে চান, ছাত্ররা ও তাদের অভিভাবকরা দেখেশুনে বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দ করলেই তো পারে। আর তারাই বা সনদ-বাণিজ্যের শিকার হবে কেন? তাদের

www.pathagar.com

নিজেদের দায় আছে না। জনগণকে অবিশ্বাসী সরকারগুলো এভাবেই নিজেদের দায় এড়াতে চায়। নষ্ট হওয়ার পথ করে দেবে তারা, অন্তত খুলে যাওয়া পথ বন্ধ করবে না, মানুষ তো সে পথে হাঁটবেই। আদম-হাওয়াকে গন্ধম খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। যারা সনদ-বাণিজ্য করছে তারা অর্থলোভী। আর যারা নিচ্ছে, তারা বাংলাদেশে ব্যবহার করতে না পারলেও বিদেশে চাকরির জন্য ব্যবহার করছে। আবার অনেকে আছে অর্থবিত্তের মালিক। নামের আগে কিছু বিশেষণ লাগানো অথবা মানুষকে বলতে পারার জন্য একটি উচ্চশিক্ষার সনদ জোগাড় করছে। এভাবেই সার্বিক শিক্ষার মানকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

একা কাউকে দায়ী করছি না আমি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যেসব দোষত্রুটি আর দুর্নীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তা সংশোধনের চেষ্টা কেউ করেনি। ভুল আর অন্যায়গুলো বাড়তে বাড়তে এখন তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে তারা। দেশের মোট ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্রসংখ্যা ৩ লাখ যা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দ্বিগুণ। এগুলোর শিক্ষার অবস্থা এবং মান সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে কথা বললাম আমি। এদের মধ্যে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নাই, প্রো ভিসি নাই ৬১টিতে। উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে যে শীর্ষ সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সেটি এ সব বিষয়ে গত জুন মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে এবং এসব থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কতিপয় পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন কিছু করা হয়নি।

দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি। এগুলোর কোনো কোনটির কয়েকটি শাখা আছে। বড় বড় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩০-৪০ হাজারের মতো। আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। সে হিসাবে বলা যায় উচ্চশিক্ষায় দেশের মোট ছাত্রসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই পড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেখানে কোনো ছাত্ররাজনীতি নেই এবং যেখানে শিক্ষার নামে চলছে মিথ্যার বেসাতি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা করছে। কারণ আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে সরকারি ছাত্র সংগঠনের মাৎস্যন্যায়। এই রাজনীতির কদর্য রূপ দেখিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বন্ধ হচ্ছে না কিছু। ছাত্ররা কূপমণ্ডূক আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে অথবা হিযবুত তাহরীরে যোগ দিচ্ছে। এইভাবে আমরা আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছি।

এমন অবস্থা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমেছে উদ্বেগজনকভাবে। একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় চরম হতাশাজনক ফলাফলের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমবর্ধমান অব্যবস্থা-দুর্নীতি থেকেই এ শঙ্কার জন্ম। গত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশের দুটি জনপ্রিয় দৈনিকের খবরে শিক্ষাব্যবস্থার যে করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়। এমনিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি থেকে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির ব্যাপারে

www.pathagar.com

দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। টিআইবি এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সেটি নিয়ে সরকারি মহলের উষ্মা ফেটে পড়েছে।

রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য

প্রচলিত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক। কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসা ও মুনাফার হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। টিআইবি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, যে হারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা আরো বাড়বে। তাই সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি

ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী লীগের ২০০৯-১৩ আমলে বিশেষ করে সরকারের শেষ বছরে। এর আগেও স্বাধীনতার পরপরই ৭২-৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র ফাঁস পরীক্ষায় নকল ও বিশৃঙ্খলার কথা আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তীতে এসব কমে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আবার তার তাণ্ডব লক্ষ্য করা গেল। ২০০৯ সাল থেকে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিসিএসের সব ক'টিতে (২৯তম থেকে ৩৪তম বিসিএস পর্যন্ত), গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, খাদ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, অডিট, এনবিআর, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক ও এটিইও, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা, এসএসসি, এইচএসসি, সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসহ ৩০টির অধিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে।

প্রশ্ন ফাঁসের এই চক্রে রয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন ভর্তি কোচিং সেন্টার ও তাদের শিক্ষকরাও।

ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিক্রি এখন সবচেয়ে সহজ ও লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সিন্ডিকেটের কাছে। এক রাতেই প্রশ্নপত্র বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মী ও সংশ্লিষ্টরা।

ঢাবিতে কেলেঙ্কারি

একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন ভর্তি পরীক্ষার কেলেঙ্কারির জন্য পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে। এ বছরে 'ঘ' ইউনিটের জালিয়াতি আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ৪০ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষার্থী ছাড়াও ছাত্রলীগের

www.pathagar.com

নেতাসহ চাকরিজীবী ও কলেজের প্রভাষকও রয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোনে উত্তর জালিয়াতির সময় ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আটক করা হয়েছে। এবার ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ৮০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাসই করতে পারেনি। 'খ' ইউনিটের পরীক্ষায় ১০ জনের ৯ জনই ফেল করেছে। ইংরেজী বিভাগে পাস করেছে মাত্র দু'জন। অথচ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৫ নিয়েও ভর্তির সুযোগ পাওয়া দূরে থাক, ন্যূনতম পাস নম্বরও পাচ্ছে না বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। গত চার বছর ধরে এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ২০১০ সালে যেখানে অনুত্তীর্ণ ছিল ৪২ শতাংশ, বাড়তে বাড়তে চলতি বছর তা ৬৩.৮৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবছরই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়াদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাসের হার উদ্বেগজনকভাবে কমছে। যা মানুষকে হতবাক করেছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন দুই শিবিরে। এক পক্ষের অভিযোগ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে অন্য পক্ষ প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষার মান নিয়ে। শেষ পর্যন্ত যা শিক্ষামন্ত্রী বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রকাশ্য বিতর্কে গিয়ে ঠেকেছে। শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন যার জন্যেই শিক্ষার্থীরা ফেল করছে। খুবই গুরুতর অভিযোগ। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয়ে সৃষ্টির অভিযোগ দেশের সেরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ! এর মধ্যে দুর্নীতির গন্ধ ছড়ালেও দুদককে হাত গুটিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থাকলেও ভর্তি পরীক্ষায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির পেছনে দুর্নীতি কাজ করছে না, এটা জোর দিয়ে বলার সুযোগ নেই। এবার(২০১৪) প্রায় তিন লাখ এক হাজার ১৩৮ শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরম কিনেছে। প্রতিটি ৩০০ টাকা হিসাবে এই খাত থেকেই আয় হয়েছে নয় কোটি তিন লাখ ৪১ হাজার ৪০০ টাকা। আয়ের তুলনায় পরীক্ষা খরচ নাম মাত্র। এমনটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলোতেও। এ টাকা কিভাবে ব্যয় হয় তা জানা না গেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবার কথা কারও অজানা নেই।

ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি, জালিয়াতি ও নকল ঠেকাতে ১৯৮০ সালে পাবলিক পরীক্ষা আইন করা হয়। কিন্তু এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। শুধু ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দোষী শিক্ষার্থীদের আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা আর মামলা করেই যেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

পরীক্ষার ফলে জালিয়াতি

নতুন শিক্ষানীতির আওতায় পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের পর থেকেই প্রতি বছর বাড়তে বাড়তে এবারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় ৯০ শতাংশ পাস ও লক্ষাধিক জিপিএ ৫ পাওয়াকে শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার নিজেদের

www.pathagar.com

মহাসাফল্য হিসেবে দেখালেও অন্যরা একে শিক্ষার সর্বনাশ বলে মনে করছেন। কারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে নানা পন্থায় উদারভাবে খাতা দেখা ও নম্বর দিয়ে পাসের হার ও মেধাবিদের সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ ছিল, এমন অভিযোগ উঠেছে খোদ শিক্ষকদের মাঝ থেকেই। এর ফলে শিক্ষার মান ক্রমাগতভাবে নেমে যাওয়ার পাশাপাশি অনিয়ম, দুর্নীতিও বেহিসেবি হয়ে উঠেছে। এবারের ভর্তি জালিয়াতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসে অন্যান্যদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন কলেজ শাখার নেতাদের নাম পত্রিকায় এসেছে। এর আগে ছাত্রদলের নেতারাও এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষার সর্বনাশে কেউই পিছিয়ে থাকেনি। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাব্যবস্থা যখন এ রকম করে ভেঙে পড়ছে, তখনো শিক্ষামন্ত্রী সংকটের গভীরতা অস্বীকার করেছেন। শুধু শিক্ষামন্ত্রী নন, খোদ প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার বিষয়ে বাগাড়ম্বর করেছেন।

বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, পাস-ফেলের হার, শিক্ষা কার্যক্রম, হল-হোস্টেলের পরিস্থিতি, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি ও দলবাজী শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতিকে যে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা সামগ্রিকভাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্ট ধসের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। ঢাক ঢোল পিটিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষ করে জিপিএ-৫ নিয়ে যে বাড়াবাড়ি তার বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এর কারণ চিহ্নিত না করে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পরস্পরকে দোষারোপের বিতর্ক শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অসম্ভব করে তুলেছে। বিষয়টার গুরুত্ব বিবেচনা করে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিদেশী পত্রিকার একটি রিপোর্ট উল্লেখ করা যায়। সাত-আট বছর আগে ব্রিটেনে একটি সংস্থার জরিপে বেরিয়ে আসে প্রতি পাঁচ জন শিক্ষার্থী একজন ভালোভাবে শিখছে না। সেখানকার সরকার কিন্তু পরস্পরকে দোষারোপের মধ্যে না গিয়ে আরেকটি সংস্থাকে দিয়ে জরিপ করালো। দেখা গেল তথ্য ঠিক আছে। তখন কেন শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে শিখছে না সেই কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আমাদেরও সেরকম ব্যবস্থাই নেওয়া উচিত। আমরা মনে করছি, অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন ও তার সুপারিশের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার জরুরী হয়ে উঠেছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

নবম জাতীয় সংসদের সময় যতই শেষ হতে থাকে ঘনিয়ে আসতে থাকে দশমের নির্বাচন ততই পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ইতিমধ্যে দেশে যতগুলো উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোতে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি

www.pathagar.com

হয়েছে। ছাত্রলীগ যে সত্যি সত্যি সরকারকে ডুবাচ্ছিল, সরকারের জনপ্রিয়তা দিন দিন শূন্যের কোটায় নেমে যাচ্ছিল তা বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সরকার সংসদের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করেছে। যে কেয়ারটেকার সরকারের জন্যে আজকের ক্ষমতাসীনরা যখন বিরোধী দলে ছিল তখন আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল, উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধনী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। খুব সংগতভাবেই বিরোধী দল বিএনপি এর প্রতিবাদ করেছিল। তারা জানিয়ে দিয়েছিল শেখ হাসিনার অধীনে তারা কোন নির্বাচন করবে না।

সরকার পক্ষ বিভিন্ন বাহানা তৈরি করছিল। তারা সততার ভান করছিল। সে জন্যে সংবিধানের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিল। আবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল। বিরোধী দল বিএনপি সেই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও নারায়গঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মতো সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে জনমত এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, নিশ্চিত পরাজয় জেনে সরকার সেই নির্বাচন কৌশলে স্থগিত করল। আজ পর্যন্ত প্রায় নয় বছর হয়ে গেল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন পাইনি।

সরকার এ জন্যে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল। দোষ ঢাকবার জন্য রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, গাজীপুর এই পাঁচটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করে। সরকারের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, আগের মতই বিএনপি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু সরকারকে বিস্ময় এবং অসহায়ত্বের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলাফল এরকম হয় যে, এমনকি আওয়ামী লীগের ঘাঁটি বা দূর্গ বলে পরিচিত গাজীপুর সিটি কর্পোরশন সহ সব ক'টিতে তারা পরাজিত হয়।

তখন থেকে ষড়যন্ত্র পাখা মেলতে থাকে। সরকার বুঝতে পারে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচনের ফলাফল কি হবে। এজন্যে তারা সংবিধান প্রেমিক হয়ে যায় এবং ঘোষণা করে সংবিধান সম্মতভাবে পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রহসনের নির্বাচন

৫ জানুয়ারি ২০১৪ নির্বাচনের নামে এ দেশের গণতন্ত্রের সাথে সবচাইতে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। বিরোধী দলসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে বর্জন ও প্রতিহতের ডাক দেওয়ায় জনগণ একতরফা নির্বাচনে অংশ নেয়নি। ৩০০ আসনের ১৫৩টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জিতে যাওয়াকে নির্বাচন বলা যায় না। দেশে-বিদেশে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও গায়ের জোরে গঠিত সরকারকে নির্বাচিত বলার সুযোগ নেই। যদিও নির্বাচন কমিশন দুই দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে ভোটের পরিমাণ শতকরা ৪০% ভাগ দেখিয়েছে কিন্তু বাস্তবত ভোটের পরিমাণ শতকরা ৫%

www.pathagar.com

এর বেশি ছিল না। এবং দুঃখজনক হলো জনগণের সাথে এই নিষ্ঠুর প্রতারণা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মত ৬৫ বছরের একটি পুরানো রাজনৈতিক দল।

জনসমর্থনহীন এই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্যে পুলিশ র‍্যাবের ওপরে নির্ভর করছে। এই অবৈধ নির্বাচনকে বৈধ দেখাবার জন্যে তারা সব ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীদের মাঠে নামিয়েছে, একটা সম্প্রচার নীতি ঘোষণা করেছে, যাতে করে বিরোধীতা বলে কিছু না থাকে।

সংসদকে বানানো হয়েছে সংয়ের মত। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল হচ্ছে অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় একটি অংশ। অথচ প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত জোট এই নির্বাচনে অংশগ্রহণই করেনি। ফলে একটা বিরোধী দল সাজাতে হয়েছে সরকারকে। যা দেখতে অনেকটা মৎসকন্যার মতো। যার নিচেরটা মাছের মতো আর উপরেরটা একটি নারীর মতো। অনেকটা খেজুর গাছে নারকেল ধরলে যেমন লাগে সে রকম। বর্তমান সংসদে বিরোধী দলের নেতা আবার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত। বিরোধী দলের কয়েকজন আছেন যারা আবার সরকারের মন্ত্রী। এই রকম সংসদীয় গণতন্ত্রের চেহারা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

www.pathagar.com

এরকম হলো কেন

ছাত্ররাজনীতি এ রকম হলো কেন? যে ছাত্র ভাষার জন্যে জীবন দিল, যে শিক্ষার্থী দেশের স্বাধীনতার জন্যে রক্তের নদীতে সাঁতার দিল, তারা আজ চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী হয়ে গেল কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি আগের পরিচ্ছেদে খানিক দেবার চেষ্টা করেছি। ভালো হয় যদি আমরা আরো খানিকটা গোড়ায় যাই।

শিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্ররাজনীতিতে ধস

স্বাধীনতার পরপরই শিক্ষার পরিবেশ ও মান নেমে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল পরীক্ষার হলে নকলের মহোৎসব। নকল করবার স্বাধীনতা অথবা অটো প্রমোশন দেওয়ার দাবি উঠেছিল। শিক্ষাঙ্গণগুলোতে তখন অস্ত্রের ঝনঝনানি, রাজনীতিতে বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতিতে ব্যাপক মতবিরোধ শুরু হয়েছে। সরকারী ছাত্র সংগঠনে ভাঙ্গনের সানাই, যা শেষ পর্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে সম্মেলন করে, মারামারি মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। স্বাধীনতার পর পর বটতলায় এই বিবদমান গ্রুপের একটি ছাত্র-সভা ছিল। ছাত্র-সভায় প্রতিপক্ষের হামলা হওয়ার আশংকা ছিল। আমাকে ঐ গ্রুপের একজন তখন বলে ছিলেন, আমরা ভয় করিনি, কারণ আমরা সবাই লোডেড ছিলাম। পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মুক্তিযুদ্ধের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আর একটি যুদ্ধ অবস্থা তৈরি করে ফেলেছিল। '৭৩-এ ডাকসু নির্বাচনে সরকার পক্ষ পরাজয় এড়াতে ব্যালট বাক্স হাইজ্যাক করেছিল। ছাত্র রাজনীতির তথা জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সেই প্রথম ভোটের রায় গায়ের জোরে পাল্টে দেওয়া হয়েছিল ছাত্রদেরই দ্বারা। ছাত্রদের নৈতিকতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেবার জন্যে এর চাইতে বেশি ক্ষতিকর কাজ আর কি হতে পারে।

ছাত্ররাজনীতিকে নষ্ট করে দেবার এই প্রক্রিয়া কিন্তু সেখানে থেমে যায়নি। তা অব্যাহত ছিল। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে ধীরে ধীরে ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। ক্ষমতা এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করেন। গোয়েন্দা সংস্থা এন. এস. আই জিয়াউর রহমানের এই প্রয়াসের সাথে সবসময় ছিল। এন. এস. আই এর ডিজি জনাব সাফদার ছাত্রদলের এই প্রথম কমিটি তৈরি করে জেনারেল জিয়াকে দেন। দেশ ও ছাত্রদের রাজনীতিতে সেই প্রথম গোয়েন্দা সংস্থা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। পার্থক্য বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়া উচিত নয় যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই এ বিজয়ী ছাত্র সমাজ কীভাবে দেশীয় সামরিক গোয়েন্দাদের কাছে বন্দী হয়ে গেল।

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর সাত্তারের হাত ঘুরে যখন বিএনপির শাসনের অবসান হলো তখন জেনারেল এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনিও জিয়াউর রহমানের কায়দায় নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ গঠন করেন। ডাকসু তথা চলমান ছাত্র আন্দোলনের ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং এ কাজে জিয়াউর রহমানের মত গোয়েন্দা সংস্থাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করেন। কিন্তু ৯ বছর উত্তাল গণআন্দোলন প্রধানত ছাত্ররাই গড়ে তোলে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে এই অবৈধ প্রক্রিয়া তেমন সফল হতে পারেনি। কিন্তু এরশাদ সরকারের পতনের মুহূর্ত থেকে ভয়াবহ এক নৈরাজ্য দেখা দেয় ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যদি ছাত্র রাজনীতির ধারবাহিক বিকাশকে পর্যালোচনা করি তবে আমরা দেখবো '৯০-এর আন্দোলনের পর থেকে এ সময় পর্যন্ত দুই দশকে ছাত্ররাজনীতির বিপথগামী হওয়ার প্রবণতা সবচাইতে বেশি। এটাকে একটা অবক্ষয়ের অধ্যায় বললেও সম্ভবত ভুল বলা হবে না। এই সময়ের মধ্যে এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত যে খুন, গুম হয়েছে তার বিশদ বিবরণ হাজির করলে সবাইকে শিউরে উঠতে হয়। মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মাৎসন্যায় শুরু হয়েছিল, যাতে যুক্ত ছিল ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ। খুনোখুনি একটা 'ফ্রি ফর অল' এ পরিণত হয়।

নির্বাচিত সরকারও দায়ী

এরশাদ সরকারের পতনের পরের দশকে দুইটি টার্মে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। '৯০-এর এই দশক জুড়েই এই নৈরাজ্য অব্যাহত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। এ জন্যেই এ দুটি দল জাতীয়তাবাদী দল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিশেষত দল দুটির নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা তাদের দায় এড়াতে পারেন না। এই দুই নেত্রী সজাগ এবং যত্নবান হলে পরিস্থিতি আরও ভাল থাকত।

যদিও এই সময়ে তারা একত্রিত হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্ররাজনীতির মান ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে। রিকশায় চড়ার বদলে ছাত্রনেতারা প্রাডো, পাজেরোতে চড়তে শুরু করেন। ঢাকা মহানগরে ফ্লাট, বাড়ী, জমিসহ সম্পদের মালিক হয়ে যান। অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠে সন্ত্রাসের চারণক্ষেত্র। খুন হয়ে যায় অনেক ছাত্রকর্মী, সংগঠক ও নেতারা, যার কথা আগে বলেছি।

একটি ঘটনার প্রতি আমি বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। নব্বই দশকের শুরুতে গোলাম ফারুক অভির ছাত্রলীগে যোগদান। ব্যাপারটি বিস্মিত করে সবাইকে, কারণ অভি ছিল ছাত্রদলের শক্তিশালী মাসল যারা বিভিন্ন সময় ছাত্রলীগের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ছিল। সেই অভি হঠাৎ করে ছাত্রলীগে যোগ দিল কেন? ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রশ্ন দেখা দেয়, আজ পর্যন্ত যার কোন সদুত্তর মেলেনি। আওয়ামী লীগের কর্তৃপক্ষ মহল থেকে বলা হয় অভির পুরো পরিবারতো আওয়ামী পরিবার। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, তাতে কী হয়েছে। কিন্তু

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের এই জবাবে সন্তুষ্ট হয় না কেউই, বিশেষ করে সংগ্রামী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না যে রাজনীতিতে অর্থ আর মাসলটাই বড় হয়ে যাচ্ছে, নীতির বালাই থাকছে না।

ছাত্রসংগঠনে বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনে কর্মী রিক্রুটমেন্টে যে কোন রাজনীতি, নীতি-নৈতিকতার বালাই নেই, সে সত্যই উঠে আসে এ ঘটনা থেকে। যার পরিণতিতে ছাত্র ঐক্য ভেঙে যায়। ছাত্রলীগের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে মারা যায় ছাত্রদলের মীর্জা গালিব, লিটন এবং অভিগ্রুপ থেকে ছাত্রলীগের সদস্য যোগদান করা মাহফুজ নামের একজন।

আর একটি উদাহরণ দেই ২০১২-১৩ সালে যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় তখন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন, ছাত্রলীগের মধ্যে ছাত্রশিবিরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমি ছাত্রলীগের সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কীভাবে হয়? তারা ঢুকল কীভাবে? আর ঢুকেও যদি থাকে, তাদের বহিষ্কার করছে না কেন? নিজেদের, মানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তো তোমরা নিশ্চয় চেনো। আমি যেদিন তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সেই দিনই একটি দৈনিক পত্রিকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ওপরে বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, যার মধ্যে শিবিরের অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি এসেছিল। ছাত্রলীগের সভাপতি সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন, ধরুন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০-৩৫ হাজার ছাত্র। এরা সবাই ছাত্রলীগ করে। আমি কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অনেককে আমি প্রশ্ন করে দেখেছি, তারা সবাই ছাত্রলীগ করে। একজন ছাত্রদল কিংবা অন্য কোন দল করে না। কেন, জানতে চাইলে তাদের জবাব, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী ছাত্র সংগঠন বলতে কিছু নাই। বলা বাহুল্য, বিএনপি যখন ক্ষমতা ছিল তখনও অবস্থা একরকমই ছিল। এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়াচ্ছে এ রকম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মূলতঃ কোন রাজনীতি করে না। সরকার বদলালেই যখন তাদের বদলাতে হয়, তখন তাদের সঙ্গে মিরপুরের হাজী খালেকের পার্থক্য কি, যিনি বলতেন, আমি তো দলই বদলাই না ? সরকার দল বদলায় ফালায়। আমি সবসময় সরকারি দল করি।

কী ভয়াবহ অবস্থা। এর ফলে সবচেয়ে বেশি যে ক্ষতি হয়েছে তা নীতির। জরুরি অবস্থার সময় অভিযোগ করা হয়েছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিরাজনীতিকরণ করেছেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই দুটি দল আর তাদের ছাত্রসংগঠন তাদের অঙ্গনে এই প্রক্রিয়াই চালু রেখেছে।

একসময় ঢাকার একটি বড় কলেজের ছয়টি হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্র দেখা করতে এসেছিল। আমি তখনও আওয়ামী লীগে আছি। তারা সবাই ছাত্রলীগ করে কারণ ছাত্রলীগ না করলে হলে থাকা যায় না (বিএনপির সময়েও এই নিয়ম চালু ছিল)। সেই ছাত্রলীগের কর্মীরা জানালো তাদের কলেজের পার্শ্ববর্তী এলাকার আওয়ামী লীগ সভাপতির স্ত্রী মাঝে মধ্যে কলেজের পাশের বাজারে মাছ, শাক-সবজী কিনতে

www.pathagar.com

আসেন। তাঁকে প্রটোকল দিতে হয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের। খুবই অপমানজনক মনে হয়েছে তাদের কাছে ব্যাপারটা। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারছে না তারা। প্রতিবাদ করলে হল থেকে বের করে দেবেন নেতারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গেও মাঝেমধ্যে কথা হয় আমার। এক ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞেস করলাম; বিষয়টি উনি স্বীকার করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম একটা ব্যাপার চালু আছে। বলেই তিনি বললেন, তা করবে না? যাদের আমি ভর্তি করিয়েছি তারা আমার কথা শুনবে না? আমাকে প্রটোকল দেবে না? এটাকে তার পাওনা বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হলের ছাত্রলীগ সভাপতি আবাসিক ছাত্রদের আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়ার মধ্যযুগীয় কায়দার কথা আমরা পড়েছি না পত্রিকায়? হৃদয়হীন, বিবেকহীন একদল নেতা তৈরি করছি না আমরা? আর হাজার হাজার অসহায় ছাত্র অবনত মস্তকে তাদের কুর্নিশ করছে। এরা কি বরকত-সালামের উত্তরাধিকারী, কিংবা সেলিম দেলোয়ারের?

লজ্জাকর পরিস্থিতি

এরও বেশ কিছুদিন আগের কথা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তখন ধর্ষকদের অভয়ারণ্য। ধর্ষণে সেঞ্চুরী করেছিল এক ছাত্র। সবকিছু জানাজানি হবার পর এটাও জানা গেল যে সে ছাত্রলীগের একজন নেতা। এও কি সম্ভব? খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, সে সদ্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। ছাত্রলীগ এবং মূলদল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা এটা বলে হয়তো আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। কিন্তু এতে নৈতিকতার যে প্রশ্ন ওঠল তার কোন সমাধান হলো না। জাতীয় রাজনীতিতে নীতি বদলের প্রবণতা যেন আসকারা না পায় সে জন্যে নির্বাচন কমিশন কত বিধান তৈরি করেছে, আমলারা অবসর নিয়ে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিলেও তিন বছরের মধ্যে কোন নির্বাচন করতে পারবেন না, নিবন্ধন না করলে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। আরও কত কি! জাতীয় সংসদকে পূতপবিত্র রাখতে কত চিন্তাভাবনা, ক্রিয়াকর্ম। রাজনৈতিক দলগুলো ভাল ছাত্রের মত সব মেনে নিচ্ছে। অথচ ভবিষ্যৎ রাজনীতির যে পাঠশালা সেই ছাত্র সংগঠনগুলোতে কত অবৈধ নীতির আমদানি, রপ্তানি বাণিজ্য চলছে। ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা দেখছে এখন আর নেতা হবার জন্যে ত্যাগ তিতিক্ষা মেধা বিবেচনায় আসছে না। নেতা হবার নিজেদের দায় আছে না। জনগণকে অবিশ্বাসী সরকারগুলো এভাবেই নিজেদের দায় এড়াতে চায়। নষ্ট হওয়ার পথ করে দেবে তারা, অন্তত খুলে যাওয়া পথ বন্ধ করবে না।

মানুষ তো সে পথে হাঁটবেই। আদম-হাওয়াকে গন্ধম খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। যারা সনদ-বাণিজ্য করছে তারা অর্থলোভী। আর যারা নিচ্ছে, তারা বাংলাদেশে ব্যবহার করতে না পারলেও বিদেশে চাকরির জন্য ব্যবহার করছে। আবার অনেকে আছে অর্থবিত্তের মালিক। নামের আগে কিছু বিশেষণ লাগানো অথবা মানুষ

www.pathagar.com

বলতে পারার জন্য একটি উচ্চশিক্ষার সনদ জোগাড় করছে। এভাবে সার্বিক শিক্ষার মানকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

একা কাউকে দায়ী করছি না আমি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, যেসব দোষত্রুটি আর দুর্নীতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তা সংশোধনের চেষ্টা কেউই করেনি। ভুল আর অন্যায়গুলো বাড়তে বাড়তে এখন তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে তারা। দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি। আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। সে হিসাবে বলা উচ্চশিক্ষায় দেশের মোট ছাত্রসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই পড়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেখানে কোনো ছাত্ররাজনীতি নেই এবং যেখানে শিক্ষার নামে চলছে মিথ্যার বেসাতি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা করছে। কারণ আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে সরকারি ছাত্র সংগঠনের মাৎসন্যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রাজনীতির কদর্য রূপ দেখিয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাতে নীতিহীনতা বন্ধ হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত আবদুল জলিলের মতে রাজনীতি এখন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। আওয়ামী লীগের জন্মের প্রথম দিক থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরেও এ অবস্থা ছিল যেখানে জাতীয় পর্যায়ে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে বা নেতৃত্ব নির্বাচনের সময় বিবেচ্য ব্যক্তির রাজনৈতির বায়োডাটা বিবেচনায় আনা হত। তার ত্যাগ তিতিক্ষা, রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা, জেল, জুলুম, নির্যাতন ভোগের পরিমাণ বিবেচনায় আসত। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয় রাজনীতি আজ অর্থ, পেশী এবং দুর্বৃত্তায়নের শিকার। এককালের ছাত্র রাজনীতির অবিসমম্বাদিত নেতা তোফায়েল, মেননরা, যারা এই গতকালও জাতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য নেতা ছিলেন তারা জাতীয় রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হচ্ছেন। জাতীয় সংসদসহ সেই সব জায়গা দখলে নিচ্ছেন উঠতি টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ, দশম জাতীয় সংসদকে যদিও সংসদ বলা যায় না। এখানে ইচ্ছামতো ক্ষমতাসীন দল তাদের পংক্তি সাজিয়েছেন। তারপরেও টি, আই. বি, র এক গবেষণায় দেখা যায় এই সব কথিত সদস্যদের মধ্যেও ব্যবসায়ী ৫০% ভাগ, আইনজীবী ১৩% ভাগ, অন্যান্য ৭% ভাগ আর রাজনীতিবিদ হলেন সবচাইতে কম। মাত্র ৬% ভাগ।

www.pathagar.com

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক

ছাত্ররাজনীতির এ অবস্থা দেখে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক। গত সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাব করেছিল ছাত্র সংগঠনসমূহকে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া চলবে না। তাদের কেবল ছাত্রদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করতে হবে এবং সবাইকে নিয়মিত ছাত্র হতে হবে।

কী সাংঘাতিক কথা! যে তরুণ ছাত্রসমাজ সাহসী স্পর্ধায় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল এবং অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে সেই পতাকা উড্ডীন রেখেছিল, সেই তাকেই কিনা বলা হচ্ছে রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। মজার ব্যাপার যারা বলছেন তাদের অধিকাংশই তাদের অতীতে ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। কিন্তু তারা সেই ৪৮ থেকে অধ্যাবধি ছাত্ররাজনীতির বিকাশের ধারাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন না। খেয়াল করছেন না ধীরে ধীরে ছাত্র আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে।

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করি। ভাষা আন্দোলনকে আমরা নিশ্চয়ই একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলব। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না, ভাষা আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম এবং সফল প্রতিবাদ। ভাষা ধর্ম নিরপেক্ষ। বলা যেতে পারে সেটাই পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন। এটাকে নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে পারি। কিন্তু তা কোন অংশেই এর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে খাটো করে না। বরং সেই আন্দোলনই রাজনীতিকে আরও বড় করে, আরও শক্তি দেয়। আজ আমরা যে বলি ভাষা আন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতার প্রথম সোপান সে তো সত্যিই। এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সর্ব জনাব আব্দুল মতিন, গাজিউল হক, অলি আহাদ, মো. সুলতান, মো. তোয়াহা, শেখ মুজিবুর রহমান এরা সবাই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ।

ভাষা আন্দোলনের মহান বিজয় সরাসরি প্রভাব ফেলে ৫৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা দল মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদের বোধ সুপ্ত ছিলো বলেই তো এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের তিন নেতা কি ছাত্রদের সেই নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাননি? ছাত্ররা কী সেই আহ্বানে সাড়া দেয়নি? তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার তো একথা বলতে পারতো যে যুক্তফ্রন্ট রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার

www.pathagar.com

করছে। তারা কী এরকম বলেছিল? আমি জানি না। বললে কী তা ঠিক হতো? কেউ মানতো?

২১ ফেব্রুয়ারির আগের রাতে ছাত্রনেতারা যে রাজনৈতিক দলের সাথে বসে ছিলেন সেটা কী ভুল ছিল? যদি রাজনৈতিক দলের নেতারা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত দিতো তখন কী বলা হোত যে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে? নিশ্চয়ই না। সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে সকলেরই থাকা উচিত, সেটা রাজনৈতিক হোক বা না হোক। কোন দলের নেতৃত্বে হোক কিংবা না হোক।

খেয়াল করা দরকার '৫২-র আন্দোলনের সময় ডাকসু ছিল না। ডাকসু আবারো আসে ভাষা আন্দোলনের পরে। প্রথম দিকে যদিও এটি ছিলো অরাজনৈতিক ও অসাংগঠনিক, শেষে তা পরিপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র পরিগ্রহ করে। '৫২-র পরে ছাত্র আন্দোলন আবার দানা বাঁধতে থাকে '৬০-এর দশকের শুরুতে যা '৭০-এ এসে পূর্ণতা পায়। এই সময়গুলোতে ছাত্রদের নির্বাচিত সংসদ ডাকসু ছিল। '৬৯ বা '৭০, '৭১-এর ডাকসুতো রীতিমতো জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। যারা মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে চান অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতির সমস্যা দেখে ছাত্রদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিতে চান তারা এটা বুঝতে পারেন না যে আমাদের দেশে ছাত্র আন্দোলন যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত তা জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অথবা বলা উচিত মহান যে সব ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে সে সবই জাতীয় ইস্যুভিত্তিক ছিল, তার পেছনে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব থাকুক বা নাই থাকুক।

এ সবই হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। আমি বলতে চাইছি আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব এই প্রয়োজনে দাঁড়াতে পারে নি। তাই ছাত্ররাই সেখানে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজুড়ে অনেক উদাহরণ

অনেকে বহির্বিশ্বের উদাহরণ দেন। 'কই সে সব দেশে তো আমাদের মতো ছাত্র রাজনীতি নাই।' আসলে তারা জেনে কথা বলেন না। আমি উদাহরণ দেই, প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশক ছিল, শুধু পাকিস্তান নয় সারা বিশ্বজুড়ে ছাত্রদের উত্তাল বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সময়। ১৯৬৪ সালেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও ছাত্রদের বিজয় ঘটে এবং কর্তৃপক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসে রাজনীতি করার অনুমতি দেয়। ১৯৬৫ সালে রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার জাপানী ছাত্র। লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকসের ছাত্ররা ১৯৬৬ সালে বর্ণবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে আন্দোলন শুরু করে নবনিযুক্ত পরিচালকের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য দাবি যুক্ত হয়ে তা অব্যাহত থাকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। প্রায় একই সময়ে আন্দোলনের জড়িয়ে পড়ে ইতালি, স্পেন, জার্মানি, মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং তুরস্কের তরুণরা। প্রত্যেকটি আন্দোলনে একটি মূল শ্লোগান ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

সেই সময় বিশ্ববাপী বিক্ষোভের প্রথম কাতারে ছিল ফ্রান্সের ছাত্র, শ্রমিক ও তরুণরা। তারা স্বৈরশাসক, প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্য গলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে

www.pathagar.com

উঠলেও ভিন্ন একটি বিষয় নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ফ্রান্সের ঘটনাবলী ১৯৬৮ সালের মে (মাস) হিসেবে পরিচিত হলেও বিক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২২ মার্চ। সেদিন নানতেয়ারে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি, সঙ্গীত শিল্পী এবং ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রশাসনিক ভবন দখল করে ফরাসী সমাজে বিরাজমান শ্রেণি বৈষম্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ঘটনা মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ তলব করলে ছাত্ররা ভবনের দখল ছেড়ে দিলেও পরদিন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ ২ মে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় নেমে আসে এবং আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সোবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর আগে ১৮ মার্চ প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেস ম্যানহাটন ব্যাংক ও ট্রান্স ওয়ার্লড এয়ার লাইন্সের অফিসে ছাত্ররা বোমা হামলা চালায়।

ফ্রান্সে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে চলে আসেন সোবর্ণ বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র, কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী জ্যানিয়েল কোহেন ব্যান্ডিট। একই সময়ে পশ্চিম জার্মানিতে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হতে থাকে একটি নাম রুডি ডটস্কি, সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি নাম তারিক আলী।

আন্দোলন এত তীব্রতা লাভ করে যে, প্রেসিডেন্ট দ্য গল প্রায় পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রান্সের বিমান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন এবং ১৯৬৮ সালের ২৩ জুন সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। থামসাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিদ্রোহের কথাতো বিশ্ববাসী অবহিত আছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোরিয়ার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে সমাবেশ করেছিল এবং সেখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্ত করে এক ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া রাষ্ট্র গড়ে তোলা ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাটি থেকে ৩৭ হাজার হানাদার মার্কিন সেনা অপসারণের দাবি করেছিল সে কথা সবাই জানে। কোরিয়ার ক্ষমতাসীনরা এই নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় ছাত্রদের আন্দোলন দমন করার জন্যে কী নির্মম বর্বরতা চালিয়েছিল তাও হয়তো কেউ ভুলে যান নি। কোরিয়ার পুলিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের প্রতিরোধ ভাঙতে হেলিকপ্টার থেকে তাদের ওপর টিয়ারগ্যাস ও গ্যাস নিক্ষেপ করে।

৯ ডিসেম্বর ২০১০ লন্ডনের ছাত্র বিক্ষোভের কথাই ধরি। সেদিন বিক্ষোভে যে সহিংসতা হয় তা ব্রিটিশদের অনেককেই হতভম্ব করেছে। বিক্ষোভকারীরা একসময় ওয়েস্টমিনস্টার প্যালেসের দিকে ছুটে আসে। পুলিশের বাধা পেয়ে তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের জানালা ভাঙে এবং সুপ্রিম কোর্টে ঢিল ছোঁড়ে। রাস্তায় কাঠের বাক্সে আগুন ধরিয়ে দেয়, চার্চিলের মূর্তিতে প্রস্রাব করে। কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক হলো, ঐদিন সন্ধ্যায় রাজকুমার চার্লস যখন তাঁর স্ত্রী ক্যামিলাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন তখন পার্লামেন্ট থেকে বেশ দূরে রিজেন্ট স্ট্রিটে প্রায় ৫০ জন বিক্ষোভকারীর একটি দল তাদের রোলস রয়েস গাড়ি লক্ষ্য করে নানা কিছু ছুঁড়ে মারে। তাতে একটা

www.pathagar.com

জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। একজন বিক্ষোভকারী ভাঙা জানালা দিয়ে একটা লাঠি ঢুকিয়ে ক্যামিলার কোমরে খোঁচা দেয়।

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, পুলিশ গত কয়েক দশকের মধ্যে জনতার সঙ্গে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েনি। লক্ষণীয় হলো, পার্লামেন্ট ভবন, ট্রেজারি ও রাজকুমারের গাড়ি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও লন্ডন পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি, যেমন বাংলাদেশে সম্প্রতি করা হয়। বেধড়ক লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসও ব্যবহার করা হয় নি। ব্রিটেনে এখন জোর আলোচনা চলছে বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশ উন্নতর ও আরো বেশি কার্যকর কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। একটা প্রস্তাব এসেছিল যে পুলিশ ভবিষ্যতে এরকম অবস্থায় জলকামান ব্যবহার করুক। লন্ডনের পুলিশ কর্মকর্তারা প্রস্তাবটিকে অবাস্তব আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এটি উন্নত গণতন্ত্রের লক্ষণ। উন্নত গণতন্ত্র ছাত্র তরুণদের সমাজের ভিলেন মনে করে না। তাদের দমনে নির্যাতন চালায় না। বরং তাদেরকেই সমাজের ভবিষ্যৎ মনে করে। অনুন্নত দেশে যে কোন বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাবেই তরুণদের দেখা যায়। কেননা তাদের মধ্যে সাহস থাকে, থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো স্পর্শকাতর মন ও স্পর্ধা। স্বার্থবোধ কম থাকায় তাদের শঙ্কা থাকে না স্বার্থ হারানোর। মানসিকভাবে শ্রেণিচ্যুত হওয়া তাদের ক্ষেত্রে যতটা সহজ অন্য কারও পক্ষে ততটা নয়। বিশেষ করে তরুণরা, চিরকালের আশাবাদী। মানুষের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা উদ্দীপিত হৃদয় তরুণরা মানতে চায় না হতাশাকে, মানতে চায় না আত্মস্বার্থবোধের বয়স্ক অনুশাসন। তরুণের পক্ষে তাই উপায় থাকে না বিদ্রোহ না করে।

ভারতবর্ষ

১৮৩০ সালে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদকারী জুলাই বিপ্লবের সময়টাতে কলকাতার কয়েকজন ছাত্র এক নিশুতি রাতে নবনির্মিত অষ্টরলীন মনুমেন্টের ছাড়া থেকে ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে উড়িয়ে দেয় ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার তেরংগা জান্ডা। এই ঘটনাই এই উপমহাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আঁতুড় ঘর বলা চলে। পরবর্তীকালে কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী লুই ডিভিয়ান ডি রোজিও-এর হাত ধরে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যাত্রা শুরু করে উপমহাদেশের প্রথম ছাত্র সংগঠন 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'। এরপর ইয়ংবেংগল এবং তাদের পত্রিকা 'পার্থেনন' এই উপমহাদেশের ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক মনন বিকাশে অবদান রাখে। সুতরাং এ অঞ্চলের ছাত্র সংগঠনের ইতিহাসও বেশ প্রাচীন এবং সমাজচেতনা নির্ভর।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সম্পর্কে অনেকেরই জানা থাকার কথা। সেখানে (১) ছাত্র সংগঠনগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত এবং প্রকাশ্যভাবেই ছাত্র

www.pathagar.com

রাজনীতি করে; (২) সেই সব সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। কিন্তু এগুলো কোনো ক্রমেই তেমন ব্যাপক নয় যেমন আমরা বাংলাদেশে দেখি। বাংলাদেশ থেকে ভারতের যে সমস্ত বাংলা টিভি চ্যানেলগুলো দেখা যায় তা থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে এ ব্যাপারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে ছাত্রসংগঠনসমূহের প্রচুর পোষ্টার চোখে পড়ে এবং সেখানে খুব শক্তিশালী ছাত্র-আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা মারামারি করেছে কিংবা বিরোধী ছাত্রদের খুন করেছে আবার সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এমন ঘটনা তুলনামূলক কম।

www.pathagar.com

ছাত্ররা এখনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভ্যানগার্ড

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেবার এই যে একটা ক্যাম্পেইন তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হলেও বাংলাদেশে এখনও গণতন্ত্র ঝুঁকির মধ্যে আছে। প্রকৃতপক্ষে ৪৩ বছরের শাসন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দেশ সবসময় স্বৈরাচার, সামরিক স্বৈরাচার অথবা আধা স্বৈরাচারের অধীনে ছিল। ৭৫-এ একবার সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এক দলীয় স্বৈরাচার কায়েম করা হয়েছিল। তারপর আধা সামরিক ব্যবস্থা এবং দীর্ঘসময় ধরে সামরিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত ছিল যার বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজই প্রধান লড়াইটা করেছিল। আর ২০১৪ সালে ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে এক ঐতিহাসিক প্রহসন করে এখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। ৪৩ বছরেও লড়াইটা শেষ হয়নি দেশ এখন আবার একভাবে দলীয় বা জোটগত স্বৈরাচারের অধীনে শাসিত যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এক ব্যক্তির হাতে।

আবার জেঁকে বসেছে স্বৈরাচার

এক নগ্ন নিষ্ঠুর স্বৈরাচার এখন দেশ চালাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার ওপর দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে তারা। নানা রকম কালা কানুন জারি করে বাক-ব্যক্তি-সংগঠন-মুদ্রণ-প্রকাশনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোর উপরে এর প্রভাব ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। নানা অজুহাতে এমনকি অন্যায়ভাবে ক্ষমতার জোরে বিরোধী দলকে মাঠে নামতে দিচ্ছে না তারা। ভোটারবিহীন এক নির্বাচনে জয়লাভ করে তারা নিজেদেরকে বৈধ প্রমাণ করবার জন্যে গণতন্ত্রের লেবাস খুলে ফেলে হিটলার মুসলীনির ভাষায় জানান দিচ্ছে, কোনো রকম বিরোধীতা বরদাশত করবে না তারা। বিরোধী দলের উপরে স্টীম রোলার চালানোর জন্যে তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দল ও সরকারের আজ্ঞাবহ করার নির্লজ্জ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সমস্ত কাজের ফলে বাহিনীসমূহের মধ্যেও এক বিরাট বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দৃশ্যমান হচ্ছে, যা দেশের জন্যে খুবই ভয়াবহ হতে পারে।

পটভূমি

বাংলাদেশের মানুষের ধারণা বৃহৎ শক্তি বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। গত ৫ জানুয়ারির প্রহসনে ভারতীয় মদদের কথা গ্রামের বাচ্চারাও জানে। যে দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নারী-পুরুষ, যুবক-শিশু জান বাজি রেখেছিল সেই দেশের ওপর এইভাবে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনরা তো বটেই এমনকি বিরোধীরাও তেমন উচ্চ-বাচ্য করছে না। এ সমালোচনা স্বাধীনতার পর থেকেই আছে যে, কেবল ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দল এমন নগ্ন লড়াইয়ে ব্যাপৃত আছে যে তারা বিদেশী এইসব শক্তির কাছে নিজেদের মানসম্মান ও অধিকার সমর্পণ করছে। ফলে আমাদের তেল, গ্যাস, বন্দর, বিদ্যুৎ, জাতীয় সম্পদসহ দেশের জমি, সীমান্ত এমনকি সমুদ্র পর্যন্ত নিরাপত্তা হারিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার দাবিদারদের অজ্ঞতা, অদক্ষতা ও উদগ্র অর্থলিপ্সা। জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন এখন এইসব দলের কাছে কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন সৃষ্টি করে না। এই কারণেই আমরা আমাদের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার করতে পারছি না। বিষয়সমূহের জন্যে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দরকার। আমাদের তেল, গ্যাস ও কয়লাকে আমরা কিভাবে সর্বোত্তম কাজে লাগাবো সেটা কেবল মাঠের বক্তৃতা দিয়েই নির্ধারিত হবে না। এর জন্যে চাই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। আমাদের ছাত্র যুবকরা সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তা বলছি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানের পীঠ স্থান। মনে পড়ে লেখক আহমদ ছফার কথা। 'ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে তার করা প্রত্যাশাটাই আজ বড় বেশী প্রাসঙ্গিক, "এই রকম নিস্ফলা বন্ধ্যা সময়েও আমি বিশ্বাস করি, ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যুতের অক্ষরে অমোঘ নির্দেশ জারি করতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তেজিত হও, জাগ্রত হও, জ্ঞানের আলোকে জাগো, মানবতার আবেগে জাগো, প্রতিরোধের দুর্গম স্পৃহা বুকে নিয়ে নতুন পৃথিবী নির্মাণ করার প্রতিজ্ঞায় জাগ..."

এই বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি? বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পীঠ সেখানে জ্ঞানচর্চা হয়, বিতরণ হয়। গবেষণা হয় এবং তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে সত্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আলাদা এ ভাবে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই ভাষা আন্দোলন করেছে, একটি জাতির জন্যে স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ করেছে ও এভাবে জাতিকে বিজয়ী করেছে। এবং এ কাজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে। আহমদ ছফা সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে আবার জেগে উঠতে বলেছেন। ২০১৫ সালেও জনতার কণ্ঠে আহমদ ছফার কথার প্রতিধ্বনি।

অপার সম্ভাবনা

বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনার দেশ। বাঙালী জাতিও এক অদ্ভুত জাতি। যারা ঝড় ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, আইলার মধ্যেও লড়াই করে, বেঁচে থাকে এবং আরও সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখে। বাঙালী সাহসী, পরিশ্রমী, মেধাবি এবং সৃজনশীল জাতি। এক সময় গোখলে বলেছিলেন, What Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow. বাঙালী যে বুদ্ধিমান, ভবিষ্যৎ দেখবার ক্ষমতা আছে তাদের সে কথাই বলেছিলেন গোখলে। বৃটিশরা এটা বুঝেছিল। তাই বাঙালীদের শাসন করবার জন্যে তারা প্রথম বাঙালীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করার কাজে হাত দেয়। তারা প্রচার করে যে,

www.pathagar.com

বাঙালীরা ভীরু কাপুরুষ, আলসে, হিংসুটে এবং স্বার্থপর। তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়বার যোগ্যতা রাখে না। তাই বৃটিশ শাসন। কিন্তু ভারতীয়রা তথা বাঙালী বৃটিশকে বিতাড়িত করেছে, এখন নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি নির্মাণ করছে। এই ৪৩ বছরে বাংলাদেশ যতখানি এগিয়েছে ভারত কিংবা পাকিস্তান তা পারে নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বাংলাদেশের অগ্রগতির কথা বলেছেন। সমগ্র ইউরোপ আমেরিকার মন্দার সময়ও বাংলাদেশ তার প্রবৃদ্ধি মোটামুটিভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্যসেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেছেন। বিশ্ব ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের এই উন্নতির প্রশংসা করে বলেছে বাংলাদেশকে এখন ৪টি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। যার মধ্যে রাজনীতির চ্যালেঞ্জটি সবচেয়ে বড়।

সব কৃতিত্ব জনগণের

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যেটুকুই অগ্রগতি তার সমস্ত কৃতিত্বই এদেশের কৃষক, গার্মেন্টস ও প্রবাসী শ্রমিকদের কৃতিত্ব। রাজনীতি এই অগ্রগতি কে সহায়তা তো করেইনি বরং দু'টি বড় দল এতো নিষ্ঠুর, কুৎসিতভাবে ক্ষমতার লড়ায়ে লিপ্ত হয়েছে যা সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিপদগ্রস্ত করেছে। দু'টি বড় দল এখনও এমন কুৎসিত লড়াইয়ে লিপ্ত আছে যা বাংলাদেশের অস্ত্রনীতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে। এখানেই বিবেক ও বুদ্ধির লড়াই এবং তার সাথে সাহসী উপস্থিতি প্রয়োজন। এবং এ জন্যেই ছাত্র রাজনীতির গুরুত্ব অস্বীকার করা তো দূরের কথা এমনকি খাটো করে দেখবারও সুযোগ নেই। যে স্বৈরাচার এখন দেশের ঘাড়ে চেপে বসেছে তার বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই করবার জন্যে এই ছাত্রদের দরকার। তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। এরাই ব্যক্তিগত যোগ্যতায় বড় বড় অফিসার, শিল্পোদ্যোক্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এবং সমবেত প্রচেষ্টায় সমাজকে পরিবর্তিত করে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি যত দ্রুত বাড়ছে সমাজ পরিচালনার জন্যে আমাদের তত বেশি শিক্ষিত ও মেধাবী মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে। এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে সেই ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়বার জন্য তো শিক্ষিত মেধাবী মানুষ লাগবে। আমাদের মত অনুন্নত দেশে সেই মানুষ, সেই বিশেষজ্ঞ আমরা কোথায় পাব? তার জন্যে আমাদের ঐ ছাত্রদের কাছেই যেতে হবে, যারা সমাজের সাথে সাথে, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠবে। সে জন্যেই দরকার ছাত্ররাজনীতির যেখানে জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা হবে, সত্যের অনুসন্ধান হবে এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই চলবে। এভাবে যদি ছাত্র রাজনীতি গড়ে ওঠে তবে তা কারোরই লেজুড়বৃত্তি করবে না।

অগ্রগামী ভূমিকা

বাজার অর্থনীতির এ বিশ্বে আমাদের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের অর্থনীতি কতটুকু সুরক্ষিত? বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশ্ব শক্তিগুলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, বন্দর ব্যবহার করতে চায় আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ওপর নিজেদের পুঁজির আধিপত্য প্রশস্ত

www.pathagar.com

করতে চায়। এমন এক বিশ্বে আমরা যে তবু আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নিতে পারি সেই জের কোথা থেকে আসে? দু'পয়সা আয়ের চিন্তায় ব্যস্ত ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবীদের কাছ থেকে? রাজনীতি যারা করেন তারা ঠিকই বোঝেন ছাত্র-যুবকরাই তাদের শক্তি। জনমত গড়ে তুলতে হলে, রাজপথে নামতে হলে, বুকের তাজা রক্ত দেবার কালে আজো প্রথমে এগিয়ে আসবে ছাত্র, তার পেছনে বাকী সবাই। প্রথম এগিয়ে আসার লোক না থাকলে পেছনের লোকও থাকবে না। দুভাগ্যজনক যে, দেশের শত্রুরা তা ভালভাবেই জানে এবং সে কারণেই ছাত্র-রাজনীতির মধ্যে দুর্বৃত্তপনার ভাইরাস ঢুকিয়ে তা নষ্ট করায় ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এই দেশের জনগণই তা বুঝতে পারি না বা আমাদের বুঝতে দেয়া হয় না।

ছাত্ররা সবসময়ই প্রতিবাদমুখী

সাম্প্রতিক সময়ে ভাল, মেধাবী ছাত্ররা কিছু করছে না, তারা সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে এ ধারণাটাও সঠিক নয়। ২০০৭-এর সেনা সমর্থিত জরুরী অবস্থার সরকারের বিরুদ্ধে এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ছাত্ররাই। যখন বিএনপি ক্ষমতা ছিল, তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সাবেকুন নাহার সনি হত্যার প্রতিবাদে। এমনিতেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভীড়। সেখানে লেখাপড়ার চাপ বেশি। ছাত্ররাও তাতেই ব্যস্ত। এর বাইরে বিশেষ করে রাজনীতির জন্য দেওয়ার মতো সময় তাদের নেই। কিন্তু তারপরেও টেন্ডারের টাকা ভাগাভাগিতে ২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েট ক্যাম্পাসে ক্লাস শেষে ফেরার পথে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে যখন সনির মতো মেধাবী ছাত্রী মারা গেল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বই-খাতা তুলে রেখে রাজপথে নেমে পড়েছিল। বুয়েটের ছাত্রী সনি নিহত হয়েছিল ছাত্র-রাজনীতির কারণে নয়। ছাত্রদলের দুই উপদলের যে বন্দুকযুদ্ধে তার নিহত হওয়া, তার কারণ টেন্ডারবাজী। উচ্চাভিলাস ও ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা এমনকি নারী লাঞ্ছনার মতো ঘটনা প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার মূল রাজনীতি যেমন অন্যায়, অবৈধ ইচ্ছা চরিতার্থ করার সোপান বা আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক ছাত্র রাজনীতিও সেই একই ব্যাধির শিকার হয়েছে।

পরিবর্তন দরকার উপর থেকে

যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কি টেন্ডারবাজী বন্ধ হবে? অবৈধ উপার্জন করে, অবৈধ ক্ষমতা ভোগ করে অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার যে পথ এক শ্রেণীর ছাত্র নামের অপরাধীরা খুলেছে তা কি বন্ধ হবে? অবৈধ অর্থ ও অবৈধ অস্ত্রের দাপট কি বন্ধ হবে? সরকার রাজনৈতিক দলে, পুলিশে, প্রশাসনে ও ক্ষমতার অন্যান্য বলয়ে তাদের যে পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে তারাও কি নিষ্ক্রিয় ও সাধু হয়ে যাবে? ছাত্র নামধারী মাস্তান-ক্যাডার তৈরি হয়েছে মূল রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অংশ হিসেবেই। তাই সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়া দরকার উপর থেকেই।

www.pathagar.com

যে সমাজ দারিদ্রক্লিষ্ট, যে সমাজে শিক্ষা বঞ্চিত মানুষেরই ভিড় বেশী, যে সমাজে দুর্নীতির শিকড় ঢুকেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সেখানে শিক্ষিত তরুণ সমাজের ভূমিকা হবে সবচেয়ে শুভ এবং সার্থক এমন ভাবনাই তো করা উচিৎ।

এ সময়ের তরুণরাই রাস্তায় ফুল বিক্রি করে, গান শুনিয়ে অসহায় শিশুদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করে, শীতার্ত গরিব মানুষের জন্য শীতের কাপড় দেয়, বস্তিতে বস্তিতে স্কুল খুলে সেখানকার শিশুদের পড়ায়। এ তারুণ্যই অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে, বিদ্রোহ করে।

এই ছাত্র-তরুণরাই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে। তাদের ভূমিকার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই চরিত্র এখনও হারিয়ে যায়নি। ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়ার পরও অন্যান্যদের সাথে ছাত্র-তরুণদেরই ব্যাপকভাবে রাত দিন খেয়ে না খেয়ে বিপদ তুচ্ছ করে উদ্ধার কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে।

প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে চলা উদ্ধার কাজে অনেক যুবক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অংশ নিয়েছিল। তাদের অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত হয়ে বিরামহীনভাবে অকুস্থলে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে। পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়েই।

ছাত্র-তরুণদের এরকম ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাট করে দেখা যায় না। জাতীয় প্রয়োজনে সব সময়ই তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

শিক্ষাঙ্গণে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে রাজশাহী, রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর-নগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও। ২০১২-১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বেতন বৃদ্ধি, অবৈধ নিয়োগ, আর্থিক দুর্নীতি, দলবাজি ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্ররা ফুঁসে উঠেছিল ছাত্ররা। এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সচেতন নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের ভূমিকা

রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে একজন ছাত্রের দেশের সমস্যা এবং সরকারের ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। তেমনি অধিকার রয়েছে যে কোন সংগঠনে জড়িত হবার, হোক না তা বিজ্ঞানভিত্তিক, ডিবেট ক্লাব, সমাজকল্যাণমূলক, গবেষণামূলক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক। নিজে ছাত্র হয়েও যদি নিজের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত না করে দেশ গঠনে বা সমাজ গঠনে কোন ভূমিকা রাখা যায় তবে কেন তা করা হবে না? একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমাকে বলেছিল, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর যখনই কোন অন্যায় হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে সক্রিয়। সকল সমিতি বা ক্লাবের প্রধানদের নিয়ে আমরা তার প্রতিবাদ করেছি। সেসব প্রতিবাদ অনেক সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ ছিল।' এভাবে বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরি সম্ভব এবং সময়-অসময়ে এরাই সমন্বিতভাবে সব কিছু দায়িত্বশীলদের কাছে তুলে ধরবে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে হলেও ছাত্রদের নেতৃত্বশীল করে তুললে দেশের শিক্ষাঙ্গনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। এতে করে নির্বাচিত হবার প্রত্যাশায় ছাত্রদের মাঝে গ্রুপ বা সংগঠন গড়ে উঠলেও তা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গণে প্রভাব ফেলতে পারবে না। ফলে ব্যক্তি বা দলগত অশুভ স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া কমে আসবে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কৌশল হিসেবে দেখা যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতিতে না জড়ানোর শর্তে ভর্তি করানো হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়ার আইন পাস হয়েছে বলে গণমাধ্যম থেকে জানা গেছে। এছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই রাজনীতি বন্ধ। কিন্তু সেখানে শিক্ষক রাজনীতি থেমে নেই। এতে সহজেই বোঝা যায় ছাত্র-রাজনীতি বন্ধে শক্তিশালী মহলের হাত রয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির কথা শুনলে বর্তমানে অনেকেই বিমুখ হন। ছাত্র নামদারীরা যখন অপকর্ম ঘটিয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করে তখন মুখ খোলেন অনেকে। কিন্তু সমাধানের বিষয়টা খুব কমই বাতলে দেন। ছাত্ররা যখন একটি দলের হয়ে অন্ধের মতো কাজ করবে, তখন তাদের পারিশ্রমিক চাওয়ার দাবীটি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা যখন তা না পায় তখন ক্ষোভের কারণে মানসিক পরিবর্তন আসে। আদর্শিক বা রাজনৈতিক ধারায় ছাত্রদের পরিচালিত হওয়ার সুযোগ না দেয়ায় ভুল পথে যায় তারা। যদি তাদের সামাজিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং দেশপ্রেম ও জনকল্যাণের জন্য কাজ করার পরিবেশ দেয়া যেত তবে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ ও শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো কর্মকাণ্ডে তারা জড়িয়ে পড়তো না।

ছাত্ররা এক একজন এক এক মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে। সেসব বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ কম বা বেশী থাকার প্রবণতাও একটি নষ্ট কালচারে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় আজকে যারা সুবিধা নিচ্ছে কালকে তারা সুবিধা বঞ্চিতই শুধু নয়, নির্যাতিত হয়। অন্যদিকে দেখা যায় আজকের বঞ্চিতরা কালকে মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা নিচ্ছে। আসলে বর্তমান ছাত্র-রাজনীতির রোগগুলো কোথায় কোথায় এগুলোকে খুঁজে বের করে একটি সমাধানে না আসলে একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।

ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা

এতসব বুঝেও ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা আমি আবারো বলবো। বাজার অর্থনীতির এ বিশ্বে আমাদের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের অর্থনীতি কতটুকু সুরক্ষিত? বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশ্ব শক্তিগুলো আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, বন্দর ব্যবহার করতে চায় আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের ওপর নিজেদের পুঁজির আধিপত্য প্রশস্ত করতে চায়। এমন এক বিশ্বে আমরা যে তবু আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নিতে পারি সেই জের কোথা থেকে আসে? দু'পয়সা আয়ের চিন্তায় ব্যস্ত ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবীদের কাছ থেকে? রাজনীতি যারা করেন তারা ঠিকই বোঝেন ছাত্র-যুবকরাই

www.pathagar.com

তাদের শক্তি। জনমত গড়ে তুলতে হলে, রাজপথে নামতে হলে, বুকের তাজা রক্ত দেবার কালে আজো প্রথমে এগিয়ে আসবে ছাত্র-তরুণ, তার পেছনে বাকী সবাই। প্রথম এগিয়ে আসার লোক না থাকলে পেছনের লোকও থাকবে না। দুর্ভাগ্যজনক যে, দেশের শত্রুরা তা ভালভাবেই জানে এবং সে কারণেই ছাত্র-রাজনীতির মধ্যে দুর্বৃত্তপনার ভাইরাস ঢুকিয়ে তা নষ্ট করায় ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এই দেশের জনগণই তা বুঝতে পারি না বা আমাদের বুঝতে দেয়া হয় না।

সব চাইতে বড় কথা বৈশ্বিক অর্থনীতির নেতিবাচক থাবা থেকে বাঁচতে যে জ্ঞানভিত্তিক লড়াই, দেশ ও জাতির জন্যে রাজনৈতিক ট্রেন্ড সেট করার যে নৈতিক, আদর্শিক লড়াই এই ছাত্ররাই তা গড়ে তুলতে পারে। জাতীয় রাজনীতির দুর্বৃত্তপনার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে ছাত্ররাই।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্রঃ নিম্নলিখিত বই ও পত্রিকা থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে–

- বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র- তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস- ড. মোহাম্মদ হান্নান (১৮৩০ থেকে ১৯৭১)
- ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- বদরুদ্দীন উমর
- জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫)- অলি আহাদ
- ভাষা ও একুশের আন্দোলন- আবদুল মতিন
- একুশে ফেব্রুয়ারি- হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত
- জীবন সংগ্রাম- মনি সিংহ
- স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমি, একুশের প্রকাশনা- গাজীউল হক
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম- রফিকুল ইসলাম
- অভ্যুত্থানের ঊনসত্তর- মাহফুজ উল্লাহ
- শতাব্দী পেরিয়ে- হায়দার আকবর খান রনো
- ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান- লেনিন আজাদ
- বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস(১৯৪৭-৭১)- প্রফেসর সালাহ উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য
- দৈনিক আজাদ
- দৈনিক মিল্লাত
- পাকিস্তান অবজারভার
- দৈনিক পাকিস্তান
- ডেইলি মর্নিং নিউজ
- সাপ্তাহিক গণশক্তি
- সাপ্তাহিক হক কথা
- নয়াযুগ
- দৈনিক ইত্তেফাক
- দৈনিক গণকণ্ঠ
- দৈনিক সংবাদ
- ছাত্র বার্তা, (ডাকসুর মুখপত্র)
- দৈনিক বাংলা
- আজকের কাগজ
- প্রথম আলো
- দৈনিক ইনকিলাব
- দৈনিক দিনকাল

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচী : ২১ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাপ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায় করিবার স্বত্ত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি-উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিবার জন্য সমুদ্র-উপকূলে কুঠির শিল্পের বৃহৎ শিল্পের লবণ-তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসিত করা হইবে।

৭. খাল-খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

www.pathagar.com

১১. 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্পব্যয়সাধ্য সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যায়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. 'জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স' প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রবাস ও পরে বাঙলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে যাঁহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কোনো অজুহাতেই আইন-পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন-পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর-পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

৬২-র শিক্ষা আন্দোলনের ২২ দফা

১. **স্কুল শিক্ষা**

ক. বৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে,

খ. পাঠ্যসূচি থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সূচি বাদ দিতে হবে,

গ. বিকৃত তথ্য তুলে দিয়ে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে হবে,

ঘ. কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি বাতিল করে সারা দেশে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে,

ঙ. ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে,

চ. ছাত্রবেতন শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে দিতে হবে। গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করতে হবে।

২. **মহাবিদ্যালয় শিক্ষা :**

ক. বিদ্যালয়সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে,

খ. প্রত্যেক জেলায় নতুন সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

গ. মহাবিদ্যালয়সমূহে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে,

ঘ. গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে,

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে একই পরিমাণে বেতন নির্ধারণ করতে হবে,

চ. ন্যায্যমূল্যে বই সরবরাহ করতে হবে,

ছ. নতুন করে অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী প্রবর্তন না করা,

জ. প্রত্যক্ষ ভোটে পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে,

ঞ. রাজনৈতিক কারণে মহাবিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (এফিলিয়েশন) ও অনুদান বন্ধ করা চলবে না।

৩. **বৃত্তিমূলক শিক্ষা :**

ক. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে,

খ. অটোমেশন প্রথা বাদ দিতে হবে,

গ. সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে হবে

ঘ. পলিটেকনিক ডিপ্লোমার পর দুই বছরের কোর্স করে স্নাতক প্রকৌশলী হওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে,

ঙ. পশ্চিম পাকিস্তানেরও অধিক হারে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৪. **চিকিৎসা বিদ্যা :**

ক. চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সংলগ্ন হাসপাতালসমূহে আসনসংখ্যা কমপক্ষে চারশত করতে হবে,

খ. এসব মহাবিদ্যালয়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে,

গ. মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে উন্নত মানে নিতে হবে,

ঘ. দেশীয় রোগ নিরাময় চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র খুলতে হবে,

www.pathagar.com

ঙ. এমডি ও এম এম কোর্স চালু করতে হবে,
চ. আরো অধিক সংখ্যক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৫. **কৃষি শিক্ষা :**
ক. আরো কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,
খ. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে,
গ. গবেষণা ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন আনতে হবে।

৬. **বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**
ক. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে,
খ. মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) পাঠ্যসূচী চালু করতে হবে,
গ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরো বিভাগ চালু করতে হবে।

৭. **ভাষা**
ক. শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হবে বাঙলা।

৮. **নারী শিক্ষা :**
ক. প্রতি থানায় একটি করে সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,
খ. প্রতি জেলা সদরে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,
গ. আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করে মেয়েদের আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. **মাদ্রাসা শিক্ষা :**
ক. মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে,
খ. ইসলামিক একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রে সরকারি মঞ্জুরী আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. **সামরিক শিক্ষা :**
ক. পূর্ব পাকিস্তানে সকল প্রকার সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং
খ. তাতে বাঙালীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে হবে।

১১. **সকল প্রকার ছাত্রাবাস সমস্যার সমাধান করতে হবে।**

১২. ক. শুধু মাত্র রাজনৈতিক কারণে বিদেশে বৃত্তি ও গবেষণার সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না,
খ. ছাত্রদের শিক্ষা সফরের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. **পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করতে হবে।**

১৪. **স্বাস্থ্য ও ছাত্র কল্যাণ :**
ক. ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে হবে,
খ. খেলাধূলার উন্নত মানের ব্যবস্থা করতে হবে,
গ. কক্সবাজারে ছাত্রদের জন্য স্যানাটেরিয়াম নির্মাণ করতে হবে।

১৫. **শিল্পকলা ও সংস্কৃতি :**
ক. অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে,
খ. সুস্থ এবং দেশাত্মবোধক জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে।

১৬. **শিক্ষকদের উচ্চ বেতন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।**

www.pathagar.com

১৭. **ব্যয় বরাদ্দ :** দেশের প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় ২৫% করতে হবে।

১৮. **শিক্ষা নীতি :**

ক. ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে,

খ. শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, অভিভাবক, ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১৯. **নির্যাতন :**

ক. যে সব ছাত্রের ডিগ্রী বাতিল করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে,

খ. বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে,

গ. সকল মামলা প্রত্যাহার করতে হবে,

ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে,

ঙ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসভা করার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

২০. **প্রশাসন :**

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে,

খ. নিরপেক্ষ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করতে হবে,

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম গণি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মমতাজউদ্দিনকে বরখাস্ত করতে হবে।

২১. **২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৭ সেপ্টেম্বরকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।**

২২. **প্রধান বিচারপতি বা একজন নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপচার্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।**

পরিশিষ্ট-৩

১৯৬৬ সালের ছয় দফার রূপরেখা

প্রস্তাব এক

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে- যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকতে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব তিন

মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা, (খ) বর্তমান নিয়মে

www.pathagar.com

সমগ্র দেশের জন্য কেবল মাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার

রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সব রকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব পাঁচ

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে। (খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতেয়ারাধীন থাকবে। (গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি মিটাবে। (ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না। (ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ছয়

আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রের অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-৪

ঐতিহাসিক এগার দফা

১. (ক) সচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে। কারিগরি, প্রকৌশলী, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবী মানিতে হইবে। ছাত্র বেতন কমাইতে হইবে। নারী শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষাসংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

www.pathagar.com

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. **নিম্নোক্ত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ**

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান... পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কর ধার্য করিবার কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্বপাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তনের বেলুস্তিান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত : সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে

৬. কৃষকদের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।
১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।
১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১১. দফায় স্বাক্ষর করেন :

১. আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
২. খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, ঐ
৩. সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)
৪. সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, ঐ
৫. নূরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)
৬. নূর মোহাম্মদ খান, প্রচার সম্পাদক, ঐ
৭. তোফায়েল আহমেদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু
৮. নাজিম কামরান চৌধুরী,সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

পরিশিষ্ট-৫

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় ও ১১ই এপ্রিল জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেতার ভাষণ দেন। ১২ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৬ সদস্যবিশিষ্ট অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদ প্রচারিত হয়। ১৩ই এপ্রিল আগরতলা আশ্রয় গ্রহণকারী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোকে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ন দেড় ঘটিকায় কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহাকুমার 'বৈদ্যনাথপুর' গ্রামের আম্রকুঞ্জে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। একইভাবে ১৯৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার যে স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়, ১৯৭১ সালে বৈদ্যনাথপুর আম্রকাননে সেই স্বাধীনতা সূর্যের পুনঃ উদয় হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

"যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল"

এবং

"যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছিলেন"

www.pathagar.com

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন"

এবং

"যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভূত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন"

এবং

"যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশে বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে"

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।"

এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য, সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, শাসনন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ ক্ষমতা থাকিবে। তাহার করধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহা মুলতবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতার তিনি অধিকারী হইবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন তবে তাহার কর্তব্য এবং প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার জন্য আমরা অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।

পরিশিষ্ট-৬

১১ জানুয়ারি '৯১ শুক্রবার ডাকসু ভবনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় তিন জোট এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের উদ্দেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দশ দফা দাবীনামা এবং আচরণবিধি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নীচে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

এক

ক. শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও অভিভাবকদের মতামত নিয়ে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবিলম্বে একটি সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষাকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সরকার অথবা রাষ্ট্রপ্রধান পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য; এই বিধান বাতিল করে একজন শিক্ষাবিদকে আচার্য হিসাবে নির্বাচিত করতে হবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত অগণতান্ত্রিক পরিচালনা বিধি বাতিল করে অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গণতান্ত্রিক পরিচালনা বিধি চালু করতে হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সকল বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা, শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সাধারণ জনগণের প্রয়োজনে সকল প্রকার নীতিমালা পরিবর্তন ও সংশোধনের অধিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-শিক্ষাবিদ-অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করতে হবে এবং সরকারী আমলা-প্রশাসনের অযৌক্তিক ক্ষমতা, কার্যক্রমে অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ও সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা চলবে না।

ঙ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী, বেসরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন, গ্রাম-শহর সহ সকল বৈষম্য (ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডার গার্টেন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, প্রি-ক্যাডেট, টিউটোরিয়াল হোম, মাদ্রাসা ইত্যাদি, দূর করে সারা দেশে অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা (one channel of education) চালু করতে হবে। শিক্ষাকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করা চলবে না। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করতে হবে।

চ. শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, সমাজ সচেতন দেশপ্রেমিক পাঠ্যসূচীতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, স্বৈরাচার ও সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র-জনতার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস ও জাতীয় গৌরব গাঁথাসমূহ এবং গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস ও চেতনাসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে। পাঠ্যক্রম থেকে সকল পশ্চাৎমুখী উপাদান বর্জন করতে হবে।

ছ. প্রত্যেক স্তরের পাঠ্যক্রম, সেই বিশেষ স্তরের ছাত্রদের পরিপক্কতা অনুযায়ী ও ধারণ ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে। বাধ্যতামূলক দীনিয়াত ও আরবি শিক্ষা বাতিল করতে হবে। নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাঠ গ্রহণ সমাপ্ত করার জন্য শিক্ষকরা যাতে নিয়মিতভাবে ক্লাসে ও ল্যাবরেটরীতে রুটিন অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে হল-হোস্টেলে সিট বন্টন করতে হবে।

জ. দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে প্রদান এবং অসঙ্গতিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে শিক্ষাভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোর গৃহ, আসবাবপত্র, বইপত্র ইত্যাদির সংস্থান করা সহ উচ্চশিক্ষার প্রসারে দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, কারিগরি মহাবিদ্যালয়সহ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ. জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ কমপক্ষে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ বা জাতীয় বাজেটের ২৫% করতে হবে। (ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী)।

ঞ. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। ভিন্ন ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থসমূহ জরুরী ভিত্তিতে বাংলায় অনুবাদ এবং সেগুলো ছাত্রদের কাছে সহজলভ্য করতে জাতীয় অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে ইউনিয়ন থেকে রাজধানী পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও সেগুলোর জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। নোট বই ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

ট. পরীক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি, গাফিলতি, অকর্মন্যতা ও দায়িত্বহীনতা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা দফতর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের গণতন্ত্রায়ণ ও স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

www.pathagar.com

ঠ. নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাত্রীদের হল-হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে। নিরক্ষতা দূরীকরণে ও বয়স্ক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষাদান ও সচেতন করতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহের শিক্ষার অনগ্রসরতা কাটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দুই

ক. অবিলম্বে বর্ধিত ছাত্রবেতন বাতিল করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুদান বৃদ্ধি করে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রবেতন সমান করতে হবে। শিক্ষা ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ছাত্র বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়াতে হবে। আর্থিক কারণে কোনো ছাত্রের শিক্ষা জীবন যেন বিঘ্নিত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ছাত্রাবস্থায় খণ্ডকালীন চাকুরী দিতে হবে।

খ. রেল, বাস, লঞ্চ, স্টীমার বিমান সহ সকল যানবাহনে ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৫০ ভাগ কনসেশন দিতে হবে, এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দোকান প্রতিষ্ঠা করে সাবসিডি দিয়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সুলভ মূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানীকৃত শিক্ষা উপকরণ করমুক্ত করতে হবে। বোর্ডের বই নিয়ে কেলেংকারী বন্ধ করে সরকারি উদ্যোগে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌছানোর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ. দেশের জনসংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে নিম্নতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে ও নতুন নতুন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে। এবং এ লক্ষ্যে ক্লাশরুম, ল্যাবরেটরী, হল-হোস্টেল নির্মাণপূর্বক প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধিত করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন (অধিভুক্তকরণ) ও অনুদান বাতিল করা চলবে না। সেশন জট দূর করে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত ও যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ভি.আই.পি ও ডোনেশন প্রথা উচ্ছেদ করতে হবে।

ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ব্যায়ামাগার ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা, ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধূলার সুযোগ বাড়াতে হবে। স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলক চিত্রকলা ও সঙ্গীত শিক্ষা চালু করতে হবে।

ঙ. শিক্ষকদের উপযুক্ত ও সম্মানজনক পারিশ্রমিক, চাকুরীর নিশ্চয়তাসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে হবে। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষকদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

চ. শিক্ষাজীবন শেষে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে। চাকুরী না দেয়া পর্যন্ত প্রত্যেককে বেকার ভাতা দিতে হবে। সরকারি চাকুরীর বয়সসীমা ৩০ বৎসর নির্ধারণ করতে হবে। সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। অবলিম্বে চাকুরী ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার শূন্য পদে নিয়োগ দিতে হবে।

www.pathagar.com

ছ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের উচ্ছেদকল্পে পদক্ষেপ নিতে হবে। শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তিন

ক. অবৈধ ক্ষমতা দখল ও দুর্নীতির অভিযোগে অবিলম্বে খুনী এরশাদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে। তার সহযোগী সকল দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, দালাল রাজনীতিবিদ, লুটেরা ব্যবসায়ী ও সামরিক-বেসামরিক আমলাদের গ্রেফতার, বিচার ও তাদের অবৈধ পন্থায় অর্জিত সকল সম্পত্তি অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। গত নয় বছরে যারা অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে এবং আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর গুলি-নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের তালিকা প্রণয়ন করে অবিলম্বে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ১৯৮২ সন থেকে আজ পর্যন্ত সকল বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের আশু তদন্তের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীদের সমন্বয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে নিহত-আহতদের পূর্ণ তালিকা ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। এ সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের জন্য দোষী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। শহীদদের রাষ্ট্রীয়ভাবে উপযুক্ত মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে। শহীদ পরিবারবর্গকে এবং আহত-ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণে চাকুরীচ্যুতদের পুনর্বহাল ও অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ আইনতঃ দণ্ডনীয় করতে হবে।

চার

ক. অবিলম্বে বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ ও স্বাধীনতা সহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত ও সার্বভৌম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের সকল অগণতান্ত্রিক অনুচ্ছেদ, ধারা, সংশোধনী বাতিল করে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংসদ কোনো ক্ষেত্রেই মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। সরকার তার সকল কার্যক্রমের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌম সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. গত ৯ বছর স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুক্ত থাকার কারণে যে সমস্ত ছাত্র রাজনৈতিক কর্মীকে সামরিক আদালত সহ অন্য কোনো আইনে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে, তাদের দণ্ডাদেশ বাতিল করতে হবে। সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সামরিক আদলত ও সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে আপিল ও রিভিউ'র সুযোগ দিতে হবে।

গ. বিশেষ ক্ষমতা আইন '৭৪ এবং প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট '৭৩ বাতিল করতে হবে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত নিবর্তনমূলক কারা আইন ও ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করতে হবে। রাজবন্দীদের জন্য "স্টেট-প্রিজনার্স রুল" পুনঃপ্রবর্তন করে বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে।

www.pathagar.com

ঘ. ১৯৩৫ সনের রুলস অব বিজিনেস অনুসারে গড়ে ওঠা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন পরিবর্তন করে জনগণের কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। সর্বস্তরে প্রশাসনের সামরিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। সকল সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগকৃত (ডেপুটেশন) অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে।

ঙ. সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে টেলিভিশন, রেডিও সহ সকল প্রচার মাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

পাঁচ

ক. খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কমানো, দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক মন্দা দূর করতে হবে। বর্ধিত বাস, রেল, লঞ্চ ভাড়া বাতিল করতে হবে। সারা দেশে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে ও তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। রেশনিং-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্ভিসের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সুষম নীতি অনুসরণ করতে হবে। সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সহজলভ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। হাসপাতালে রোগীদের কাছ থেকে ফী নেয়া বন্ধ করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতকে বেসরকারীকরণ করা চলবে না। সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য আমদানি বন্ধ করতে হবে।

খ. শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, যানবাহন ও বাসস্থানের মতো প্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় বাড়াতে হবে। গৃহহীন জনগণের বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

গ. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-অনাথ ও অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সার্বিক দায়-দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হবে।

ছয়

ক. স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গণসচেতনা ও আকাঙ্ক্ষা সমুন্নত রাখতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে।

খ. একাত্তরের ঘাতক দালাল, প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী-ধর্মব্যবসায়ী সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির সকল উৎস নির্মূল করতে হবে। '৭১-এর ঘাতক দালাল ও নিরপরাধ মানুষের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। অবিলম্বে গোলাম আযমকে বহিষ্কার করতে হবে। পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের সমস্ত পাওনা আদায় করতে হবে। অবাঙালী পাকিস্তানি নাগরিকদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিতে হবে।

গ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিসমূহ লংঘন করে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা চলবে না। সকল নাগরিক তাদের ব্যক্তিজীবনে স্ব-স্ব ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে সংরক্ষণ ও চর্চা করবেন। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান কিংবা বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মব্যবসায়ী রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। ধর্মীয় উপাসনালয়কে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা চলবে না।

www.pathagar.com

সাত

ক. অর্থনীতিতে লগ্নী পুঁজির লুণ্ঠন নিষিদ্ধ করতে হবে। বহুজাতিক কর্পোরেশনের অবাধ লুণ্ঠন বন্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থেকে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক কোটি কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণের টাকা উদ্ধার করতে হবে। হরিপুর তেল ক্ষেত্র বিদেশী কোম্পানীর কাছে দেয়া লীজ বাতিল করতে হবে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে বিরোধী কোনো পদক্ষেপ নেওয়া চলবে না। বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল অসম অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।

খ. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই.এল.ও) কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। রফতানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলকে (ই.পি.জেড) সাধারণ শিল্পাঞ্চলে পরিণত করে শ্রমিকদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পাঁচ দফা দাবীর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের সংশোধনী বাতিল করতে হবে। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. গরীব ভূমিহীন কৃষক-ক্ষেতমজুরদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমূল ভূমি সংস্কার করতে হবে। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য সকল সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য সংস্থার তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের ১০ দফা মানতে হবে। কৃষিঋণ আদায়ের নামে সার্টিফিকেট মামলা, ক্রোক-হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

ঘ. নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। নারীর রাজনৈতিক ও আইনগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করতে হবে। নারী ও শিশু পাচার, নারী নির্যাতন কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। বিদেশে আটকে থাকা পাচারকৃত নারী-শিশুদের ফেরত আনতে হবে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নারীসমাজ কর্তৃক উত্থাপিত দাবীসমূহ মেনে নিতে হবে।

ঙ. গত ৯ বছরে আন্দোলনরত সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের ন্যায্য দাবীদাওয়াসমূহ মানতে হবে। প্রত্যেক পেশার মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

আট

ক. কুরুচিপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। গণমুখী ও সৃজনশীল শিল্প-সাংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গণমাধ্যমগুলোকে গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ ও গতিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণ, নাট্য আন্দোলন ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে অনুদান দিতে হবে, এবং উন্মুক্ত জাতীয় মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে। সাংস্কৃতিক কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করতে হবে। সরকারি বিজ্ঞাপন নীতিমালা বাতিল করতে হবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের দাবীসমূহ মেনে নিতে হবে।

খ. সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, বিলাসিতা, অপব্যয়সহ নৈতিকতার পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে হবে। পতিতাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য, হেরোইন, হাউজি, জুয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। পতিতাদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।

www.pathagar.com

নয়

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বা সমূহের স্বকীয়তার স্বীকৃতি প্রদান, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বা সমূহের ওপর সামরিক নির্যাতন বন্ধ করে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে।

দশ

সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল বৈদেশিক নীতির বর্তমান ধারা বাতিল করে স্বাধীন ও সক্রিয় জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে। ফিলিস্তিনসহ সকল মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সুদৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ উন্মাদনা ও সমর সজ্জার বিরুদ্ধে নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ, বিদেশী আগ্রাসন, আধিপত্যবাদ, জায়নবাদ, বর্ণ বৈষম্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ বিরোধী দৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে হবে। সৌদি আরবে প্রেরিত বাংলাদেশী সৈন্য অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে। জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে ফারাক্কা, দক্ষিণ তালপট্টি, তিনবিঘা করিডোরসহ প্রতিবেশী দেশের সাথে সকল সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ ও জোটনিপেক্ষ দেশগুলোর সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আচরণ বিধি

১। সকল ছাত্র-সংগঠনকে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

২। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য কর্তৃক ঘোষিত ১০ দফা দাবীনামাসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে শরিক ছাত্র সংগঠন সমূহের ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৩। এই ১০ দফা দাবীসমূহ ছাত্র সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা ও জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

৪। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যভুক্ত সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বজায় রাখা।

৫। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কোনো সংগঠনের কর্মসূচীতে বাধা প্রদান না করা।

৬। শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানো।

৭। কোনো ছাত্র সংগঠন কর্তৃক অবৈধ অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা না করা।

৮। ঐক্যভুক্ত ছাত্র সংগঠনের মধ্যে যে কোনো কারণেই সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধকে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

৯। ঐক্যভুক্ত ছাত্র সংগঠনের ভেতরকার মতপার্থক্যকে রাজনৈতিক ভাবেই প্রকাশ করা, কোনো প্রকার উস্কানী কিংবা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে এরকম আচরণ না করা; পারস্পরিক কুৎসা রটনা না করা।

১০। একাত্তরের ঘাতক আলবদর রাজাকার চক্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

১১। স্বৈরাচারী খুনী এরশাদ, তার সহযোগী মন্ত্রী, এমপি, দালাল রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক আমলা, লুটেরা ব্যবসায়ীদের কোনো সংগঠনে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেওয়া।

www.pathagar.com

১২। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন এবং দেশে গণতন্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যভুক্ত সংগঠনসমূহ

১। ডাকসু
২। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ)
৩। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল
৪। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ)
৫। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
৬। বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী
৭। জাতীয় ছাত্রলীগ
৮। গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন
৯। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন
১০। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সা-সা)
১১। বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি
১২। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন (আবু)
১৩। বিপ্লবী ছাত্র ধারা
১৪। বিপ্লবী ছাত্র মঞ্চ
১৫। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (লু-আ)
১৬। গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ
১৭। গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র
১৮। ছাত্র ঐক্য ফোরাম (মিশু)
১৯। ছাত্র ঐক্য ফোরাম (জায়েদ)
২০। গণতান্ত্রিক ছাত্র একতা
২১। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

পরিশিষ্ট-৭

সংগ্রহশালার দায়িত্বে থাকা গোপাল দাসের সহযোগিতায় সংগৃহীত ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের নামের তালিকা

১৯২৪-২৫ সহ-সভাপতি : সাধারণ সম্পাদক: যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৩৮-৩৯ সহ-সভাপতি : সাধারণ সম্পাদক : আঃ আউয়াল খান
১৯২৫-২৬ সহ-সভাপতি : মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক : এ. কে. মুখার্জি এ. বি. রুদ্র (ভারপাপ্ত)	১৯৪১-৪২ সহ-সভাপতি : সাধারণ সম্পাদক : আঃ রহিম

www.pathagar.com

১৯২৮-২৯ সহ-সভাপতি : এ. এম. আজহারুল ইসলাম ভূঞা সাধারণ সম্পাদক : এস. চক্রবর্তী	১৯৪৫-৪৬ সহ-সভাপতি : আহমেদুল কবীর ফরিদ আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত) সাধারণ সম্পাদক : সুধীর দত্ত
১৯২৯-৩০ সহ-সভাপতি : রমনী কান্ত ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক : কাজী মহরত আলী আতাউর রহমান খান (ভারতপ্রাপ্ত)	১৯৪৬-৪৭ সহ-সভাপতি : ফরিদ আহমেদ সাধারণ সম্পাদক : সুধীর দত্ত
১৯৩৩-৩৪ সহ-সভাপতি : ভবেশ চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক : যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৪৭-৪৮ সহ-সভাপতি : অরবিন্দ বোস সাধারণ সম্পাদক : গোলাম আযম
১৯৬৫-৩৬ সহ-সভাপতি : সাধারণ সম্পাদক : এ. এইচ. এম. এ. কাদের	১৯৪৮-৪৯ সহ-সভাপতি : অরবিন্দ বোস সাধারণ সম্পাদক : গোলাম আযাম এ. জামানস খান (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৩৬-৩৭ সহ-সভাপতি : সাধারণ সম্পাদক : এ. এইচ. এম. এ. কাদের	১৯৫৩-৫৪ সহ-সভাপতি : এস. এ. বারী এটি সাধারণ সম্পাদক : জুলমত আলী খান ফরিদ আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৫৪-৫৫ সহ-সভাপতি : নিরোদ বিহারী নাগ সাধারণ সম্পাদক : আব্দুর রব চৌধুরী	১৯৬৬-৬৭ সহ-সভাপতি : ফেরদৌস আহমদ কোরেশী সাধারণ সম্পাদক : শফি আহমেদ
১৯৫৫-৫৬ সহ-সভাপতি : নিরোদ বিহারী নাগ সাধারণ সম্পাদক : আব্দুর রব চৌধুরী	১৯৬৭-৬৮ সহ-সভাপতি : মাহফুজা খানম সাধারণ সম্পাদক : মোরশেদ আলী
১৯৫৬-৫৭ সহ-সভাপতি : একরামূল হক সাধারণ সম্পাদক : শাহ আলী হোসেন	১৯৬৮-৬৯ সহ-সভাপতি : তোফায়েল আহমেদ সাধারণ সম্পাদক : নাজিম কামরান চৌধুরী
১৯৫৭-৫৮ সহ-সভাপতি : বদরুল আলম সাধারণ সম্পাদক : মোঃ ফজলী হোসেন	১৯৭০-৭১ সহ-সভাপতি : আ. স. ম. আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক : আব্দুল কুদ্দুস মাখন
১৯৫৮-৫৯ সহ-সভাপতি : আবুল হোসেন সাধারণ সম্পাদক : এ.টি.এম. মেহেদী	১৯৭২-৭৩ সহ-সভাপতি : মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম সাধারণ সম্পাদক : মাহবুব জামান
১৯৫৯-৬০ সহ-সভাপতি : আমিনুল ইসলাম তুলা	১৯৭৯-৮০ সহ-সভাপতি : মাহমুদুর রহমান মান্না

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদক : আশরাফ উদ্দিন মকবুল	সাধারণ সম্পাদক : আখতারুজ্জামান
১৯৬০-৬১ সহ-সভাপতি : বেগম জাহানারা আখতার সাধারণ সম্পাদক : অমূল্য কুমার	১৯৮০-৮১ সহ-সভাপতি : মাহমুদুর রহমান মান্না সাধারণ সম্পাদক : আখতারুজ্জামান
১৯৬১-৬২ সহ-সভাপতি : এস.এম. রফিকুল হক সাধারণ সম্পাদক : এনায়েতুর রহমান	১৯৮২-৮৩ সহ-সভাপতি : আখতারুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক : জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বাবুল)
১৯৬২-৬৩ সহ-সভাপতি : শ্যামা প্রসাদ ঘোষ সাধারণ সম্পাদক : কে. এম. ওবায়েদুর রহমান	১৯৮৯-৯০ সহ-সভাপতি : সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ সাধারণ সম্পাদক : মুশতাক হোসেন
১৯৬৩-৬৪ সহ-সভাপতি : রাশেদ খান মেনন সাধারণ সম্পাদক : মতিয়া চৌধুরী	১৯৯০-৯১ সহ-সভাপতি : সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ সাধারণ সম্পাদক : মুশতাক হোসেন
১৯৬৩-৬৪ সহ-সভাপতি : রাশেদ খান মেনন সাধারণ সম্পাদক : মতিয়া চৌধুরী	১৯৯০-৯১ সহ-সভাপতি : আমানউল্লাহ আমান সাধারণ সম্পাদক : খায়রুল কবীর খোকন
১৯৬৪-৬৫ সহ-সভাপতি : বোরহান উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক : আসাফুদ্দৌলা	

www.pathagar.com

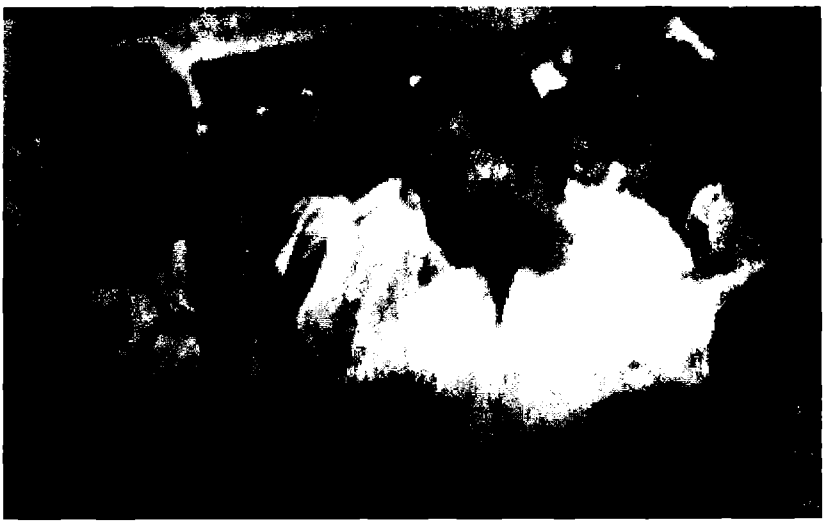

'৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না– *দৈনিক খবর*

'৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে রাজপথে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-সমাজ– *দৈনিক আজাদ*

www.pathagar.com

'৯০-এর অক্টোবর, মুনির হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ ও স্বৈরাচারী সরকারের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের আক্রমনে আহত ছাত্রদল নেতা আমানউল্লাহ আমানকে দেখতে যান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও ছাত্রলীগ সভাপতি গোলাম মোস্তফা সুজনকে দেখতে যান বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া। অন্যদলের ছাত্র সংগঠনের আহত নেতাকে সমবেদনা জানানোর দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে দুই নেত্রীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'৯১-এর অক্টোবর, ঠিক এক বছর পর স্বৈরাচার এরশাদের সেই চিহ্নিত ভাড়াটে সন্ত্রাসী ও ডা. মিলনের হত্যাকারীরা ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের আশ্রয় পায়। তাদের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে ছাত্রদলের গালিব ও লিটন মারা যায়। ছাত্রলীগের মিজান গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দু'দিন পর মারা যান। ছবিতে খালেদা জিয়ার সামনে ছাত্রদলের বহিস্কৃত নেতা ইলিয়াস আলীকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর '৭২-এ প্রথম ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের ভাঙ্গন। রব-সিরাজ বনাম নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন- *দৈনিক ইত্তেফাক*

www.pathagar.com

'৭২-এ ডাকসু নির্বাচনের পর পর বিজয়ী ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সমাবেশ।

–দৈনিক আজাদ

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের গায়বানা জানাজায় শহীদ মিনারে ছাত্র-সমাজ।

–দৈনিক আজাদ

www.pathagar.com

'৭৩-এর জাসদ ছাত্রলীগের মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাজাহান সিরাজ। –*মর্নিং নিউজ*

'৯০-এর নভেম্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। –*দৈনিক সংবাদ*

www.pathagar.com

'৯০-এর নভেম্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলের একাংশ।

–দৈনিক ইত্তেফাক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'মাহমুদুর রহমান মান্না তার দীর্ঘদিনের ছাত্ররাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন এই বইটি। তিনি ষাটের দশকের গৌরবোজ্জ্বল ছাত্ররাজনীতির কথা জানেন। '৬৯ দেখেছেন এবং তাতে অংশও নিয়েছেন। সেই তুলনায় আজকের রাজনীতি দেখে তিনি হতাশ। রাজনীতিতে নীতিবোধ পদদলিত। কেউ সাহস করে সত্য বলতে চাইলে তিনি বাধাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন। হামলা, মামলা নিপীড়ন আসছে। ছাত্ররাজনীতির দুর্বলতার সুযোগে ব্যবসায়ীরা ঢুকে যাচ্ছে। রাজনীতি চলে যাচ্ছে এই ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করেছেন।

এতদ সত্ত্বেও মান্না মনে করেন, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ছাত্রশক্তির প্রয়োজন। মুক্তির পথ কী? মান্না বলেছেন, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র আন্দোলন, উন্নত গণতন্ত্র, কল্যাণধর্মী অর্থনীতি এবং প্রশ্নাতীত দেশপ্রেমের বোধন। মান্নার বই সেই আহ্বান জানায়।'

–আব্দুল জলিল (এমপি)
প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দেশে 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির কোনো অস্তিত্ব নেই। যখন যারাই ক্ষমতায় থাকেন, তখন তাদের স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী আচরণে ভীত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, সিভিল সমাজ। এই পরিস্থিতিতে ছাত্ররা এখনো নির্ভরতার জায়গা। নয় বছরের স্বৈরাচারের সময় (এরশাদের আমলে) ছাত্ররাই ছিল আন্দোলনের অগ্রসৈনিক। জরুরি অবস্থার মধ্যেও যখন রাজনৈতিক দলগুলো ঘরে বসেছিল, তখন ছাত্ররাই আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আড়ালে বসে থাকা সামরিক জান্তাকে পরাজিত করেছিল।'

একসময়ের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা এবং বর্তমানে রাজনীতির মূল স্রোতের কিছুটা দূরে থাকতে বাধ্য হওয়া মাহমুদুর রহমান মান্না এভাবে ছাত্ররাজনীতির সম্ভাবনা চিহ্নিত করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন, বর্তমানে প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠন আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং বিএনপির জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রায় 'সর্বাংশ মূল রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পাসসহ সর্বত্র তাদের একমাত্র এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল দলের স্বার্থ রক্ষা করা।' তিনি ছাত্ররাজনীতিকে সঠিক পথে আনার কথা বলেছেন।

– অজয় দাশগুপ্ত

9 789848 928608